মহান ভারত

শ্রী-ভিক্ষু

ভারতী-প্রকাশ

প্রকাশনা : শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
ভারতী-প্রকাশ
৩০, আশুতোষ চাটার্জ্জী স্ট্রীট
ঢাকুরিয়া—কলিকাতা-৩১

প্রস্তুতি : শ্রীচন্দ্রমাধব ভট্টাচার্য্য
১৪, শ্যামবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

সহযোগিতা : শ্রীগৌতম সেন

মুদ্রণ : নিউ গোল্ডেন আর্ট প্রেস
১৪, দুর্গা পিথুরী লেন
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট : শ্রীসুপ্রকাশ সেন

বাঁধাই : ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

মূল্য : সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

মহান
ভারত

বর্ত্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠজ্ঞানী

যোগী-কল্প পণ্ডিতরাজ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

এম. এ. পি এইচ. ডি

মহাশয়ের স্নেহ-লিপি

আশীর্ব্বাদ

স্নেহভাজনেষু,

প্রাচীন ভারতের মহান বিষয়গুলিকে সুষ্ঠু ও সংক্ষিপ্তভাবে—'মহান্ ভারত' নামক গ্রন্থে সহজ ও সরল ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করিবার যে উদ্যম তুমি করিয়াছ, আশীর্ব্বাদ করি ভগবৎ করুণায় তাহা সফল হউক এবং দেশ ও দশের পক্ষে কল্যাণকর হউক।

(স্বাক্ষর) শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

৫।৪।৫৮

জীবনের কয়েকটি অমূল্য মুহূর্ত্ত তাঁর পদতলে বসে যে মহাবাণী শুনেছি, তারই প্রভাব আমাকে এ গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করলেও আমার অক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিকৃতি হয় তো তাঁকে পীড়া দিয়েছে। তথাপি তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভে—আমি ধন্য! .... 'শ্রীভিক্ষু'

ভৎ´সনা-বাক্য

'মহানভারত' রচনায় পেয়েছি আশীর্ব্বাদ, স্নেহ, উৎসাহ, আর অসংখ্য সাধুবাদ দেশ ও বিদেশ থেকে কিন্তু নিন্দা ও ভৎ´সনাও পেয়েছি প্রচুর।

হিন্দু ধর্ম্মকে যাঁরা অন্তর দিয়ে ভালবাসেন, হিন্দু পুরাণের অতিবিচিত্র কাহিনীটিও যাঁরা পরিপূর্ণ বিশ্বাসে গ্রহণ ক'রে ভক্তি-রসের পরমানন্দলাভ করেন—আমি বহুক্ষেত্রে সে সব কাহিনীর জটিল ব্যুৎপত্তি-গত অর্থে ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তাদের আঘাত করেছি, এমনকি অনেকে আমায় তিরস্কারও করেছেন অনধিকারী বোলে, কঠোর শ্লেষ-মিশ্রিত প্রশ্নে আঘাতও করেছেন।

আমি তাঁদের কাছে আমার অপরাধ স্বীকার করেও সবিনয়ে বলবো—কাল ও পাত্রের উপযোগী করে অমৃতও বিতরণ করতে হয়। নইলে যে ঔষধ-সুধা একের প্রাণ দেয়, বিষক্রিয়ায় তাই আবার অপরের প্রাণ নেয়।

তা ছাড়া অতি প্রাচীনযুগে কুমারিলের ন্যায় মহাপণ্ডিতও পৌরাণিক নানা কাহিনীর নানা রকমই ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয়খণ্ডে তা দেখিয়েছি। এখানে উদাহরণ রূপে উল্লেখ করতে পারি—অহল্যার প্রতি ইন্দ্রের বলাৎকারকে কুমারিল সূর্য্যতেজে রাত্রির অন্ধকারক্ষয় বা জারণের রূপক বলেছেন—বলেছেন সূর্য্য-রশ্মি রূপ ইন্দ্র রাত্রি-রূপা অহল্যার 'জার'।

অতএব আমাকে যাঁরা ভৎ´সনা করেছেন—আমার ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা বলেছেন—তাঁরা আমার অনধিকারের দোষকে কুমারিল প্রভৃতি মহাজনের পদাঙ্কানুসরণ বলেই মেনে নেবেন। ইতি—

উৎসাহ বাণী

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীমৎ দণ্ডিস্বামী হৃষীকেশ আশ্রম
মোহান্ত মহারাজ,
তারকেশ্বর মঠ

পোঃ তারকেশ্বর
জেলা—হুগলী
তাং ৫।২।৬৫

শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য (শ্রীভিক্ষু) মহোদয় লিখিত 'মহান ভারত' পুস্তকটি দেখিয়াছি। ইহাতে আর্য্য-ভারতের অতীত গৌরবের স্বর্ণ-উজ্জ্বল অধ্যায় অতি হৃদয়-গ্রাহী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। আজকালকার পাশ্চাত্ত্য-ভাবধারার কুপ্রভাবে বিকৃত জনচিত্ত এই পুস্তক-পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই।

তথ্যমূলক গ্রন্থটী সত্যই অনবদ্য হইয়াছে।

(স্বাক্ষর) হৃষীকেশ আশ্রম

আধুনিক বৈদেশিক শিক্ষা প্রভাবে প্রভাবিত জনচিত্তের সন্দেহ নিরসনে আমি ভারতীয় পুরাণ-কথার মাঝে মাঝে যে আস্তিক্যহীন যুক্তি দিয়েছি, হয়তো তা সনাতনধর্ম্মী কঠোর আস্তিক পরমভক্ত আবাল্য ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীজগৎগুরু শঙ্করাচার্য অনন্ত শ্রীবিভূষিত তারকেশ্বর পীঠাধীশ্বর মোহান্তজীকেও ব্যথা দিয়েছে—তবু তাঁর স্নেহসজল দৃষ্টিতে আমার 'মহান ভারত' আপ্লুত— এ আমার পরম গৌরব।....

—'শ্রীভিক্ষু'

শ্রদ্ধেয় শ্রীইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'মহান ভারত' নামক গ্রন্থ পাঠ করবার সৌভাগ্য হ'ল। ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি যুগোপযোগী রূপ তিনি খুলে ধরেছেন এই গ্রন্থের মাধ্যমে।........

(স্বাক্ষর) শ্রী.যজ্ঞেশ্বর আচার্য্য

সভাপতি—

অখিল বর্মা ভারতীয় কংগ্রেস,—পিউ

সভাপতি— হিন্দুধর্ম্ম সভা-বর্মা

গ্রন্থোক্ত বিভিন্ন বিষয়

সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন

বিষয়	পৃষ্ঠা

বেদ ও উপনিষদ সম্বন্ধে—

সৌরজগত সম্বন্ধে—

দেব-স্বর্গ

পুরাণ-কথা ও ভারতীয় ঐতিহ্য

বিভিন্ন বিষয় ও পরিচয় রহস্য

মহান ভারত

এমনই সব নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভাবে।

মহান ভারতে পাবেন—মানুষ ধীরে ধীরে কি ক'রে সমাজ গড়লো, কেমন ক'রে হ'ল সভ্য, হ'ল সাম্যবাদী—তাই করলো যজ্ঞ, বসালো উপনিবেশ, রচনা করলো নানা গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র। পুরাণের অসম্ভব সব গল্প তারই সাক্ষ্য দেয় --তারই ইঙ্গিত জানায়।

মহান ভারত বলেছে—

—ভারতের ষড়দর্শনের সার কথা, বেদাঙ্গ ও বেদান্তের মহান ত তন্ত্রের মূলবাক্য, পরশুরাম তন্ত্রসূত্র, আয়ুর্ব্বেদ, সাহিত্য ও শিল্পের কথা।

মহান ভারতে আছে নানা প্রশ্নের উত্তর

ধর্ম্ম সূত্রের পাশেই কর্ম্ম কাণ্ডের প্রস্তুতি কেন? কেন বর্ণ বিচার, জাতিবিচার বা গোত্র প্রবরের পার্থক্য? দশবিধ সংস্কার জীবনে কি প্রভাব আনে? কেন ঐ কগাছা সুতোর পৈতা নিয়ে উপনয়ন? কেন বিবাহে অগ্নিশিলার আবাহন, কেনই বা কুশণ্ডিকা? আগুনে লাজাহুতি কেন? কেন কটযাত্রায় শিশুকোলে নববধূর নগর ভ্রমণের নানামন্ত্র, কি তার অর্থ? হিন্দুধর্ম্মে কামতন্ত্র কি শুধু যৌনভোগ—বাৎস্যায়নের কামসূত্রে কী মহান ভাবের ইঙ্গিত? গর্ভাধান, পুংসবন, সাধভক্ষণ কি সত্যই প্রয়োজনীয় বিধি? সাধকের পঞ্চমকার সাধনা, ভক্তের তীর্থ-ভ্রমণ, শাসকের রাজনীতি ও রাজ্যশাসন—রাজার গুণ, মন্ত্রীর লক্ষণ, প্রজার কর্ত্তব্য ও সমাজের বিধিকথা, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, হঠযোগ ও জ্ঞানযোগের কথা—মূর্ত্তিপূজা, পীঠ-রহস্য ও প্রাণায়ামাদির সরল ইঙ্গিত এমনই নানা বিষয়ের সারমর্ম্ম আছে—

মহান ভারতের দ্বিতীয় খণ্ডে

স্বস্তিবাচন

Dr. Gourinath Sastri
M. A., P. R. S., D. Litt.
Principal.

SANSKRIT COLLEGE
Calcutta.

ভারতের মহনীয় ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক আমরা— কথা-প্রসঙ্গে প্রায়ই আমাদিগকে সেই ঐতিহ্যের গৌরব অনুভব করিতে দেখা যায়। অথচ ভারতীয় ঐতিহ্যের স্বরূপ কি, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে আমাদের মধ্যে অনেকেই নিরুত্তর হইয়া থাকেন। বহু শতাব্দির পর আজ আমরা স্বাধীন হইয়াছি। নূতন উদ্যমে কর্মজীবনে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইয়াছি। এই অবসরে যদি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি ব্যাপক ও গভীর হয় তাহাতে আমাদের কল্যাণই হইবে।

শ্রীভিক্ষু প্রণীত মহান ভারত নামক গ্রন্থে সহজ ও সরল ভাষায় প্রাচীন ভারতের বৈশিষ্ট্যগুলি অপরূপ বৈচিত্র্যে রূপায়িত হইয়াছে। এই গ্রন্থ-পাঠে প্রত্যেক ভারতীয়ের সমূহ কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

সংস্কৃত কলেজ

৩।৯।৫৪

প্রথম সংস্করণ
স্বাধীনতা দিবস
১৫ই আগষ্ট ১৯৫৮

●

প্রথম পর্ব্ব

মুদ্রক—শ্রীবিশ্বনাথ শীল
নিউ গোল্ডেন আর্ট প্রেস (প্রাইভেট্) লিঃ
১৪, দুর্গাপিতুরী লেন, কলিকাতা—১২

প্রাক্কথনে মহান ভারতের ইতিহাস লেখার আগের কথাটুকু, সহজ ভাষায় সরল ক'রে সংক্ষেপে লেখা হবে—এই ছিল সঙ্কল্প।

কিন্তু ভারতের শাশ্বত ইতিবৃত্তের গোড়ার কথা বলতে গিয়েই তা' হয়ে উঠলো জটিল—উপায় কি ?

ভারতের সেই গোড়ার কথাই যে মহান তত্ত্ব-কথা—পরম সত্য অথচ চরম জটিল।

বেদ ও পুরাণের সব তত্ত্ব, কাহিনী আর কল্পনা ভারতীয় কৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে মধুময় হলেও আধ্যাত্মি-কতার হেম-স্পর্শে গুরুভার হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে নিরেট আর কঠিন।

'প্রাক্কথন' অংশটিও সেই কারণেই হয়ে পড়লো একটু ঘোলাটে ও দুর্ব্বোধ্য।

কিন্তু তা' অনিবার্য্য।—নইলে 'মহান ভারতের' ইতিহাস বলতে গিয়ে, তার শাশ্বত ও সনাতন মহাসত্যের অস্বীকৃতির পাপ এ গ্রন্থকে স্পর্শ করবে যে·········

সূচনা

আয়ুর্বর্ষশতং নৃণাং রাত্রৌ তদর্দ্ধং গতং
তস্যার্দ্ধস্য পরস্য চার্দ্ধমপরং বালত্ববৃদ্ধত্বয়োঃ
শেষং ব্যাধিবিয়োগদুঃখসহিতং সেবাদিভির্নীয়তে
জীবে বারিতরঙ্গবুদ্বুদসমো সৌখ্যং কুতঃ প্রাণিনাম্।

ভর্তৃহরির—নীতিশতকের একশটি শ্লোক পড়লে 'ত রক্ষে ছিল না, বন্ধুবর এই একটি প'ড়েই ছুটে বেরিয়ে পড়েছেন পথে। এ দোর ও দোর করে হাজির—মুখে শুধু ঐ কথা 'সৌখ্যং কুতঃ প্রাণিনাম্?' বুঝলাম তার ভাবটা—বুঝিয়েও দিলাম হালকা সুরে শ্লোকের ভাবার্থ—

"ওরে, একশ বছর পরমায়ু যদি হয় তোর
অর্দ্ধেক তার কেটে যাবে রাতে,
(তবু) কাটবে না তোর ঘুমঘোর।
অর্দ্ধেক যাহা বাকী—সেও তোরে দেয় ফাঁকী
তার আধা যায় বাল্যলীলায়,
আধা কাটে বুঝি বৃদ্ধবেলায়,
বাকীটুকু যায় জরা, অবসাদ, রোগ, ব্যাধি, সেবা চিন্তায়
কাল-তরঙ্গে বুদ্বুদসম আয়ু তোর—ভেঙ্গে ভেসে যায়"।

"তবে?"—বিষন্ন মনে প্রশ্ন করলেন বন্ধু।

"মহিষগল-ঘণ্টাৎ-ঘনরবাৎ"—বুঝলাম মহিষ-গলার ঘণ্টার ধ্বনি বুঝি শুনেছেন বন্ধুবর অথবা ... ...

"উঁহু উঁহু ভেবো না মরণের ভয় করছি।—ভাবছি, যে কি-ই বা করলাম জীবনে। নিজের দেশ, জাত, ধর্ম্মের কোন কথাই তো বুঝলাম না, জানলামও না। এমন সোনার দেশ এমন যে হিন্দুধর্ম্ম একবার সেদিকে ফিরেও তাকালাম না। না পেলাম বুঝবার পথ, না পেলাম জানবার ক্ষমতা।"—অতি দুঃখে বল্লেন বন্ধুবর।

বুঝলাম বন্ধু "জ্ঞান আহরণে" উৎসুক!

বল্লাম—"তা—বড় বড় পণ্ডিত আছে যাও না তাদের কাছে"।

"গিয়েছিলেম ভাই—কিন্তু তাঁরা ফিরিয়ে দিলেন। বল্লেন—"ওসব সাধনার জিনিষ, সময় চাই, দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করতে হবে, তবে বুঝতে পারবে সব। ওসব চটপট হয় না—সিনেমা নয় ও—ত্বরিৎঘরিতের কর্ম্ম নয়। বিদ্যা সাধনার জিনিষ—বিদ্যা তপঃ"।

"তা বটে—এ যুগের স্পীড ওঁরা স্বীকার করবেন না, গুণী তাঁরা, বিদ্যা তাঁদের কাছে সাধনা—যা তা করে শেষ করতে তাঁরা নারাজ। তাঁদের মুখেই শুনেছি—পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলেছেন—"বৃহস্পতি গুরু, ছাত্র ইন্দ্র। সময় লেগেছিল পড়বার মাত্র এক হাজারটি বছর। তাতেও শেষ হ'ল না।"

"বটে?—তা হলেত কোন আশাই নেই।"

"আরে শোনই না, শাস্ত্র বলে গেলেন বিদ্যাকাল চারটি আগম, স্বাধ্যায়, প্রবচন, ব্যবহার। আগম মানে শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা ও গুরুগৃহে বিদ্যারম্ভ—তারপর অধ্যয়ন, তারপর প্রবচন—পরকে পড়ান, মানে অধ্যাপনা, তারপর নিজের জীবনে তাই প্রতিফলিত করা।"

"তবেই হয়েছে ও বিদ্যে আর হবে না ভাই, এখন শুধু একটু জ্ঞান—"

"আরে ভাই! তাইতো ঋষি বলে গেলেন—"চিরজীবী মানেই যখন শতবর্ষ, তখন শতবর্ষে তো আগমকালই কুলোয় না। তবে মানুষ বিদ্যা শিখবে কি করে?" উত্তরে বুঝি বা সান্ত্বনা দিতেই ঋষি বল্লেন—"গুরুর উপদেশ নেও। যতটা পার জান—সহজে সরলে। একটু তাড়াতাড়ি তো করতেই হবে। ও স্পীডের কথা শুধু এ যুগের নয় ভাই, ও যুগেও ছিল। সব বিদ্যা শিখতে যখন ইন্দ্র হাজার বছরেও পারেন নি তখন ......"

আবার প্রশ্ন করলেন বন্ধু "তবে জানি না কিছু বলে কি না জেনেই থাকবো। যাদের সময় নেই, শিক্ষাও তেমন নেই, তারা বুঝবে না আমাদের কি ছিল? জানতে হবে না আমরা কত বড়?

সত্য তো বটেই বন্ধু—দুনিয়ায় যে যত শাস্ত্র অধ্যয়নই করুক—যত দেশই থাকুক—বলতে পার ৫০০০ বছর ধরে একই মন্ত্র সমভাবে নিত্য একই মাটিতে পঠিত হয় কোন্ দেশে ? এই দেশে। বলেন বটে অনেকে—জেন্দ আবস্তা প্রাচীন, ব্যাবিলনের রাজবংশও প্রাচীন, এ সবই নাকি বেদের সমসাময়িক। কিন্তু তার তেমন নজির কই ? আর আমাদের নজির—ইচ্ছায় অনিচ্ছায় হোক—বুঝে না বুঝে হোক, ৫০০০ বছর ধরে একইভাবে সেই বেদমন্ত্র—গায়ত্রী, উপনিষদ, সূক্ত, সূত্র সব একটানা স্রোতে আজও বয়ে চলেছে; দেশের সন্ততি আজও তার খেই হারায়নি শুধু ভারতবর্ষেই। তারপর ঐ অবতার, ঐ শ্রীকৃষ্ণ, রাম, সীতা, দ্রৌপদী, ঐ বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য—এ কোন্ দেশে সম্ভব ? দেশের সে সব কথা জানতে হবে না ?—সে ইতিহাস তো জানা প্রয়োজনই।"

"হ্যাঁ প্রয়োজন তো বটেই। আমার মতন অনেকে আছেন কাজের ফাঁকে ফাঁকে যাঁরা চান জানতে—আমরা কে, কি কি ছিল আমাদের, কি গেল,—চান জানতে মহান ভারতের ইতিহাস।

বল্লাম 'সত্যিই তো—এমন বই লেখা প্রয়োজন ......"

* * * *

সেই প্রয়োজনে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে, বন্ধুর আগ্রহে, গুরুকল্প এক মহান ব্যক্তির শরণ নিয়ে, বিবিধ বুধমণ্ডলীর সাহায্যে সাজাতে সুরু করলাম এই 'মহান ভারত'। যে পর্য্যন্ত ভারত ছিল মহান—তারই ইতিহাস লিখবো; যে ভারতের ইতিহাস আছে স্কুলের পুঁথিতে, কলেজের গ্রন্থে, গবেষকের গবেষণায় বাস্তবের রূপ ধরে—সে অংশ থাক পৃথক। যেটুকু পড়ে আছে বিরাটত্বের আড়ালে—সহজ বুদ্ধির অতীতে, তাকেই সহজ সরল ক'রে লিখবার প্রয়াস নিয়ে বসলাম। ইতি—

শ্রীইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য
"শ্রী-ভিক্ষু"

উদ্দেশ্য

মহান ভারতের ইতিহাস পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম, বৃহত্তম এবং মহত্তম অধ্যায়। মানুষের ধ্যান-কল্পনা, তার সাধনা ও সিদ্ধির দিক দিয়ে বুঝি সে ইতিহাসের তুলনা নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন রুচি, শিক্ষা ও কৃষ্টি এসে সম্মিলিত হয়েছে ভারতের এই মাটিতে। সেই সঙ্গম-তীর্থের মহান রূপ ও পরিচয়ই ফুটে উঠেছে মহান ভারতের মধ্যে।

মহান ভারতের সবই মহান। তার ইতিহাস, তার চিন্তা, তার ধ্যান-ধারণা, সব মহান। তাই বিশ্বের সকল দেশ ও জাতির ইতিহাস যখন বাস্তবের দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে চলে, ভারতের ইতিকথা চলে শ্রেয়ের পথে, অমৃতের সন্ধানে। তাই ভারত মহান ভারত।

"ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং"—ধ্যানযোগে যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির নিকট 'ভূর্ভুবঃস্বঃ ব্যাহৃতি' যথাক্রমে সমস্ত বেদকে মথিত করে সাররূপে উদ্ভূত, ভৌগোলিক পরিবেশকে অতিক্রম করে যে ঋষি-—গণের চিদান্বেষী দৃষ্টি উর্দ্ধ হ'তে উর্দ্ধে উঠেছে, বেদের কথায় 'ভদ্র' থেকে 'শ্রেয়'তে' গিয়েছে—ইহলোকের উর্দ্ধে পরলোকের অতীত লোকে যে পরমপুরুষ, তারই চিন্তায় তন্ময় হয়ে গেছেন যাঁরা, তাঁরা পেয়েছেন এই মহাভারতের মহান তত্ত্বের পরমানন্দের সন্ধান। সে সন্ধানের মধ্য দিয়েই গ'ড়ে উঠেছে এদেশের সভ্যতা ও কৃষ্টি। ভারতের ইতিহাস অধ্যাত্মলোকের চিন্তায় মহিমময়!

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ,
কুত আয়াতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টি?"

বস্তুতঃ এই তো ঋষির পরম জিজ্ঞাসা। শাশ্বত প্রশ্ন তার—

'কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্'।

মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে ভারতের এই মর্ম্মবাণীই ধ্বনিত হয়েছে—

'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম'।

কে করলেন এ সব সৃষ্টি, কোথা থেকে এলো এ সব—কে প্রথম দেখালেন সৃষ্টির আদি রূপ?—এর যথার্থ উত্তরই যদি না জানতে পারি তবে কি করলাম?—এই ব্যাকুলতাই তো ভারতের চিরদিনের। যে উত্তর অমৃতত্বের সন্ধান দিতে না পারে তাহার'ত কোনই স্বীকৃতি নেই।

মননে, কার্য্যে ও ধর্ম্মে যথাক্রমে তিনটি স্তর অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম। এই ত্রয়ীকে নিয়েই বেদ। বেদ-বিধৃত ভারতের মর্ম্মবাণী এই ত্রয়ীতে রয়েছে নিহিত।

আবার দেখি ভারতীয় সে তত্ত্ব ও মহিমার প্রত্যক্ষ ইতিহাস পুরাণের বিচিত্রতর ভঙ্গীতে মহাকালের পাতায় পাতায় লিখিত হয়েছে—অবতার পুরুষদের মধ্য দিয়ে নিরাকারের পরম মধুর সাকার-লীলা উদ্ঘাটিত হয়েছে—পুষ্পিত করে তুলেছে ভারত-ইতিহাসের শাশ্বত অপরূপ রূপ।

অপর দিকে অতি আধুনিক বিচারভঙ্গী যাঁদের তাঁরাও প্রাচীন যুগের মধ্যে পেয়েছেন বর্ত্তমান যুগের বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্ম্ম সাধনার পীঠস্থানের নিদর্শন। পেয়েছেন প্রস্তর ফলকে, প্রস্তর স্তূপে, পাষাণ প্রতিমায় মনোরম ভারতের নিঃশ্রেয়স সাধনের মণিকোঠার সন্ধান। সেই সাক্ষ্য আর বেদ পুরাণের নানাসূত্রে লিখিত তত্ত্বের ভেতরেই যাঁরা মহান ভারতের ইঙ্গিতটিকে দেখে নিতে চান, তাঁরাও বলেন—ঐ যে আধুনিক চিন্তাধারার এই গতি-বেগ—ঐ অর্ণব-যান, বায়ুযান, কামান আর গোলা এমন কি আধুনিক তত্ত্বের জ্ঞান তা সবই আমাদের ছিল। বিশ্বের সব কিছু শ্রেষ্ঠত্বের মহিমায় ছিল এই ভারত গৌরবোন্নত। আর সেই বিগত যুগের অতীত উপকরণ নিয়েই আমাদের এই মহান ভারতের পরিচয় আর তার প্রজ্ঞাময়-ইতিবৃত্তের পূর্ণতর রূপায়ণ।

কিন্তু সমস্যা এর বিচার-ধারা নিয়ে। আমাদের এই 'মহান ভারত' লিখিত হবে কোন্ মতে আর কোন্ পথে? আর সে ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্যই বা কি? সেকথা বলতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে 'ইতিহাস' কথাটির মানে কি?

ইতিহাস অর্থে ইতি-হ-আস অর্থাৎ যে গ্রন্থে ইহা নিশ্চয় আছে বা তাহাই লিখিত হয় যাহা নিশ্চয় হইয়াছে। ইতিহাস শব্দের অর্থ ইতি (এইরূপ) কিল (ঐতিহ্যের ধারা) আস (ছিল)।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, আখ্যান, উপাখ্যান, বাকোকঃ পুরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের রচনা-রীতির সহিত ইতিহাসকেও একশ্রেণীর পৃথক সাহিত্য-রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতেই যে প্রমাণ হয় শত পথ ব্রাহ্মণের মতন প্রাচীন গ্রন্থের পূর্ব্বেও ইতিহাস ছিল। ইতিহাসের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ আছে অথর্ব্ববেদে। পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যান, উদাহরণ, ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে যাতে জানা যায় কৌটিল্যও তাকেই ইতিহাস বলেছেন।

আমরাও তাই এই 'মহান ভারত' ইতিহাস গ্রন্থে লিখতে বসেছি ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, সৃষ্টিক্রম, অভিযান, উপনিবেশ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শাসন আর শিল্পের কথা।

এখন কথা, ইতিহাসের সব উপকরণইত আছে ছড়ানো ভারতের শাস্ত্রে ও সমাজে; তা' ছাড়া আধুনিক ইতিহাসের তো অবধি নেই। বুত কেন এ উদ্যোগ পর্ব্ব ? আবার ইতিহাস লেখার নতুন পালা কেন ? এই গ্রন্থ আমরা লিখবো তাঁদের জন্য, যাঁরা আমাদের প্রাচীন সব জানতে চান অথচ সংস্কৃত ভাষা তেমন জানেন না, অথবা কাজের চাপে অবসর পান না অথচ আছে উৎসাহ আর আকুলতা, তাঁদের মনের মতন করে সোজা কথায় বেদ-পুরাণ, সাহিত্যের ধারা ধরেই চলবে ভারতের ইতিহাস। এইটুকুই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

তবে এখানে এই কথাটি বলে নিতে চাই—যাস্ক নিজে বলে গেছেন—"উপসন্নায় তু নিব্রূয়াৎ যো বালং বিজ্ঞাতুং স্যান্মেধাবিনে তপস্বিনে বা"—যাকে তাকে বিদ্যার কথা ব'লো না, যে সাধনা করতে চায়, মেধাবী, তাকেই বল শিক্ষার কথা।

নিরুক্তে আছে, স্বয়ং দেবী বাক্ এসে বললেন স্রষ্টাকে—

"অসূয়কায় অনৃজবে অয়তায় ন মাং দাঃ, বীর্য্যবতী তথা স্যাম—"

—হিংসুক অবিশ্বাসী, মিথ্যাচারীর হাতে আমায় দিও না—তবেই আমি থাকবো বীর্য্যবতী।

গোড়ার কথা

গল্প শুনতে মানুষ চিরকাল ভালবাসে। ছেলে বুড়ো সবাই চায় গল্প শুনতে—গল্প শুনতে চায় সব দেশের লোক। শুধু বাংলা ভাষার ঠাকুরদাদার ঝুলি নয়, আরবের আরব্য উপন্যাস নয়—পঞ্চতন্ত্র ইশপ্ ফেবল থেকে সুরু করে রামায়ণ, মহাভারত, গ্রীক-পুরাণ আর আবেস্তা সব রকম গল্প শুনতেই চিরদিন মানুষ পাগল।

তবে তার মধ্যে কিছু গল্প উপন্যাস—বাস্তবের ছাঁচে ঢালা, কিছু গুজব আর কিছু সত্য। আবার সত্য গল্প কল্পনায় রঙীন হয়ে দেখা দেয় বৈকি? রঙীন হয় ব'লেই না কবির কাছে আর কথকের কাছে লোক গল্প শুনতে চায়।

কিন্তু ফল কি গল্প শুনে? ফল আছে বৈকি! মিথ্যে গল্প হয়তো শুধু সাময়িক একটা আনন্দ দিয়েই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সত্য যে গল্পে—দেশের সত্য ইতিহাস আছে যে গল্পে, আছে বাপ-পিতামহের পরিচয়, আমার দেশ-ভিটে-গাঁয়ের কথা, আমার জন্মভূমির অমৃতময় সম্পদের কথা তা' জানায় ফল আছে বৈকি!

গল্প হয়তো সাহিত্য বা কাব্যের মধ্যে জেগে ওঠে কিন্তু তার উৎস যে ভাবধারা তা আসে কৃষ্টির গোমুখী-পথে। আর সে গোমুখীর সৃষ্টিতো ঐ ইতিহাসেরই স্তব্ধ পাষাণের স্বপ্নভঙ্গে। ইতিহাস থেকে কৃষ্টি—কৃষ্টির ভাব থেকে সাহিত্য। আমাদের দেশের আদিম গল্পই তো রয়েছে বেদে, আদর্শ বাণীই তো আছে উপনিষদে। আবার তা একটু রঙিন হয়ে দেখা দিয়েছে পুরাণের পাতায়।

তবে সব মূল গ্রন্থই কিন্তু লেখা আছে সংস্কৃতে।

সেই সংস্কৃত লেখা প্রাচীন কথা অনেকে বুঝবে না। অথচ বুঝবার উৎসাহ আছে, আবার চটপট বুঝে আর জেনেও নিতে চান অনেকে—আমাদের এ 'মহান ভারত' তাদেরই জন্য হবে লেখা। যেমন করে বেদের কঠিন কথা আছে গল্পে—পুরাণের পাতায়।

আবার হয়তো পুরাণের গল্পও 'আজব দেশের তাজ্জব গল্প' বলে মনে হবে। সব দেশের সব পুরাণের গল্পই তো তাই—হয়তো কেউ কেউ যেমন ভাবেন তেমনি আমরাও মাঝে মাঝে সে গল্পকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করে সহজ ও আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত করে নেবার চেষ্টা করবো।

কিন্তু তারই বা দরকার কি? পুরাণ পুরাণ—আমাদের যা প্রাচীন ঠিক সেইটুকুই আমাদের গল্প। বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাইরে তা—তা সত্য মিথ্যার অতীতে। তাদের কথা খানিকটা সত্যি বলে যদি ধরেই নেওয়া যায়—ক্ষতি কি তাতে? হীরার খনিতে হীরার চাইতে মাটীর ভাগই তো বেশী। তবু তো সে হীরার খনি। যে সত্যিকারের মণিকার সে মাটি ছাড়িয়ে হীরাই নেবে। রত্নান্বেষীকে মনে-প্রাণে কুক্কুটবৃত্তি অবলম্বন করতেই হবে।

গল্প-গল্পই, তারও একটা দাম আছে। নইলে রামায়ণ, মহাভারত থেকে স্নুরু করে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথামালা, ঠাকুরদাদার ঝুলি সব শেষ হ'য়ে যেত, রসহীন হয়ে যেত সাহিত্যের বাগান। আনন্দহীন হ'য়ে যেত জীবন।

তবে যেখানেই কথা হবে একটু কঠিন, সাধারণ বিশ্বাস যুক্তির বাইরে—আমরা সেখানে তার প্রমাণও দিয়ে দেবো পরিশিষ্টে—গুণীজনের কথা আহরণ করে। জিজ্ঞাস্নু তা দেখে নিজের কৌতূহল মিটিয়ে নিতে পারেন।

বেদ পুরাণের সে সব গল্পে পাব আমরা পরমাত্মা বা ভগবানের কথা, তাঁর তৈরী গ্রহ নক্ষত্রের কথা—দেবতাদের কথা যাঁরা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, সৃষ্টির জন্য মহৎ গুণ নিয়ে জন্মালেন; তাঁদের কথা, যাঁরা দেবতাদের সন্তান হয়েও এই মাটীতে এলেন মানুষ হয়ে নেমে। এই মাটীর মানুষই দেবতা আর এঁরাই নানা ঋষি, মুনি, সাধক, তপস্বী হয়ে লিখলেন ঐ বেদ, উপনিষদ আর পুরাণ। কেউ হলেন ব্যাস, কেউ বাল্মীকি, কেউ বৃহস্পতি।

এই সব ঋষিদের মধ্যে অনেকের নাম হয়তো দেবতাদেরই নাম। আবার এক নামেই আছেন অনেকে। এখনও তো হচ্ছে

তা—মহাদেব ঠাকুর, সূর্য্য সেন, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী, আশুতোষ মুখার্জ্জী-এঁরা কি সব সূর্য্য, মহাদেব আর ইন্দ্র—আবার এক নামে নানা লোকের তো অভাবই নাই। তাই বেদ, উপনিষদ আর পুরাণে যখন দেখা যাবে বৃহস্পতি ঋষি, সবিতা দেবতা—বুঝতে হবে তিনি এই ঋষি বৃহস্পতি, ঐ গ্রহ বৃহস্পতি নন। বিবস্বান নাম দেখলেই সূর্য্য-দেবতা বা গ্রহকে বুঝলে চলবে না। এমন ভুল অনেক হয়েছে। গল্পই তৈরী হয়ে গেছে নানান রকম। একের টুপি অন্যের মাথায় চলে গেছে অজ্ঞাতে, অলক্ষ্যে বা কবি-কল্পনায়।

কি ক'রে এমন অদ্ভুত রকমের ভুল বেশ মানানসই করে চলে আসছে—সেটা আগে থেকে না বুঝলে ভুল আবার বেড়েই চলবে। তাই আগে বেদ উপনিষদ পুরাণের কথাই জেনে নেওয়া যাক্।

যখন প্রথম মানুষ হ'ল—থাকতে তো সুরু করলো জঙ্গলে—না আছে তাদের ঘরবাড়ী, না গায়ে এক টুকরো কাপড়—এ সব করবে কে? কে জানে সুতো কাটতে, কে জানে ইট গড়তে? তখন জঙ্গলে ছিল বাস, উলঙ্গ হয়ে বা গাছের ছাল জড়িয়ে দিন কাটতো, দিন কাটতো গাছের ফল আর বনের পশুর মাংস পুড়িয়ে খেয়ে। তারপর ধীরে ধীরে তারা সব শিখলো—শিখলো ঘর দোর বাড়ী করতে, যারা ভাষাটুকুও জানতো না, তারা আঁকতে শিখল অক্ষর—মনের কথা সেই রূপে ফুটিয়ে তুল্লো, বুনলো তাঁতে কাপড়—ধীরে ধীরে তারা সভ্য হ'ল—চাষ বাস সুরু হ'ল—তারা সমাজ গড়ে তুললো। সমাজ হ'লেই আসে বিচার, চিন্তা, কল্পনা ও ভাল মন্দের জ্ঞান। সমাজ হলেই মানুষ মনে করে অতীতের কথা,—বাপ-পিতামহের কথা, আর তারপর ধর্ম্ম মানে, পূজা করে।

মনের শক্তির জন্য আর দেহের সুখের জন্য তারা সে যুগেও যজ্ঞ সুরু করলো। পূর্ব্বপুরুষ, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্যের কথা মনে করে যজ্ঞ করতে লাগলো,—চল্‌লো তাদের স্তব আর গান। যজ্ঞের আচার আর সংযমে দেহ হ'ল সুস্থ, স্তব আর গানে মন হ'ল শান্ত—তারপর আরও পরে যাঁরা, তাঁরা অতীতের সব কথা, উপদেশ ভাল ভাল সব গানে গাইতে লাগলেন ঠিক যেন স্তব—সংস্কৃতে গাঁথা সে কথা আর কাহিনী।

লোকদের জানবার জন্য সেই সব অতীতের কাহিনী, ধর্ম্মের কথা, যজ্ঞের কথা, যে সব ভাষায় তাঁরা বলে যেতেন মুখে মুখে—তাই ঋকবেদ, যে সব গান গাইতেন তাই সামবেদ, ক্রিয়াকাণ্ড, ধর্ম্মকর্ম্ম চলতো যে সব নিয়মের মধ্যে তাই যজুর্ব্বেদ আর চিকিৎসা চলতো যাতে—আচার অভিচার, যুদ্ধ বিগ্রহের কথা ছিল যাতে তাই অথর্ব্ববেদ। মোটের উপর ঋক্, যজু, সাম ছিল শুধু পরলোক-চিন্তায় ও মুক্তি কামনায়—অথর্ব্ব বেদে আছে ইহলোকের কথা। পরলোকের বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের পথে তার আচার অভিচার ঐহিক জীবনকে করতো সুন্দরতর। এ ছাড়া আরও কয়েকটি বেদ হয়তো ছিল বা পরে হয়েছে!

তবে যাঁরা এ সব বলেছেন তাঁরা এ সব নাম ধাম দেননি। তাঁরা নতুন গড়া ভাষায় নতুন গড়া সমাজে তা ব'লেই গেছেন, বাপ ব'লে গেছেন ছেলেকে, ছেলে তার ছেলেকে, তারপর এক একজন ঋষি সেগুলোকে জোগাড় ক'রে গুছিয়ে, সাজিয়ে লিখে রেখে গেলেন। এই সাজান গোছানকে, ভাগ ভাগ ক'রে লেখাকে বলে 'ব্যাস' করা। এখন বেদকে যিনি ব্যাস করলেন, তাঁর নাম হ'ল "বেদব্যাস" —সম্পাদক। যে সম্পাদন করে সেই সম্পাদক। যে ব্যাস করে বেদ —সেই বেদব্যাস। সে রকম আবার আঠার জন বেদব্যাস আছেন। তার মধ্যে দ্বীপে জন্ম, কাল রংয়ের একটি মানুষ—তাঁর নামই প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস তিনি।

বেদের মধ্যে সাজিয়ে রাখলেন তিনি প্রতিজনার মর্ম্মের কথা, ধর্ম্মের কথা আর কর্ম্মের কথা—সব জানার কথা।

তারপর আরও অনেকে অনেক রকম করে সাজালেন। আর তারই কথা নিয়ে, লিখলেন অনেক তত্ত্বকথা। বড় বড় নীতি, উপদেশ, পরকাল, ইহকালের কথা, জীবের কথা, ঈশ্বরের কথা। উপদেশ আর কাহিনীতে সাজিয়ে এক এক ঋষি গড়ে তুলেন এক একখানা উপনিষদ।

তারপর আবার নানা রকম বিচার করে হ'ল শ্রুতি, দর্শন স্মৃতি। ঋষি প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখে যা লিখেছেন, তাই প্রকৃত

দর্শন, যা বিচারের কথা তাই ন্যায়, শুনে একজন আর একজনকে বলতো তাই শ্রুতি, যা মনে রাখা হত তা স্মৃতি।

বেদ আর পুরাণে আর এই সব শাস্ত্রের গল্প নিয়েই আমাদের গল্পের আসর। কেমন করে হ'ল মানব, কি করে এল তারা স্বর্গ থেকে মাটিতে, কি করে হল বংশবিস্তার, আবার কি ভাবে তারাই একদিন করলেন বেদ ও জ্ঞানের প্রসার, কি করে রচিত হ'ল দর্শন, উপনিষদ, গড়লো সমাজ, হ'ল শাসন, বাড়লো বিজ্ঞান, রাসায়নিক প্রয়োগ, আর কি করে প্রচারিত হ'ল ভূতত্ত্ব, সৌরতত্ত্ব এ সবই বলবো। এর কোনটাই তো আমাদের ধার করে সাগর পার থেকে আমদানী নয়—সব এই দেশের, এই সমাজের। সেই সবই তো ইতিহাস। তবে কেউ বলবেন বেদই শাশ্বত ইতিহাস—পুরাণ তারই উপর রং করা কল্পনা, আবার কেউ বলবেন ও বেদ পুরাণের চেয়ে প্রামাণ্য মনে ক'রবো সেই কথা যার সাক্ষ্য পাচ্ছি মাটির নীচে, তামার ফলকে, চৈত্যে আর শিলাস্তূপে।

অন্তর্মুখী সাধক কিন্তু তখন ব'লে উঠবেন "ভারতের ইতিহাস কি বলার জিনিষ গো? বাইরে ঢাক পিটিয়ে বলতে চাও ভারতের ইতিহাস"। কাব্য-কল্পনা যেমন কবির মনের জিনিষ বাস্তবের প্রকাশ্য রূপ নয়, দার্শনিক ভারতের ইতিহাস তেমনই অন্তরের অন্তরতম সম্পদ। নিগূঢ় সে বাণী। ভারতের ইতিবৃত্তে বলার কথা যত, না বলার কথা তার চেয়ে অনেক বেশী।

দুনিয়ার যত ইতিহাস, ইতিবৃত্ত, ইতিকথা আছে—সাল, তারিখ, মাসের কোঠায় ফেলে, দেশ, প্রদেশ বা মহাদেশের মাটিতে, রাজা, মহারাজা প্রজার গল্পে,—স্থান, কাল পাত্রের মানদণ্ডে তা রচিত, লিখিত বা কথিত বটে। কোথাও তা পিরামিডের কবর খুঁড়ে, কোথাও তা মীনারের মাথা ঘিরে, কোথাও তা ভূ-প্রোথিত অস্থি-কঙ্কালের গঠন থেকে, কোথাও বা ধাতু তৈজসের বাসন দেখে। প্রাগৈতিহাসিক সে দৃষ্টি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে সার্থক করেছে—ভারতের ইতিহাস লিখতে গিয়ে আবিষ্কারের বাহবা নিয়ে, সৃষ্টি-তত্ত্বের "সত্য" বলতে গিয়ে মেরু, সপ্তদ্বীপ, আর্য্যনিবাস, ঐ-জিন-

বারো কত ঠাঁইয়েরই না হদিস জুটেছে—দ্রাবিড়, আর্য্য, অনার্য্যের কাহিনী গজিয়েছে—সূর্য্যবংশের চন্দ্রবংশের কীর্ত্তিকথা ছড়িয়েছে।

কিন্তু ভারতের ইতিহাসকি তাই? ভারতের ইতিহাস লিখতে গিয়ে কি কলহ হবে তার মাস, তারিখ নিয়ে—তর্ক উঠবে ভারত আগে না রোম আগে, এশিয়া আগে না ইউরোপ আগে—কোথায় সৃষ্টির আদিভূমি? কে সৃষ্টির আদিপুরুষ?

সাধনসিদ্ধ ঋষিও উপনিষদের গোড়ায় এই জিজ্ঞাসা করছেন—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি"

"কার ইচ্ছানুসারে প্রেরিত হয়ে মন স্ববিষয়ে ধাবিত হয়, প্রথম প্রাণ কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হ'য়ে গমন করে, কার ইচ্ছায় লোক বাক্য উচ্চারণ করে, চক্ষু, শ্রোত্রাদিকে কোন্ দেবতা নিযুক্ত করেন?"

তখন সে মহাজিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে মানুষ কি বলেছে? দাম্ভিক মানুষ, আত্মপ্রত্যয়ে যখন সব ইতিহাসের কথা, সৃষ্টির কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে বহির্মুখ হ'য়ে বহির্বিশ্বের পরিচয় দিতে ও নিতে গেল, তখন সে থমকে দাঁড়াল এই প্রশ্নে—থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকাল, বহির্মুখ গতি তার অন্তর্মুখী হ'য়ে সজাগ হ'য়ে উঠলো—বাহিরের জ্ঞান, বিজ্ঞান ইতিহাস হ'য়ে গেল রুদ্ধ: হতবাক, স্তব্ধ। গুঞ্জন করে উঠলো অন্তর্মুখী ধ্বনি—বুঝিব সে প্রাণ ধ্বনি—ভারতের সত্য ও তত্ত্বকথা উদ্ঘাটিত হ'ল।

মন তখন জানতে চাইল কে সৃষ্টি করেছে। কি সৃষ্টি করেছে? আর কেনই বা সৃষ্টি করেছে।

ভারতের ইতিহাস শুধু জানতে চাইবে 'কোদদর্শ প্রথমং জায়মানম্' —বাদরায়নের প্রশ্ন "অথা তো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা," জৈমিনীয় প্রশ্ন "অথা তো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"—। ব্যাস বাল্মীকির মাথার খুলির মাপ করে সত্য লোক—জনলোকের মানচিত্র সাইবেরিয়া ও চীনের বুকে এঁটে দিয়ে—খৃঃ পূর্ব্বের নজির দিয়ে সত্য ও ত্রেতাযুগের নির্ণয়

করলে তা হবে না।—তাই পরম জ্ঞানী যাঁরা তাঁরা বললেন, ভারতের ইতিহাসের প্রথম বিচার-পদ্ধতি হচ্ছে ভারতের মর্ম্মবাণী দিয়ে। আত্মিক ব্যাখ্যা, পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীই সে বিচারের মাপকাঠি।

আধুনিকরা হয়তো বলবেন তবে কি ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্বন্ধই থাকবে না? ইতিহাস রচনা করতে গেলে কি প্রথমেই খুঁজতে হবে নৈমিষারণ্য, আর জৈমিনী যাজ্ঞবল্ক্য বা বেদ ও উপনিষদ? পারলে তো ভাল হ'ত হয়তো সত্য যা তা পেতাম—কিন্তু বাহ্যজগৎ তাতে তৃপ্ত হবে কি করে?—কি ক'রে বাস্তবজীবী আমরা ঐ ভূমার আনন্দের আশায় বসে থাকি। তাই বহির্মুখী মন বারমুখো স্বভাব ছাড়তে পারেনি। ইহলৌকিক জগতের একটা খসড়া করেছে—আজ তাই ভারতের ইতিহাস ব'লে ছড়িয়ে পড়ছে ইহলোকের মানুষের কাছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস তো তা নয় আর তা নয় বলেই সে যুগের মহাজ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা তাদের ঐহিক ইতিহাসকে অমর করে রেখে যাবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেননি। তাঁরা বৃত্রাসুরের বধের জায়গায় মীনার গড়ে যাননি, তা'রা গীতার ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে রথবেদী স্থাপন করেননি।

তাঁরা ভূমিকে ছেড়ে দিয়ে ভূমার সাধনা করেছেন। জেনেছেন "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি. ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।" ভূমা—সেই অব্যক্ত পরমানন্দময় পরমাত্মা—অল্প এই সংসার বিষয়ের অল্পতা। "ভূমা" আর "অল্প" বোঝাতে ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেছেন—যেখানে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু দেখে না, অন্য কিছু শোনে না, অন্য কিছু জানে না, সেই ভূমা, আর যেখানে অন্য দেখে, অন্য শোনে, অন্য জানে তাই অল্প। ভূমা তাই অমৃত—মৃত্যু তার নেই আর যা অল্প তাই মৃত্যুশীল।

অতএব দুদিনে যা ফুরিয়ে যাবে, তার মাপকাঠি আর ঠিকুজী, কুলুজী, দিয়ে কি যথার্থ ইতিহাস হয়—একটা জাতির, একটা কৃষ্টির, একটি জ্যোতির? তার ঠিকুজী তৈরী হবে তাই দিয়ে—যা অক্ষয়, অব্যয়, আনন্দময়। "রসো বৈ সঃ"—আনন্দময়ই তার রূপ।

তবু "হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং"—ঝকঝকে একটা সোনার ঢাকনা দিয়ে সত্যের হাঁড়িটি ঢেকে রাখাই হয়েছে আজকালকার পাণ্ডিত্য। সত্য জানবার আকাঙ্ক্ষাটুকু হ'য়ে রয়েছে "অমৃতাপিধানাঃ" অর্থাৎ মিথ্যা দিয়ে আবৃত।

তবে যদি তর্ক ওঠাই—যদি ঐ কঠিন কথাগুলি নাই বুঝি তবে সত্যের ইতিহাস জানব কেমন ক'রে—কি তার উপায়?

কত সোজা করেই না তার উপায় বলেছেন আমাদের উপনিষদ। মোদ্দা কথা তার—"রথ" যখন তোমার চলে—রথে বসে ভাবছো—চলছে রথ, হাঁকাচ্ছ তুমি—কত দেশ-বিদেশে, কত পথে কত মাঠে। কিন্তু বলতে পার ঐ রথ চালায় কে? উত্তর "চাকা"। কিন্তু চাকাটা গড়ে উঠছে কার উপর? উত্তর হবে 'অর"—মানে যে কাঠ-গুলো রথের মাঝখানের ধুরোর সঙ্গে রথের বেড়াটায় জোর খাইয়ে রেখেছে। ধুরো একটা, তা থেকে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকের, টুকরো কাঠ—সেগুলো "অর"। এখন ঐ ধুরো বা "রথনাভি" যদি না থাকে, 'অর' বা শলাগুলো আটকাবে কিসে, না আটকালে চাকা হবে কি করে? চাকা না হলে রথই যে চলবে না! তবে কি রথের মালিক তুমি না ঐ রথ, চাকা বা ধুরো?

উপনিষদ্ বল্লেন

"অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মাবো মৃত্যুঃ পরিব্যথা।"

পরমবেদ্য যে পুরুষ তারই ষোড়শ কলারূপ ঐ শলাকা সমষ্টি আমাদের জীবনরথের চালক। ষোড়শ কলায় অরূপের প্রকাশ—অপূর্ব্ব এক অভিব্যক্তি! সমস্ত জগৎ দেখতে শুক্লপক্ষের মতন আলোয় ভরা। কিন্তু শুক্লপক্ষের এক এক কলা বৃদ্ধি মানে কৃষ্ণপক্ষ এসে গেল কাছে। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের এক এক কলা যদি বাড়তে পারে—শুক্লপক্ষ তো হাতের কাছে। তাই বাইরের জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো—শুক্লপক্ষের মতন হয়তো তীব্র, কিন্তু পরিণাম সেই অমাবস্যা—ঘোর অন্ধকার। কিন্তু মনকে জ্ঞান ও বুদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অর্থাৎ অন্তর্নিহিত গভীরের মধ্যে

ডুবিয়ে, যদি কৃষ্ণপক্ষেরই মতন এক এক কলা বাড়াও দেখবে একদিন ভিতরেই উদয় হয়েছে পূর্ণচন্দ্র। কি করে হবে? এর সহজ উত্তর—

"ইন্দ্রিয়েভ্য পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ,
মনসস্তু পরা বুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ,
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ,
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"।

সকল ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি মানে অনুভবের আকরগুলি সূক্ষ্মতর, তা থেকে সূক্ষ্ম মন, মনের ঊর্দ্ধে বুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে মহান্ আত্মা। এই মহত্তত্ত্বের উপরে অব্যক্ত, অব্যক্ত তত্ত্বের উপরে পুরুষ, সেই পুরুষই পরম পুরুষ, পরাকাষ্ঠা—পরমাগতি। ধীরে ধীরে মনকে বুদ্ধির পথে এনে, ঐহিক ইতিহাসকে ডিঙ্গিয়ে বহির্মুখী প্রতিভাকে অন্তর্মুখী করলে তবে ভারতের সত্য ইতিহাস বলা হবে। না হলে যা বুঝবো বা শুনবো যা দেখবো, মোটা বইয়ের বাঁধানো মলাটের মধ্যে তা ভুলের রসদই জুগিয়ে চলবে। আমাদের সে ইতিহাস দেখে, সত্যদ্রষ্টা যাঁরা তাঁরা হাসবেন, বলবেন—"কি অনধিকার চর্চ্চা, কি স্পর্দ্ধা এদের যে অপৌরুষেয় বেদোপনিষদকে ভেঙ্গে, সত্যলোক মর্ত্তলোককে টেনে সাইবেরিয়া আর নর্থপোলে বসিয়ে, বশিষ্ঠের আশ্রমের গরু চুরির গল্প লিখে, ব্রহ্মাব্দের কাল খৃষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করে কত বাহাবাই নিচ্ছে।"

কিন্তু না নিয়েই বা করি কি? যারা প্রথম "ক খ গ" শিখবে তারা "অজ্ঞেয় তত্ত্বে" পৌঁছয় কি করে? তাই ভারতের ইতিহাসের নানা ব্যাখ্যা শুনতে হবে বৈকি? প্রথমে সহজটাকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে জ্ঞানের পথ দিয়ে, আলোর মধ্যে এসে চিন্ময়ের সাধনায় মিশে যেতে হবে।

বাইরের ইতিহাস ভেদ করে তখন অন্তরের ইতিহাস উঠবে জ্বলজ্বল করে। সে ইতিহাসও তো প্রয়োজন তাই বলছিলাম ভারতের ইতিহাস বলতে আগে পাই পারমার্থিক ইতিহাস—ঐহিক দৃষ্টির অতীত যা, আর অন্য ইতিহাস আছে পুরাণের পাতায়, কাহিনীর মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রে সমাজের অনুশাসনে।

প্রথমটার খবর যেমন দেয় বেদ, উপনিষদ, দর্শন—পরেরটার সংবাদ জানায় শ্রুতি—পুরাণ—স্মৃতি। এছাড়া আবার আর এক মতের দেখা পাই—সেটা অতি আধুনিক ব্যাখ্যা ও বিচার। তাঁরা বেদ পুরাণের মধ্যেও "অতি বাস্তবকে" কুড়িয়ে নিতে চান, তাঁরা গীতাকে ভগবদ্বাক্য বলেন না, বলেন কবির রচনা; বলেন গীতা অপূর্ব্ব গ্রন্থ কিন্তু ইতিহাস নয়—চণ্ডীর লীলাকে, রামরাজ্যকে যাদববংশ ধ্বংসকে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে সাম্যবাদের ছাঁচে ঢেলে জন ও গণের অগ্রগতি, অবসান ও পুনরুত্থানের ইতিবৃত্ত রচনা করেন। কবে ভারতে মাতৃসত্তা ছিল, কবে পিতৃসত্তা সুরু হ'ল, কবে আর্য্যরা বন্য ও অর্দ্ধ-বন্য ছিল, পরে কবে সভ্য হ'ল—তারই করেছেন বিচার। বিচারের এই ত্রিবেণী সঙ্গমের মাঝে আমরা পাই,—

উপনিষদের পারমার্থিক ভারত
প্রাগৈতিহাসিক ও পৌরাণিক ভারত
আধুনিক ঐতিহাসিক ভারত।

বেশ একটা লাগসই নাম দেবার জন্য বরং বলা যেতে পারে, অবশ্য তা সবদিক দিয়ে ঠিক হয়তো হবে না—তবু নাম দেওয়া যেতে পারে—ভারতের মর্ম্মবাণী, ধর্ম্মবাণী আর কর্ম্মবাণী। ভারতের সবই তো 'ত্রি' নিয়ে—বেদ তিনটী, শক্তি তিনটী,—তিনে প্রণব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রয়ীতে পূর্ণ সৃষ্টিক্রম, ত্রিধাতু, ত্রিদণ্ডী, ত্রিফল, ত্রিশূল, ত্রিনেত্র, ত্রিলোক—সবই তো তিন।

অতএব ভারতের ইতিহাসও তিনটী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাচাই করা যাক্ না! তবে আমরা বলবো বেদ, পুরাণের বাস্তব ইতিহাসেরই কথা বেশী, যা থেকে উঁচু পথের সিঁড়ি হবে সোজা। তারপর যে পারবে—যেতে চাইবে উঁচু পথে, পারমার্থিক মতে, সে ঐহিক জগত ছেড়ে যাবে উঁচুর দিকে। আর যে চাইবে চিত্তকে আরও বহির্মুখী করতে, সে অতি বাস্তবের তর্কভরা পথে নিজের মত কুড়িয়ে বেড়াবে। মাঝের যাঁরা তাঁদের সম্বল হবে তখন ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। মহান ভারতের এইটুকুই উদ্দেশ্য।

মত আর পথ

"যত মত তত পথ"—কোন্‌টা ধরে চলবো আমরা, আর কেন? উত্তরও দিয়েছেন আমাদের শাস্ত্র—

"বেদা বিভিন্নাঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥"

মহাজনের যে পথ সেই পথই—পথ।

এখন এ মহাজন কে? মহাজন মানে প্রাজ্ঞ যে জন। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিককে, ঐতিহাসিককে কি প্রাজ্ঞ বলব না? বলবো না ঐ পাথর কেটে মাটি খুঁড়ে যাঁরা অতীতকে টেনে এনে সামনে দাঁড় করালেন—তাঁরা প্রাজ্ঞ? বলবো না যাঁরা বাষ্পজান আর অম্লজানের মধ্যে সব 'জানার' রসদ জুটিয়ে, মাটির স্তর কেটে, সত্যের আবিষ্কার করলেন—তাঁরা প্রাজ্ঞ? প্রাজ্ঞ তো তাঁরা বটেই, তাঁদের মত আর পথও অসত্য নয়।

বিজ্ঞানের কাজ বস্তুর স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করা। বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের রথেই না বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। আধিভৌতিক ইহ-কালীন ঐশ্বর্য্যের রহস্য উদ্ঘাটনেই বৈজ্ঞানিক ব্যস্ত; কিন্তু ভারতবর্ষ অধিভূতকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেনি—অধিদৈব ও অধ্যাত্মের কথাই সে চিন্তা করেছে বেশী। আর ভারতের ঋষি তা' করেছেন বলেই বস্তুকে অতিক্রম ক'রে আত্মিক তত্ত্বময় ঊর্দ্ধতর শক্তির সন্ধান লাভ ক'রে হয়েছেন প্রাজ্ঞ—পেয়েছেন প্রজ্ঞা।

"সদসৎপদার্থস্বরূপং বিবিচ্য যে প্রকর্ষেণ জানন্তি—তে প্রাজ্ঞ।"

তবে কি বিজ্ঞান অসৎ, আর তত্ত্বজ্ঞানই সৎ? তা'ও নয়। প্রাজ্ঞরা ব'লে গেছেন জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রয়োজন—জ্ঞান প্রেয় কিন্তু বিজ্ঞান শ্রেয়। শ্রেয় ব'লে যাকে মানি, তাকে সবাই চাই—কিন্তু

প্রেয় থাকে লোকদৃষ্টির অতীতে—প্রিয় চিরদিনই গোপনচারী। শ্রেয় হ'ল মাথার বিচার, প্রেয় হ'ল অন্তরের।

শ্রেয় হ'লেও বুদ্ধি দিয়ে যা বিচার করি তার মধ্যে সৎ অসৎ মেলান থাকে,—কিন্তু বোধ দিয়ে যা পাওয়া যায় তার মধ্যে অসৎ ত্যাজ্য, গ্রাহ্য শুধু এক—"একৈবং।" তাই তো বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধের সাধনা—বুদ্ধের তখন বুদ্ধির অতীত বোধের সন্ধান মিলেছে—শুধু বুদ্ধিমানই তখন নন তিনি— তিনি তখন "বুদ্ধ"।

বিজ্ঞানের স্থান কিন্তু জ্ঞান-অজ্ঞানের সঙ্গমে। সুকল্যাণের পথে বিজ্ঞান-সরস্বতী কল্যাণী—আবার বিজ্ঞান-সরস্বতীই রুদ্রা অকল্যাণের চিতাশয্যায়। মুমূর্ষুর প্রাণ রক্ষা বিজ্ঞানের দান, আবার নিরীহ মানবের জীবন্ত সমাধি, ঐ বিজ্ঞানেরই মোহগর্ব্ব।

অতএব যে চাইবে শুধু কল্যাণ, শুধু সৎ, শুধু আনন্দ সে বিজ্ঞানের মোহ ছেড়ে এগুবে জ্ঞানের রথে—প্রজ্ঞার পথে।

প্রাচীন ভারত প্রজ্ঞার পথে এগুলেও, মহাকালের রথে ইতিহাস-ধারা এগিয়েছে আজ তিনটি পথে—বৈদিক ভারতের পথে, পৌরাণিক ভারতের পথে আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক পথে।

বৈদিক ভারতে পাই পারমার্থিক বিচার। আর তাই ভারতের মর্ম্মবাণী। পৌরাণিক ভারতে পাই কাহিনীগত বিচার অথচ বিশ্বাসে তাকে ধর্ম্মের কথা বলে মেনে নিয়েছি, তাই ভারতের ধর্ম্মবাণী। আর অতি আধুনিক বিচারে—কর্ম্মের মাধ্যমে গড়ে যে ইতিহাস, কিংবা —বিশ্বের খেলাকে বলে প্রগতি—তাই ভারতের কর্ম্মবাণী।

এই ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে যা অতি জটিল. সেই আধ্যাত্মিক মতবাদ, উপনিষদের তত্ত্বকথা, আমরা বুঝবো না, কিন্তু তা অস্বীকারও করবো না এ গ্রন্থে, কারণ যদি সে বিষয়ে থাকি নীরব—সে নীরবতা হয়তো অস্বীকৃতির সুর আনবে, তাই অতি সংক্ষেপে সে সবের আলোচনা করবো আমরা। আর অতি আধুনিক মতবাদও আমাদের মন মানতে চাইবে না—তাছাড়া সে মতের বিরাট বিশাল গ্রন্থেরও তো অভাব নেই। যাঁরা তা জানতে চাইবেন, মানতে চাইবেন, তাঁরা সেই সব গ্রন্থ আলোচনা করবেন বৈকি।

আমরা মানবো ভারতীয় সনাতন পথের সহজ ও সরল মতবাদ। ভক্তিরসে তা আপ্লুত—বিশ্বাসের কাঠামোয় তা তৈরী, নইলে সব প্রশ্ন, সব সমস্যা, সব কেনর উত্তরই যে পাবো না।

"কেন" আর কি—এর উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞান যখন হয় কোণঠাসা—জ্ঞান-সমৃদ্ধ প্রজ্ঞা, স্বতন্ত্র ভারতীয় সংস্কৃতি, তখন বলে "মাথা নেড়ে নৈরাশ্যের নিরানন্দ পাও কেন? বিশ্বাস কর সে এক পরমশক্তি—যাঁর এ লীলা। তাঁর কাছে ব্রহ্মাণ্ড কেন, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি মুহূর্তের খেলা। নইলে সাগর থেকে হিমালয় মাথা উঁচু ক'রে ওঠে কোন্ শক্তির সামর্থ্যে? আবার সাগর থেকে মরু জাগে কার ইঙ্গিতে? কি ক'রে বীজকোষে আসে জীব, জীবে আসে প্রাণের আলো, জাগে স্ফুরণ ও চেতনা?"

এর কোন উত্তর নেই। তবু ইতিহাস বলতে গিয়ে পণ্ডিতরা বলেন—এমনই করে প্রথম সৃষ্টি হ'ল মেরুপ্রদেশে, কেউ বলবে উত্তর মেরু হোথায়—কেউ বলবে হেথায়, কেউ বলবে ভূ, ভুব, মহ, জন লোক সব ঐ সাইবেরিয়া, চীন, তিব্বত প্রভৃতি। কেউ বলবে না অপোগস্থান বা আফগানিস্থান ঐ ভুবর্লোক—কিন্তু কেউ কি বলবে এই তার নিদর্শন? অথচ প্রাচীন ভারতে প্রাচীন ঋষি, প্রাচীন সেই বেদোপনিষদের মাধ্যমে যা বললেন, তার পারমার্থিক ব্যাখায় দেখি—পরমাত্মা যে মন্দিরে বা লোকে বিরাজিত, যে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত তা এই দেহভাণ্ড! এই দেহেই তার সৃষ্টি—এই দেহেই তার স্থিতি আবার এই দেহেই তার লয়। দেহ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে বিদ্যমান সেই মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডের উপরে সর্ব্বোচ্চভাগে, সহস্রার চক্র যেখানে, সেইটাই উত্তর মেরু বা সুমেরু; আর সর্ব্বনিম্নে মূলাধার চক্র যেখানে, সেই তো কুমেরু বা দক্ষিণ মেরু। সমস্ত জৈবিক প্রবাহকে নিয়ে আমাদের এই দেহটাই হয়ে রয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কত কোটি দেহ দেখি, তাই তো জানি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড। এই দেহ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আছে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র—আছে পাহাড়, পর্ব্বত, নদ ও নদী।

ভূ, ভুব, স্ব প্রভৃতি সপ্তলোক সেই দেহভাণ্ডেরই সন্নিবিষ্ট।

তন্ত্রোক্ত সে চতুর্দ্দশ ভুবন কি বাস্তব বিশ্বের মানচিত্রে পাওয়া যায়? সেখানে সৃষ্টির আদিস্থান, বলতে গিয়ে মেরুলোককে নির্দ্দেশ করেনি। সে আদিস্থান যে দেহের সহস্র-দল কমলে শোভিত! আদিস্থান থেকে সে আর্য্যের দল ক্রমে নিরুদ্দেশে অগ্রসর হ'য়ে ভারতে উপস্থিত হ'ল, তাদেরই সাধনা সুরু হ'ল আবার সেই আদিস্থান ব্রহ্মলোকের দেবতার উদ্দেশে। এর অর্থ কি এই যে, মেরুস্থলের মানবগোষ্ঠী সাইবেরিয়া, চীন, তিব্বত, পেরিয়ে কাশ্মীরের পর ভারতে এসে, যাগ-যজ্ঞ আর উপাসনার পুণ্যে আবার মেরুস্থানে, বরফের পাহাড়ে গিয়ে উঠবে? না—তার জন্য সে সাধনা নয়।

তাঁরা বলেন, ঐ সহস্র দল কমল অধোমুখ হয়ে তোমাকে সপ্ত ব্যাহৃতি পরিক্রমায় টেনে এনেছে ঐ নীচের ক্ষিতিতলে। আপন সাধনায় নিজের শক্তিকে আবার উদ্ধ'গামী ক'রে ষটচক্র ভেদ ক'রে, ছয়লোক ডিঙ্গিয়ে উঠে যাও সহস্র-দলের সেই সপ্তমলোকে—ব্রহ্ম-লোকে। সে উদ্ধ'গতির ক্ষমতা হয় যে পরম সাধনার বলে—তাই ভারতের প্রকৃত সাধনার জ্ঞান। আর্য্য ভারতের এই স্থান নির্দ্দেশ, এই ব্রহ্মাণ্ড বর্ণনা বা সেই লোকপ্রাপ্তির সাধনা কি সাধারণ?

সে বিচার বা সে জ্ঞান আহরণ করতে হবে গুরুর কাছে।—তা জানলে ঐ নদ-নদী, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তবে না পৌঁছবে ব্রহ্মাণ্ড থেকে ব্রহ্মের কাছে। তাই তো উপনিষদ বললেন—

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যম্ উচ্যতে
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যম্ শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ

"ওঁকারই ধনু, জীবাত্মাই শর, ব্রহ্ম তার লক্ষ্য—অপ্রমত্ত হইয়া বিদ্ধ করিতে হইবে। তারপর শরবৎ তন্ময় হইয়া থাকিবে।"

বেদ বা পুরাণ আমাদের ভূ-তত্ত্ব বা ভারতেতিবৃত্তের যে পরিচয় দিল, উপনিষদ তারই প্রকাশ করলো অন্য পরিপ্রেক্ষিতে, অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে, অন্য প্রজ্ঞা বলে। স্থানের পরিচয় দিতে গিয়ে বেদ যখন বলে ইলাবৃত বর্ষ, জনলোক, তপলোক, ভূ-লোক, ভূবর্লোক; পুরাণ যখন বলে কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, কাশী, বৃন্দাবন, তখন উপনিষদ দেখালো নিত্য ধ্যেয় গায়ত্রীর মন্ত্র ও সপ্ত ব্যাহৃতি।

পুরাণের কাশী সেখানে দেহ কাশী, প্রয়াগের ত্রিবেণী—ইরা, পিঙ্গলা ও সুষম্নার সঙ্গম। এমন কি বৃন্দাবনের গোষ্ঠলীলার মধ্যেও, দর্শন দেখে—ইন্দ্রিয়রূপে গো-পাল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় ক্ষেত্রে বিচরণ ক'রে রাত্রের অন্ধকারে চিত্তাকর্ষী বাঁশীর সুরে অন্তর্মুখ হয়ে—গৃহে অর্থাৎ অন্তরে ফিরে যায়।

এমনই করে তাঁরা করেছেন স্থানের বিচার; আবার কালের বিচারে বেদ বা পুরাণ যখন আর্য্য আগমনের সময় নির্দ্ধারণ করেছেন—করেছেন যুগ ও মন্বন্তরের সীমাপাত, তখন উপনিষদ বলেছেন কাল অনন্ত, অপার, অসীম। পাত্রের বিচারেও পুরাণের বশিষ্ঠ-কামধেনুর কাহিনীতে সত্যদ্রষ্টা পেয়েছেন—প্রকৃত তথ্য।

সে এক অপূর্ব্ব তথ্য! শব্দ-ব্রহ্মের অপূর্ব্ব অনুভূতি!

মূল থেকে উৎপত্তি হয় শব্দের, শব্দকে অনুসরণ করে অর্থ। সাধারণ আমরা কি জানি! আমরা জানি আগেই হয় জিনিষ আর তাকে দেখে, বলি তার নাম—অর্থাৎ শব্দ। অর্থের পর শব্দ। কিন্তু অসাধারণ যাঁরা, তাঁরা আগে ইচ্ছাক্রমে বলেন শব্দ তখন তার অর্থ তাকে অনুসরণ করে, শব্দের আধার জন্মায়। তাঁরা বলেন, বাক্‌সিদ্ধির গুণেই তাই হয়; তবে তাঁদেরই হয় যাঁরা অসাধারণ, যাঁরা "ব্রহ্ম" জেনে হ'য়েছেন ব্রাহ্মণ।

বশিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ—তাঁর ইচ্ছা মানেই কামধেনু—যা চান তাই পান।

বিশ্বামিত্র মানে রজশক্তি। রজশক্তি সত্যতত্ত্বকে হরণ করতে চায়—কামধেনু চান বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছে, চান—যা হবে কামনা তাই হবে সিদ্ধ। পুরাণের কাহিনী দর্শনের চরমে পৌঁছয়।

প্রতীচ্যের দর্শনও বলে—"God said let there be light and there was light."—

ইচ্ছা হ'ল বল্লেন—তবে অর্থ রূপ নিল।

শুধু কি তাই। এই যে প্রণব মন্ত্র, এই যে মাত্রা বা শব্দ, এর মধ্যেও উপনিষদ পেয়েছে আত্মার সাড়া—ব্রহ্মের ইঙ্গিত। শব্দ-ব্রহ্মকে মহর্ষিরা তাই মন্ত্রশক্তির মূল বলে জেনেছেন।

সেখানে দর্শনের ইঙ্গিত হ'ল গোড়ার যে জিনিষ তিনি পুরুষ। তাঁর সে জ্যোতির প্রকাশ নেই, শব্দ নেই, বর্ণ নেই। অপ্রকাশ, অব্যক্ত, অবর্ণ সেই পরম চিৎশক্তি হলেন অনুত্তর!

অনুত্তর থেকে পেলাম "অ"। সেই অনুত্তর বা অব্যক্তের "অ" থেকে, অপ্রকাশ অরূপ আর এক "অ" বর্ণ এল বেরিয়ে। দুই "অ"+"অ" মিলে হল "আ" বা আনন্দ। যুগল "অ" এর মিলনে হল আনন্দের উৎপত্তি।

সেই আনন্দ যখন ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়—পাত্র কাণায় কাণায় ভরে যায়, তখন পূর্ণ পাত্রের বাইরে যা পড়ে ছাপিয়ে—তারই নাম নিরানন্দ। এই নিরানন্দ বা আনন্দের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন ইচ্ছাশক্তি। তাই বুঝি বলি 'ই"।

এবার ঘনীভূত ইচ্ছা বা "ঈষণ" যখন প্রকাশ পায় তখনই তো পাই আমরা 'ঈ"।

ইচ্ছা বা ঈষণ পূর্ণ হ'ল—আনন্দ বা নিরানন্দে পাত্র পূর্ণ হয়ে চল্লো—ঘনীভূত আনন্দের সে ধারার মধ্যে প্রকাশ পেল এক অপূর্ব্ব আলোকচ্ছটা, এক নূতনতম মহত্তম জ্ঞানের উন্মেষ। আমরা পেলাম সেই উন্মেষের "উ"।

তখন সে জ্ঞানের শুধু উন্মেষ হ'ল, কিন্তু সাধনার পথে সে জ্ঞানের ঊর্মি উঠলো যখন তরঙ্গ দেখা দিল। সেই ঊর্মির মধ্যেই পেলাম আমরা 'ঊ"।

তারপর ঋ—ঌ বা এ—ঐ, ও—ঔ, এগুলি আগের পাওয়া সেই শক্তিরই ক্রিয়ারূপ। অ, ই মিলেই তো এ। শক্তি আর ইচ্ছা মিলেই ক্রিয়া। এখন চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া সব যখন শেষ হল, "ঔ" তে এসে সব কিছুর অবসান হল, তখন —সে ধারা, সে প্রবাহ সব এসে শেষে মিল্‌লো একটি বিন্দুতে। আর সেই বিন্দুই হ'ল "ং"।

বৃত্তানুরূপ গতিতে ঐ বিন্দু সমস্ত জীবন, জগৎকে ব্যাপ্ত ক'রে ঘুরে আসে সেই জ্যোতিতে। এসে "অ" তে মিশে---হয়ে যায় 'অং"।

আবার ঐ বিন্দু যখন ঘুরে এসে মিলিত হয়, আর একটি

বিন্দুর সঙ্গে, সৃষ্টির কার্য্য যখন বৃত্তরেখা শেষ করে জ্যোতিতে মিলে যায় তখন হয় সংহার আর তাই হ'ল "ঃ"।

এর পর যে ব্যঞ্জন বর্ণ বা বর্গীকরণ তারও এমনিই সব অর্থ আছে। প্রতিটি অক্ষরের শেষ হল "ক্ষ" এবং "হ্"। "ক্ষ" মিলিত শব্দ। ওটা সাক্ষাৎ স্বরূপ, কূট-সিদ্ধি। আসলে বর্ণমালার শেষ অক্ষর ঐ "হ্"।

'অ" থেকে যার সুরু 'হ" তে তার শেষ; আর তাতে মেলে সারভূত বিন্দু "ং"। তাই তো সর্ব্বসিদ্ধিতে পাই "অহং"। এই যে "অহং"—"সোহং" তার থেকেই এই সব—এই 'ইদং"।

ইদং বিশ্ব মানেই অর্থের হল প্রকাশ, শব্দ থেকে হ'ল অর্থ।

সহজ বা সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা 'জল" থাকলে তবে না শব্দ বা বাণীতে বলবো 'জল"। কিন্তু ভারতের সেই মহাজ্ঞানী, মহাসিদ্ধ যাঁরা, তাঁরা যে শব্দ উচ্চারণ করতেন, বাক্‌সিদ্ধির ফলস্বরূপ অর্থ তাকেই অনুসরণ করতো। শব্দের মাধ্যমে ইচ্ছা হওয়া মাত্র বিষয় বা অর্থ এসে হাজির হ'ত।

চিৎশক্তি উদ্ভূত সে শব্দের তো ক্ষরণ নেই। অক্ষর সে বর্ণ-মালাকেও তাই বলি অক্ষর। অক্ষর থেকে সর্ব্ব বিষয়ের উৎপত্তি। শব্দ থেকে অর্থের উৎপত্তি। আগে বাণী তবে ফল।

হয়তো অনেকে বলবে অক্ষর বা পরমানন্দময় থেকে যদি বিশ্বের সব কিছুর সৃষ্টি, তবে আবার বিশ্বভরা এ দুঃখের, এ নিরানন্দের ছড়াছড়ি কেন? সবই তো হ'তে পারত আনন্দময়।

আনন্দময় সচ্চিদানন্দ সকলের মূলে থেকেও বুঝিয়ে দিতে চান —নিরন্তর আনন্দ ও নিরানন্দ ক্রম-বিবর্ত্তনেরই প্রকাশ। চাকা ঘুরে আজ হয়তো যেমন নিরানন্দ আনছে, নিরানন্দ এলেই তেমনই বুঝতে হবে ঐ আনন্দ এলোরে।" দুঃখের মধ্যেও যে আছে আনন্দের এক রস। নিরানন্দের পাত্র পূর্ণ হলে বুঝতে হবে এবার তা' উপচে আনন্দের আধারে পড়বে। নিরানন্দের ভাণ্ডার শেষ হ'লে আনন্দের কুঠুরী খুলে দেবেন দয়াময়!

আর তাই তো হয়—তাই নিয়েই তো যত—কাব্য—রস—

আনন্দ। শকুন্তলা বা সীতার করুণ চরিত্রের অভিনয়ে দুঃখ চরমে উঠে, চোখের জলে দর্শককে ভাসিয়ে দেয়। সব দর্শক, জানে যে তা নিছক অভিনয়, তবু সেই অনুভব পরম সত্য হ'য়ে দেখা দেয় তার রসে, তার মধ্যকার আনন্দে —।

এই যে তত্ত্বকথা—এ কি ইতিহাসের পাতায়, ভূগোলের বিবরণে পাওয়া যায়! এমন কি, সে কথা পাওয়া যাবে না পুরাণের কাহিনীতেও। ভারত এই কথাই বলেছে তার উপনিষদে, তার বেদান্ত-দর্শনে।

বেদ বেদান্ত উপনিষদের দেশে—সৃষ্টিতত্ত্বও, নির্ণীত হয়েছে অপরূপ এক পথ ধরে। সে পথে দেখি ত্রিবিধ সৃষ্টি, তন্মধ্যে প্রথম আণব—সেই আণব থেকে পাই দ্বৈতকে। তারপর শক্তি, এর মধ্যে দ্বৈত ও অদ্বৈতের মিলন। এইখানে চিত্ত হ'ল সমৃদ্ধ—হ'ল মিলন, হ'ল আনন্দ—হ'ল সৃষ্টি। তারপর তারই মধ্যে প্রকাশ অদ্বৈতের। সেই অদ্বৈতেই হয় "চিত্ত-প্রলয়।" প্রথম সৃষ্টিতে জীব জন্মে, তারপর জীব ও শিবের মিলন, জন্ম ও স্থিতি, তারপর জীবের বিনাশ। জীব গিয়ে শুধু শিব রইল। শিবময় হয়ে গেল সব।

এই সৃষ্টি রহস্যে—হংস কূর্মের কল্পনা, বা নরসিংহের কল্পনার চেয়ে উঁচু কথা বলে গেছে সেই প্রাচীন ভারত। সে ভারত জম্বুদ্বীপ বলতে ভারতবর্ষকে বলেনি, দধি-দুগ্ধের সাগর ঘেরা সপ্তদ্বীপ বলতে সাগর-বুকে হানা দেয় নি—রক্ত, মেদ, লবণ, শর্করায় ঘেরা এই শরীরকেই বুঝিয়ে দিয়েছে।

এ সৃষ্টিতত্ত্ব, ঐ বশিষ্ঠ কাহিনী, ঐ শব্দ ব্রহ্ম, ঐ সপ্ত ব্যাহৃতি, ঐ ষট্‌চক্র, এ সব যে দৃষ্টিভঙ্গী বা বিচারের বস্তু – তা পুঁথির পাতায় বিদ্যাধ্যয়নে হয় না। হয় গুরুর কৃপায়—তপস্যার দ্বারা—সাধনার পথে। নইলে ব্যাস মহাভারত লিখেও রইলেন আবদ্ধ—পুত্র শুক হ'য়ে গেলেন জীবন্মুক্ত।

সে প্রশ্ন, সে ইতিকথা বা মহাতত্ত্বের ব্যাখা রইল যোগ্য জিজ্ঞাসুর জন্য তোলা, আমরা বলে যাব আমাদের পুরাণ আর বর্তমান নজিরে পাওয়া ইতিহাসের পরিচয়।—

তবে কখনও যেন তাকে নিঃসন্দেহ সত্য না বলি।

গৃহস্থের হেঁসেলের বাইরে কলার খোসা—ঘরের ভিতরে দুধের বাটীর মধ্যে তার শাঁস., ঐ কলা ,—বাইরে কমলার খোসা—ভিতরে পাত্রে তার কোয়া, কিন্তু বলা যায় পূর্ণ কলা বা কমলা কি ? ঐ বাটীর কলা না বাইরের খোসা অথবা খোসা শাঁস মেলানো ফলটা।

উপরের খোসা ঐ পুরাণ-ইতিহাস, ভিতরের শাঁস ঐ উপনিষদ ও দর্শন। দুই মিলে কিন্তু এক। পৃথক করলে একটা সার অন্যটা অসার। একটা অবিদ্যা, অপরটি বিদ্যা—তবু পরিচয় নেবার সময় দুটো এক হ'য়ে সামনে দাঁড়াবে। মহামায়া সত্য কিন্তু মিথ্যা পোষাক পরা যে সত্য—তাই হ'ল মায়া।

বিদ্যা ও অবিদ্যার মিলনেই মৃত্যু অতিক্রম করে জীব অমৃতের সন্ধান পান।

বিদ্যা অবিদ্যা, সত্য মিথ্যা মিলিয়ে এক করে বিশ্বাসের রসে রসিয়ে নিতে হবে।

অতএব—বিচারের যে তিনটি ভঙ্গীর কথা বলেছি এর আগে, তার মধ্যে পরমার্থিক বিচার বড় কঠিন. ও নিয়ে আমরা আর এগোব না—ও থাক আরও বড় যাঁরা তাঁদের জন্যে।

পুরাণ থেকে আমরা বলবো নানা প্রাচীন কাহিনী। হয়তো তাতে সত্য মিথ্যায় ভরা বর্ণনায় রূপক থাকবে— তাই আমাদের প্রচলিত পূণ্যকথা—ধর্ম্মক্ষেত্রে তার সুরু হয়েছে। তার সব কিছু লীলা—তার প্রেরণা—সব পেয়েছি ধর্ম্ম বিশ্বাসেরই মাধ্যমে—সেই আমাদের ধর্ম্মবাণী। এই বিশ্বভুবন যখন হয়নি তখনকার ইতিকথারও যেমন প্রমাণ নেই—তেমনই প্রাচীন যুগে যখন আদিম সৃষ্টি দেখা দিল—অথবা যখন মানুষই ছিল বন্য, পশু সমান—তখনকার সব কথা বা ইতিহাস কেই বা বলে গেছে আর লিখেই বা কে রেখে দিয়েছে সে সব কাহিনী। অথচ পুরাণের পাতায় কত গল্প, কত ব্রহ্মাণ্ড, কত সৃষ্টি, কত প্রলয়ের কথাই তো দেখি। এর তথ্যটুকু না বুঝলে সে সবই ধোঁয়াটে হয়ে যাবে। আবার বুঝতে পারলেও, প্রজ্ঞা বা বিশ্বাস না থাকলে 'গাঁজা'ও মনে হতে পারে।

এখানে আবার সেই 'বুদ্ধি' আর "বোধের" প্রশ্ন। মানুষের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ, সে শুধু বিচার করে মাথা দিয়ে, সাধকরা প্রজ্ঞা-বলে ধ্যানের ধারণায়—বোধে—পরম তত্ত্বের ইঙ্গিত পান—হৃদয় দিয়ে। তাই যে কথা পরম ঋষিরা বলে গেছেন—যুগ যুগ ধ'রে, যে কথাটিকে আছে মহাকালের নিকষ পাথরে যাচাই হ'য়ে—তাকে ভুয়োই বা বলবো কি করে? সত্যদ্রষ্টার দেখান পথেই এগিয়ে যাব আমরা।

তবে আমাদের বুদ্ধির অতীত যে কথা, আধ্যাত্মিকতার আদর্শে যা মহান, শুধু সেটাকে সম্বল করে থাকলেই কি চলবে?—আধুনিক জগৎ তাতে তৃপ্ত হতে চায় না।

আমরা তাই উপনিষদের পর যে পথ পুরাণের পাতা কটা উল্টে এগিয়ে এসেছে অন্যমতে, সেই অতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ব'লবো।

সে বিচারের দাপট কম নয়। তাঁরা পুরাণ বা বেদের সব কথা মানতে চান না—যুক্তি বিশ্বাস ও নস্যাৎ করে দিতে চান।

তাঁরা বলেন, ঐ বেদ উপনিষদ—আমাদের সমাজ জীবনের বাস্তব ডায়েরী। কবিত্ব ছেড়ে সত্যে দাঁড়ালে সেটাই হবে যথার্থ ইতিহাস।

অবশ্য তাঁরা একথা বলেন যে, ভারতের বেদ, উপনিষদ, স্মৃতিই একমাত্র প্রাচীনতম গ্রন্থ—যাতে পাওয়া যায় সে যুগের মানব-সমাজের বিশ্ব-পরিক্রমার আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত। তাঁরা বলেন, হোম, যজ্ঞ, সূত্র, কর্ম্মকাণ্ড এ সব ঐ সামাজিক গঠনের একধারা,—আদিম যুগের এক শক্তিশালী জাতি বা গোষ্ঠী দিয়ে তার সুরু। তার ফলে রাজা ও রাজ্য সমাজ শাসন সব। বনে বনে সেদিন জেগেছিল যে গণতন্ত্র, তাঁদের মতে, তা সমাজ বিধিরই বিভিন্ন গতি। তাঁরা এও বলেন যে, ঐ যে দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী—এ মাতৃসত্তার পরিচয়, আবার পরবর্ত্তী যুগে পুরুষের বহুবিবাহে পিতৃসত্তার উদ্ভব। তাঁরা বলেন, বেদ পুরাণের কাহিনীতে পাই গণতন্ত্রের উন্মেষ, স্থিতি ও উচ্ছেদ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পঞ্চ গ্রাম যাচ্ঞার মধ্যে তাঁরা "পঞ্চ" বা পাঁচজনার গণতন্ত্র কল্পনা করেন, আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যদুবংশ ধ্বংসের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দেখান।

প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের বোধ বৈদিক সাহিত্যে বহু পাওয়া যায়—
"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ"—প্রভৃতি মন্ত্র তার প্রমাণ।
: প্রাচীন ইতিবৃত্তের মাধ্যমে সে বিচারও এক বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত; আর সেই যে বিচারভঙ্গী এইটাই আমাদের নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গী—অতি আধুনিক বিচার-ধারা বা কর্ম্মবাণী।

সে বিচারে—আদি সৃষ্টির সময় ৩০০০ খৃঃ পূঃ থেকে সুরু করে ৫ লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত চলে গেছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এরও ঠিক নেই—তবে অধুনা-প্রাপ্ত কঙ্কালও এমনি প্রমাণই দেয়। তাঁরা বলেন, জীব-সৃষ্টির পর চতুঃস্পদ পশুর মধ্য থেকে সেই জীব হ'ল যে দুই পায়ে ভর করে দুই পা'কে হাতের কাজে লাগিয়ে নর-পশুরূপে মানুষের আদি রূপ টেনে আনলো। সেটাই যথার্থ বন্য অবস্থা। এর পরের অবস্থায় আদিম মানুষের দল বন-পর্ব্বত ভেঙ্গে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। ক্রমে সভ্য হ'য়ে ভারতে মানব-ইতিহাসের পত্তন করলো। আর্য্য-প্রবেশের আগে ভারতে যে সংস্থা গড়ে উঠেছে—বর্ত্তমান মহেঞ্জদাড়ো ও হরপ্পা নাকি তারই নিদর্শন।

আমাদের বেদ পুরাণের নানা কাহিনী ও ইতিহাস বলে যে, এই আর্য্যের দলই—ভারতের পূর্ব্বনিবাসী দ্রাবিড়দের পরাজিত ক'রে নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত করে। এ কিন্তু সেই রাজতন্ত্রের শক্তি-গর্ব্বেরই আভাস দেয়।

কিন্তু আধুনিক মতবাদ ব'লে যে, প্রাচীন আর্য্যসন্ততি প্রায় দু'হাজার বৎসর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সাম্যতন্ত্রে সমাজ গঠনে অগ্রসর হয়েছেন। দীর্ঘদিনের গড়া সে সমাজ—ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সাধনায় এই গোষ্ঠীকেই বড় ক'রে গেছেন। তারপর সে গোষ্ঠী বদলে গেছে তো ঠিকই কিন্তু তার স্মৃতি রেখে গেছে স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণে আর বেদে। সে মতবাদ বলে—বেদের এক অংশ সে কারণে গোষ্ঠী-সমাজের জীবন যাত্রার বিধি কথা, যজ্ঞ, আহুতি, হব্যদান, চরু, ভোজ্য ও ভোজন, বাস ও ব্যসন, শাসন ও কর্ম্মকাণ্ডে পূর্ণ—বাস্তব জগতের জড় সামগ্রীয় বন-সম্পদের কামনায় ভরা—আর অন্য অংশ নিষ্কাম পরমতত্ত্বের দর্শনে ব্যস্ত।

বিচারে তাঁরা জেনেছেন বন্য অবস্থাতেও তখনকার সমাজ চলেছে তিনটি যুগ পরিক্রম ক'রে। প্রথম নিম্নযুগ, দ্বিতীয় মধ্যযুগ ও তৃতীয় উন্নতযুগ। নিম্নযুগে মানুষ থাকতো মাটির বুকে, গাছের মাথায়, কন্দ, মূল ছিল ভোজ্য। পশু থেকে সবে মানুষ হ'ল বটে, কিন্তু জড় হয়ে রইলো একই জায়গায় মাটির বুকে।

তারপর মধ্যযুগে যখন তারা পূর্ণ মানুষ, আগুনকেও তারা ধরতে পেরেছে—পাথরের অস্ত্র গড়েছে। ধীরে ধীরে ধন-কামনার স্তুতি জানিয়েছে অজানার কাছে। আর এগিয়ে চলেছে সামনের পথে—এদিকে, ওদিকে। এই সময় মাংস পুড়িয়ে খায় তারা—জীবনযাত্রার কোন নিয়ম মানে না।

তারপর হ'ল তাদের উন্নতি উন্নতযুগে—ধনুক এলো হাতে, মাটির বাসন হ'ল, ধাতুকে কাজে লাগাবারও বুঝি হদিস্ পেল।

বন্য অবস্থার পর অর্দ্ধ-বন্য অবস্থা। তাতেও ক্রমোন্নতি—নিম্নযুগ, মধ্যযুগ, উন্নতযুগ পার হয়ে এসে একেবারে যজ্ঞ সুরু হ'ল, উপনিবেশ বসলো, কৃষি আরম্ভ করল এই মাটির বুকে। তার পরই হলেন প্রাচীন আর্য্যরা সভ্য, হ'ল বংশ বিস্তার দিকে দিকে—যুগে, যুগে। তাঁরা বল্লেন, আর্য্যরা দুনিয়ার এক একদিকে নিজেদের শাখা নিয়ে এগিয়ে গেলেন—আর সমাজ বাঁধলেন। এক গোষ্ঠীভুক্ত তখন তাঁরা সব—আর তারই প্রমাণ ঐ যজ্ঞ। সবাই মিলে আগুনকে ঘিরে সকলের জন্য চরু তৈরী করলেন—করলেন হবিদান, যজ্ঞভাগ গ্রহণ। সব যেন সমবায় গোষ্ঠীর কার্য্য—সমাজকে বাঁচাবার আর বাড়াবার প্রচেষ্টা।

সবাই মিলে সেই অজ্ঞাতের উদ্দেশে প্রার্থনা জানায়—অন্ন ও ধনপ্রাপ্তির কামনা। সারা যজ্ঞ আর বেদ গাঁথা এইতেই পূর্ণ। "মঙ্গল কর—সমাজের মঙ্গল কর, ধরিত্রীকে পূর্ণ কর,—অন্নপূর্ণা কর বসুন্ধরা—নিরাময় কর—শক্তি দাও।" সকলেরই এই কামনা—'তবে একের জন্য নয়, বহুর জন্য—সমাজের জন্য।

তাঁরা স্বয়ম্ভুর স্বয়ং জন্মান মানলেন না, সৃষ্টি থেকে দেবতার ছেলে সভ্য ছিল ও কথা শুনলেন না—অগ্নিদেবের তেজের কথা—অগ্নির সঙ্গে স্বাহার পরিণয় এ সব বুঝলেন না। বল্‌লেন সেই যুগেই অঙ্গিরস

প্রথমে আগুনের খোঁজ আনলেন—দুনিয়াকে আগুনের খবর দিলেন। আর আগুন হ'ল বলেই মস্ত মাংস পুড়িয়ে খেতে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে পশু পালনে ও কৃষি কর্ম্মে তাঁরা পাকা হয়ে পড়লেন; কিন্তু সবই তখন গোষ্ঠীবদ্ধ—গণতন্ত্রের সে এক অপূর্ব্ব রূপ !

আজও যজ্ঞকুণ্ডর পাশে "ব্রাহ্মণ" পাত্র স্থাপনের রীতি আছে। যজ্ঞ ও যজ্ঞস্থ সাম্য সঙ্ঘের এক নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম তাঁদের কাছে—বহুর এক রূপ। তাঁরা যজ্ঞ শব্দটির ধাতু প্রত্যয়ান্ত ক'রে য অর্থে ই ধাতুগত গমন, জ অর্থে উৎপাদন এবং ন অর্থে অন্ত অর্থে একত্র অভিযান ও উৎপাদনই যজ্ঞের মূলতত্ত্ব বলে জেনেছেন আর মেনেছেন। সে মতবাদ বলে, যে আর্য্যদল ভারতে বা নানাদিকে নূতন নূতন উপনিবেশ বসাতে সুরু করলেন, তাঁরা কেউ রাজা সাজেন নি। সবাই মিলে মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে ধন ও শস্যের জন্য শক্তি ও বৈভবের জন্যই পরম এক শক্তির কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, সবাইয়ের জন্য শান্তিবারি ছড়িয়েছেন।

তারপর ধীরে ধীরে এসেছে ভারতবর্ষে ও সাম্য সঙ্ঘের ভাঙ্গন। ব্যক্তিত্ব নিয়ে একজন হয়েছেন রাজা। তবু পুরাণের পাতায় রাজা যুধিষ্ঠিরও গণতন্ত্রের এই ভাঙ্গনের জন্য ভীষ্মের নিকট দুঃখ করেন—"সব মানুষ এক রকম আকৃতি—প্রকৃতি—বীর ও যোদ্ধা হয়েও একজন রাজা হয় কেন?" এ প্রশ্ন তখনও আসে—তবে আবার চাকা ঘোরে, প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র আবার শেষ হয় যদু-বংশ ধ্বংসে।

সে যুগের শ্রীকৃষ্ণই নিজে রাজা হয়ে রাজতন্ত্র চালান নি।

অতি আধুনিক মতবাদ সমাজ প্রথা দিয়েও প্রথমে যুগ্ম বিবাহ, গণ-বিবাহের প্রতিষ্ঠা দেখান। স্ত্রী মাত্রই ছিল বহুভোগ্যা। তবে ধীরে ধীরে সে বহু, এক নির্দ্দিষ্ট সীমায় এসেছে, কিন্তু সেও মাতৃ-সত্তার প্রাধান্যে। তাঁরা প্রথমে মাতৃসত্তার আবির্ভাবই প্রমাণ করেছেন। তখন নারী—সমাজের মূল বা শক্তি। নারীর নামেই ছিল সেদিন বংশ-প্রতিষ্ঠা—মাতৃসত্তা থেকে গণের উৎপত্তি। অদিতি থেকে আদিত্যগণ, দিতি থেকে দৈত্যগণ, দনু থেকে দানবগণ, বিনতা থেকে বৈনতেয়গণ, কৃত্তিকা থেকে কার্ত্তিকেয়গণ—এই কথারই

সাক্ষ্য দেয়। নারী থেকে নাম—তাও আবার সমগ্র দলের নাম—একের নাম নয়। তা ছাড়া দিতি, অদিতিই শুধু নয়, চণ্ডী, কালী, দুর্গায়—নারীর দেবীরূপ কল্পনা নারীসত্তারই প্রমাণ।

সামাজিক কোন বিবাহ বা বন্ধন প্রথাই ছিল না সেদিন। তারপর ধীরে ধীরে যৌথ বিবাহ, গন্ধর্ব্ব বিবাহ প্রভৃতি বহুবিধ বিবাহের প্রচলন হলেও দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী সেদিনও যেমন পত্নীসত্তার সাক্ষ্য দেয়—তেমনই হিড়িম্বা-ভীম মিলনে যে সন্তান, চিত্রাঙ্গদা ও অর্জ্জুনের বিবাহে যে সন্তান, সবই হয় মায়ের সম্পত্তি। এই সব প্রমাণ সামাজিক ও জাতির জীবনে নারীর আধিপত্যই প্রতিষ্ঠা করে।

এই সময় অতি আধুনিকের দল নর-নারীর সম্বন্ধের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের এক বিচিত্র উদাহরণ উপস্থিত করেন। পুরাতন কাহিনীর মধ্যে সুদর্শন-ওঘবতী. গৌতম-গৌতমী ও জমদগ্নী-রেণুকা, এই তিন বিভিন্ন ঘটনা বা সংস্কার উপস্থিত ক'রে নারীসত্তার আধিপত্য এবং মূলোচ্ছেদে যূথ ও যুগ্ম বিবাহের ইতিবৃত্ত স্পষ্টতর ক'রে দেন।

ঋষি সুদর্শন তখন আশ্রমের বাইরে। এলেন এক ব্রাহ্মণ,—অতিথি সেবা করলেন এবং সুদর্শন-পত্নী ওঘবতী অতিথির তৃপ্তির জন্য তাঁর শয্যাসঙ্গিনীও হলেন। গণ-গোত্রের দিনে এ আচরণ পাপ নয়—স্ত্রী মনে করেন, আতিথ্য-ধর্ম্মে তাঁরও কর্ত্তব্য আছে। ঋষি সুদর্শন এসে শুনলেন স্ত্রীর দেহদানের কথা, তৃপ্ত হলেন—আতিথ্য-ধর্ম্মে কোন ত্রুটী হয়নি, তাতেই তিনি প্রসন্ন। যূথ বিবাহ তখন তেমন প্রচলিত নেই—তবু ওঘবতী সেই আচরণই রক্ষা করেছিলেন অতিথির জন্য।

তারপরই গৌতম ও গৌতমী। গৌতম আশ্রমের বাইরে—এলেন ইন্দ্র—অতিথি হ'য়ে। তিনি কামনা করলেন গৌতমী বা অহল্যাকে। অহল্যা অতিথির ভোগে দিলেন দেহ—গৌতম শুনে কুপিত। সমাজে তখন যূথ বিবাহ উঠে গেছে। যুগ্ম বিবাহ প্রচলিত, তাই গৌতম এই অপরাধে পুত্র চীরকরীকে বল্লেন, মাতৃহত্যা করতে। কিন্তু তখনও বুঝি মাতৃসত্তার ছোঁয়াচ যায়নি! পুত্র পারলেন না মাতৃহত্যা করতে! মাতৃসত্তা তখনও জাগ্রত।

তারপর ধীরে ধীরে পিতৃসত্তার আধিপত্য সুরু হয়। নারী তখন সহধর্ম্মিণী, সঙ্গিনী—শেষ পর্য্যন্ত দাসী—মূল্য বিনিময়ে একটি মাত্র গরুই তাঁর সমমূল্য।

এই সময়েই দেখা যায় জমদগ্নি ও রেণুকাকে। কামনার বশে একদিন রেণুকা দূর থেকে দেখছিলেন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথকে—হয় তো মনও একটু চঞ্চল হয়েছিল। জমদগ্নি তা টের পেলেন—অসংযতা পত্নীর এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে পুত্রকে বললেন মাতৃহত্যা করতে—পুত্র অনায়াসে মাতাকে হত্যা করলেন। এখানে পিতৃসত্তা পূর্ণ আধিপত্যে সমাজকে ঢেকে ফেলেছে ; মাতৃসত্তা একেবারে লুপ্ত।

বর্ণ বিভাগের ব্যবস্থাও অতি আধুনিক বিচারে ধর্ম্মের দিক দিয়ে আসেনি। তাঁরা বর্ণকে, ধন উপার্জ্জন ও কৃষি উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন পথের ব'লে মনে করেন। এমন কি তাঁদের কৃত্য যে সব আচরণ—অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, প্রভৃতির মধ্যে ঐ সামাজিক জীবনের আধিপত্য বিস্তারেরই ছবি উঁকি দেয়।

তাঁরা বলেন সমাজে এ ভাবে তখন শুধু মাতৃসত্তাই বিদায় নেয়নি, বিদায় নিল সাম্য সঙ্ঘের আধিপত্য। এক হ'ল প্রধান, হ'ল রাজা। যে সাম্যবাদের যুগে প্রধান হ'ত গণ-নির্ব্বাচনে স্থির, সেইখানে শক্তি দিল একের ললাটে রাজতিলক। গণতন্ত্র রাজতন্ত্ররূপে দেখা দিল! শূদ্রের পিঠে চ'ড়ে বসলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য। দাস-প্রথার এক ভিন্ন রূপ দেখা দিল দেশে।

প্রমাণ দেখান—এই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ক'রে সাম্যতন্ত্রের পুনঃ প্রচারও করতে চেয়েছেন অনেকে—বেণ-পুত্র পৃথু তাঁদের মধ্যে একজন।

মহাভারতের যুদ্ধকেও তাঁরা গণসঙ্ঘ ও রাজতন্ত্রের সংঘর্ষ বলেন—বলেন রাজতন্ত্রের উচ্ছেদে পঞ্চের জন্য পাঞ্চালের এ যুদ্ধ।—

মহাভারতের যুদ্ধের পরও বেশ কিছুদিন হয় তো রাজতন্ত্র কায়েম ছিল। কিন্তু আবার দেখা যায় নৈমিষারণ্যে সঙ্ঘ ও গোষ্ঠী। দেখা যায় বৈশালী রাজ্যে, লিচ্ছবিদের গণতন্ত্রে, গোপালের প্রজাতন্ত্রে এই সাম্যবাদেরই আবির্ভাব।

প্রাচীন বেদ উপনিষদ যখন ভারতের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের মধ্যে

ভারতের আত্মিক উন্নতির প্রতিষ্ঠা করেছে, পরমানন্দের প্রাপ্তির সাধনা করেছে—অতি আধুনিক ধারণা তখন আণবিক প্রতিক্রিয়ায় গীতা, চণ্ডীকে উপড়ে ফেলে বেদের মন্ত্রে সাম্যবাদ খুঁজেছে, উপনিষদের পাতায় মাতৃসত্তার বা পিতৃসত্তার আবির্ভাব দেখিয়েছে,—ন্যায়, দর্শন, স্মৃতিতে প্রাচীন সামাজিক বিধানের বিচার-অবিচারের চুলচেরা বিচার করেছে।

কিন্তু এই দুটি বিচারই আমাদের পরিপ্রেক্ষিতে আসে না। আমরা তত্ত্বজ্ঞানের কথা সকলে তো বুঝি না। আবার অতি আধুনিক বিচারের রূঢ়ত্ব যেন আমাদের সয় না। এদেশের রক্তে যেন খাপ খায় না।

বাস্তবধর্ম্মী মন নিয়ে তাঁরা যখন বলবেন ঐ ধর্ম্ম, প্রতিমা, মন্দির, সব বাজে অর্থব্যয়, ঐ হস্তিনাপুর, নালন্দা, অজন্তা, বিলাসী রাজতন্ত্রের অহমিকার চিহ্ন—তখন মনে হয় যারা "অন্নগত" প্রাণ, তারা শুধু খাওয়ার কথাই ভাবে। শুধু আধ্যাত্মিক পথ ও মতই নয়, শিল্প-সৌন্দর্য্যকেও তারা ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়—উপেক্ষার আবর্জ্জনায়।

তারা কি বোঝে ঐ মন্দিরে, ঐ প্রতিমায়—শিল্পকলার সেতু দিয়ে যে 'আনন্দের' সঙ্গে আমাদের মিলন হ'ল, তা পরমানন্দ প্রাপ্তিরই একটা সিঁড়ি। তাকে উপেক্ষা করতে আমরা পারি না, আর পারি না বলেই বেদ উপনিষদকেও যেমন শ্রদ্ধা করি—পুরাণ, গীতা, চণ্ডীকেও তেমনি ভালবাসি।

তাই দেব-দেবীর কাহিনী, আমাদের কাছে ভারতের ইতিবৃত্ত বলে যায়, মন্দিরের মূর্ত্তি আমাদের প্রাচীন কৃষ্টিকে স্মরণ করায়, তীর্থ ও ব্রত আমাদের সেই ঐতিহ্যকে বহন করে। আমরা আত্মিক সাধনার জটিলতায় সে ভক্তিরস-ধারা হারাতে চাই না, আবার অতি আধুনিক বিচারে তাকে ধোঁয়াটে করতেও পারি না।

এখানে আমরা আঁকড়ে ধরেছি মাঝের ইতিহাস—মর্ম্ম নয়, কর্ম্ম নয়—ভারতের ধর্ম্মকে—সে ধর্ম্মের কাহিনী থাকে পুরাণে, ইতিহাসে, উপনিষদে—সে ধর্ম্মের আচরণ থাকে যজ্ঞে, ব্রতে ও অর্চ্চনায়। আজও তা নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে—ভারত-সন্ততির স্বাতন্ত্র্যে, চিন্তায় ও কর্ম্মে।

হয় তো অনেকে বলবেন, দুটো তিনটে মত বা পথ বলাই বা কেন? যেটা সত্য তাই বলাই ত ভাল। ভাল তো ঠিকই কিন্তু সত্যেরও তো আবার বিভিন্ন রূপ আছে। একই দেহী বিভিন্ন পোষাকে দেহ সাজিয়ে হ'ন বিভিন্ন-রূপী।

একই রাজকর্ম্মচারী তাঁর কর্ম্মজীবনে পোষাক-পরিচ্ছদে সাজেন বিচারক, মন্ত্রী। কিন্তু সংসারে সামান্য ধুতী-গেঞ্জী পরিহিত সে—আবার শয্যাকক্ষে বা স্নানাগারে, নগ্ন গাত্রেও সেই একই ব্যক্তি। একই দেহ, একই দেহী, বিভিন্ন পোষাকে বিভিন্ন পরিচয় মাত্র।

সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকাশও যে সেইভাবে। তিনি প্রথমে চিৎশক্তি, তারপর মহামায়া, দেবতা বা দৈবীশক্তি—তা থেকে হ'ল মায়া বা মানব।

এবার মানুষকে যদি উল্টো উজানে গিয়ে পরব্রহ্মের কাছে পৌঁছতে হয়, তবে প্রথম সাধনা তাকে করতে হবে মহামায়ার—বা দেবত্বের। কিন্তু দেবত্ব তো তার কাম্য নয়। তার কাম্য চিৎ, অতএব মহামায়া থেকে তাকে পৌঁছতে হবে চিৎ-ব্রহ্মে। সুখ দুঃখের খেলা খেলতে হবে তাকে। পরম-স্রষ্টাও দেখলেন—তাঁর সৃষ্টির অভিনয় বা পুতুল খেলা পূর্ণাঙ্গ নয়, তা হয়েছে পূর্ণ—দুঃখে সুখে, পাপে, পুণ্যে, ভোগে ও ত্যাগে—এখানে এই নরলোকে। স্রষ্টায় সৃষ্টির পূর্ণায়িত রূপ এই মানুষ। স্রষ্টার পূর্ণাবতার হ'ল আমাদের ভারতে।

দেবত্ব—নিতান্ত ভোগবিলাসী পদ, দেবতা ভোগের মোহে—মহামায়ায় থাকেন সব ভুলে—ভুলে যান তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তাকে—কিন্তু মানুষকে লড়তে হয় দুঃখের সঙ্গে, দুর্ভাগ্যের সাথে, ত্যাগে তাকে হতে হয় বড়, সুখ ও শান্তির আশায় সে নিত্য স্মরণ করে তদ্গত-চিত্তে সেই চিদানন্দকে। মানুষ তাই দেবতার চেয়ে বড়, পূর্ণতর।

"সবার উপরে মানুষ সত্য—তাহার উপরে নাই।"

তাই মহাসাধক ও সিদ্ধরা—ইন্দ্র চন্দ্রের রূপে আসেন না, আসেন

ব্যাস, বশিষ্ঠ, কপিলের বেশে, ঠাকুর আসেন রাম, কৃষ্ণ বা বুদ্ধের অবতারে। দেবতা—পরমাত্মার রূপ, মানুষ—পরমাত্মার অবতার!

শাশ্বত শক্তি চিৎ, কখনও অচিৎ মহামায়া, কখনও আবার অচিৎ মায়া। এই অচিৎ মহামায়া আর অচিৎ মায়ায় প্রভেদ কি?

বাস্তব উদাহরণে জিনিষটা পরিষ্কার হয়। এক সের দুধ, যেন আদি সত্য—তার সঙ্গে একপো জল। দুধ আছে ঠিকই কিন্তু খাঁটি নয়। খাঁটি দুধ ভেজাল হ'ল—যেন অচিৎ মহামায়া। এবার তাতে দিলাম দশ সের জল। দুধের রং বুঝি ধরা যায় না, কিন্তু দুধ এক সেরই আছে, অথচ বাইরের রূপে ও গুণে ওটা শুধু ভেজালই নয়—একেবারে মিথ্যা বা বাজে হয়ে দাঁড়িয়েছে—নিছক মায়া এবার।

তাই ইতিহাস সত্য—তবে তার সঙ্গে দেশ, কাল আর বাজার দর হিসেবে জল মিশেছে বৈকি! তবু ভারতের 'সত্য' আছে ভারতের মাথার মণি হ'য়ে—আমরা 'অসার' নিয়ে মেতে আছি। তাইতো শ্রীরামকৃষ্ণ বল্লেন—"মাথায় মাণিক রয়েছে, তবু সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে।"

ল্যাবরেটারীতে জিনিষ তৈরী হয় নানা উপাদানে। সব শিল্পীরই কারখানা থাকে। স্রষ্টা দুনিয়া গড়লেন তবে নানা কারখানায়, জীব আর দেবতার মাধ্যমে আদি সৃষ্টি তিনি যেখানেই গড়ে থাকুন—পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, ভাল আর মন্দে ভরা মানুষ তিনি গড়লেন এই ভারতের বুকে—দেবতার জন্ম যেখানেই হোক, ব্রহ্ম আর মনু যেখানেই আগে জাগুন, তাঁদের সন্তানরা মানব হ'ল প্রথম এই ভারতের বুকে পা রেখে। বিধাতা ভারতের মাটিতে সৎ ও অসৎ, সাদা কালো মিশিয়ে পুতুল গড়লেন—এই মানুষ।

তাই ভারতের মাটি তাঁর এত প্রিয়। তাই ভারতেই তাঁর অবতার।

ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে—"ভারতভূমি ভাগে"—দেবতার সন্তান প্রথম চরণ দিল। সেই প্রথম চরণ-পাত থেকেই মানুষের ইতিহাস সুরু। তার আগে স্বর্গে আছেন শিব, আছেন জীব, আছেন দেবতা আর দৈত্য।

সেই থেকেই ভারতে ভারত-সন্ততিগণের বসবাস, সুরু তাঁদের শাসন, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। তাই নিয়েই মহান ভারতের ইতিহাস।

সংস্কৃত শাস্ত্রের গহনে প্রবেশ করে যা উদ্ধার করতে কষ্ট হয়, স্বল্প কথায়, গল্প-গাথায় তাই আমরা বলে যাব। এটা নিছক সংক্ষিপ্ত, একটা সূচী মাত্র। ছায়া-ছবির মূলে যে কায়ার অস্তিত্ব এ তো অস্বীকার করার উপায় নাই। আমাদের এই প্রয়াস সেই আয়না, বিরাটের এক ক্ষুদ্র ছায়া দেখা যাবে তাতে। সংক্ষিপ্ত এই সূচী হয়তো সূচনা করবে সে আগ্রহের—যে আগ্রহে আমরা ফিরে তাকাবো সত্যের দিকে। ছায়ার যে মিথ্যে মায়া—সেই মায়াই আবার সত্যান্বেষী ক'রে তুলবে আমাদের।

হয়তো কোন কোন জায়গায় ভুল থাকবে, হয়তো অমিল থাকবে অন্যের সঙ্গে—হয়তো সাধক যাঁরা তাঁরা পাবেন ব্যথা—বেদোপনিষদের অক্ষম ব্যাখায় বা বিকৃত কল্পনায়, আবার হয়তো অতি আধুনিকের দল হাসবেন, কিন্তু বড় বড় গ্রন্থে জটিল শব্দে, কুটীল ব্যাখ্যায়, ধোঁয়াটে টিকা-টিপ্পনীতে যা হয়ে আছে ঝাপসা, তা খানিকটা আলোর মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা তো হবেই—তারপর শক্তিমান যাঁরা, তাঁরা আপন সিদ্ধিতে বা ভক্তিমান যাঁরা, তাঁরা আপন ভক্তিতে, কর্ম্মী যাঁরা তাঁরা আপন কর্ম্ম-প্রচেষ্টায়—অনুসন্ধানে, আসল জিনিষ না হয় আবার খুঁজে বার করবেন।

প্রাচ্য যখন মর্ম্ম ও ধর্ম্ম দিয়ে জেনেছেন ভারতের রূপ, প্রতীচ্য তখন কর্ম্মপথে বুঝতে পেরেছেন কত মহান এই ভারত।

তাই যতটা পেরেছি সকল রকম মতবাদকে মেনে নিয়ে সার একটা ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে 'মহান ভারত' এমন ক'রে সাজিয়েছি, যাতে সংসার-পথে নূতন যাত্রীর দল আমাদের ভারতের মহান একটা রূপ ধারণা করতে পারেন। অনুভব করতে পারেন—

"মোদের ভারত মোদের জননী স্বর্গ থেকেও বড়।"

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

তাঁরা যেন সর্ব্বদাই মনে রাখেন, একদিন ভারতের প্রাচীন আর্য্যের দল দেবতাদের ডেকে বলেছিলেন—"ওগো তোমাদের ঐ স্বর্গের চেয়েও আমাদের ভারতবর্ষ পবিত্র—মহৎ—আনন্দময়।"

পুরাণের পাতায় আজও দেবতার সেই গান গাঁথা হয়ে আছে—

"গায়ন্তি দেবা কিল গীতকানি,
ধন্যাস্ত্ত যে ভারতভূমিভাগে,
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে,
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ।
কর্ম্মন্যসঙ্কল্পিততৎফলানি,
সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মরূপে,
অবাপ্যতাং কর্ম্ম মহীমনন্তে,
তস্মিন্ লয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি।
জানীম এতত্ন্ বয়ং বিলীনে,
স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহ বন্দ্যম্,
প্রাপ্স্যামো ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যাঃ
যে ভারতে সেন্দ্রিয় বিপ্র হীনাঃ।"

ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের এমন সুর সেই প্রাচীন ভারতকে সেদিন বুঝি পাগল করেছিল—

"দেবতা গাহিল গান সে নূতন ধন্য ভারতবর্ষ,
শ্রেষ্ঠ ভারতনিবাসী মানব মহান সে সুখহর্ষ,
স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের আধার মহান ধর্ম্মে,
নিষ্কাম হ'য়ে হেথায় মানুষ ব্রতী হয় নিজ কর্ম্মে,
তাই তো আপন কর্ম্মের ফল পরম সে পদে সঁপিয়া,
মোক্ষের পদে লীন হয় নর বিষ্ণুকরুণা লভিয়া,
কবে সেই ভাবে লীন হ'য়ে যাবে মোদের স্বর্গ-পুণ্য,
কবে সে ভারতে লভিয়া জনম দেবতা হইবে ধন্য,
সব ইন্দ্রিয়, সকল কামনা লইয়া বিপুল হর্ষ,
মানুষের রূপে পাইবে দেবতা সাধের ভারতবর্ষ।

অপূর্ব্ব এ কামনা! কত সুখ ও শান্তিপূর্ণ দেশ হ'লে, তবে দেবতাও ছুটে আসতে চায় সেই দেশে, এই ভারতবর্ষে। দেবতারও কামনার ধন ভারতবর্ষ—এ কি আমাদের কম গৌরব!

"হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।
ধ্যান গম্ভীর এই যে ভূধর, নদী—জপ-মালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে॥
হেথা একদিন বিরাম বিহীন মহা-ওঙ্কার ধ্বনি
হৃদয় তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠে ছিল রণরণি।
তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আছে দ্বার—
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

—রবীন্দ্রনাথ

"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথ কালের দুঃস্বপ্ন-কাহিনী মাত্র……"

"যে সকল দেশ ভাগ্যবান, তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়—আমাদের ঠিক তাহার উল্‌টা। দেশের ইতিহাস আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।……"

—রবীন্দ্রনাথ

"কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।"
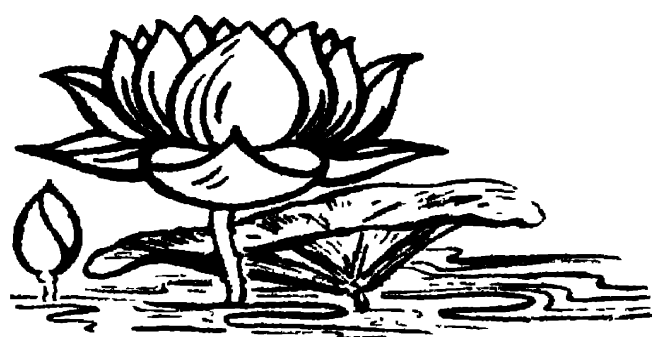
প্রথম-চরণ
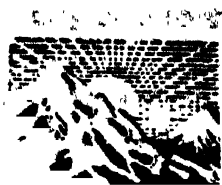
মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ মধু নক্তম্ উতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা
মধুমান্ নো বনস্পতিঃ মধু মান্ অস্তু সূর্য্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ—

শাশ্বত এই মন্ত্রবাণী কণ্ঠে নিয়ে—অমৃতের সন্তান পিতা ও পুত্র দাঁড়ালেন—শতদ্রুতীরে। শুধু কি তাঁরাই—শত শত জনক-জননী, কন্যা-পুত্র এলেন ঐ নতুন মাটির বুকে। এক দুরন্ত মহা প্লাবনের বন্যা তাঁদের ভিটে ভাসিয়ে নিয়ে গেল—এক দুর্দ্দান্ত অসুরের দল তাঁদের দেশছাড়া করলো। তাইতো তাঁরা দলে দলে পালিয়ে এলেন এই মাটির বুকে।

দুরন্ত সে পীড়ন আর অশান্ত সে প্লাবন এড়িয়ে তাঁরা যখন এক গিরি-চূড়ার পাশে পেলেন ঠাঁই, তখনই তাঁদের কণ্ঠে সেই গান উদ্গীত হ'ল—

'বায়ু মধু হয়ে ব'য়ে যাক্, নদী ঢেলে দিক মধুধারা
শ্যামল ওষধি হোক মধুময়—না হই সে মধুহারা
রাত্রি ও উষা মধু হোক,—হোক পৃথিবীর ধূলি মধুময়
ছেড়ে আসা ঐ দ্যুলোক, পিতৃবংশেরা যেন মধু হয়
মধুময় হোক বনস্পতিরা, মধুর দীপ্ত সূর্য্য—
দিশি দিশি হোক সব মধুময়—মধুর শৌর্য্য বীর্য্য।

আকাশের গায় তখনও অন্ধকার মিলিয়ে যায়নি, অরুণ আলোর লাল আভা বুঝিবা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, পিতাপুত্র এসে দাঁড়ালেন নদীতীরে—সিন্ধুর তীরে—ভারতের বুকে। তাকিয়ে রইলেন তাঁরা উদীয়মান সূর্য্যের দিকে।

নবারুণ তখনও "সবিতা"-রূপে আকাশে জেগে ওঠেনি। পালিয়ে

আলা পিতাপুত্র, মুনি-ঋষি, সকলেরই মনে হ'ল তখন—
"ঐ সবিতা, ঐ তপন ওঁরই তো সন্তান আমরা।"

সকলে নতশিরে তাঁকে নমস্কার জানালেন।

শং নঃ সূর্য্য উরুচক্ষ উদেতু।
শং নশ্চতস্রঃ প্রদিশো ভবন্তু।
শং নঃ পর্ব্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু
শং নঃ সিন্ধবঃ শমু সন্ত্বাপঃ

"ভুবনের ঐ বিশাল নয়ন তপন উঠুক জাগিয়া
শুভ কল্যাণ লাগিয়া
পথে পথে যত পর্ব্বতরাজি
নদ-নদী সব শুভ হোক আজি
চারিদিক হ'তে পড়ুক শীর্ষে শুভ কল্যাণ ঝরিয়া
তপন উঠুক জাগিয়া"

গুরু ও শিষ্য—এসে দাঁড়ালেন পঞ্চনদীর তীরে। উদীয়মান সূর্য্যকে নমস্কার করলেন তাঁরা—প্রথম প্রভাতে—দিবসের প্রারম্ভে। তাঁরা মুক্ত মনে, যুক্ত করে সবিতা দেবতাকে প্রথম প্রার্থনা জানালেন—

সহ নৌ যশঃ, সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্—
"গুরু ও শিষ্য—মোরা দু'জনেই তুল্য যশের ভাগী
দু'জনেই যেন সম-সাধনায় ব্রহ্ম-স্বরূপে জাগি।"

গুরু ও শিষ্যের দল—আগ্রহে উদাত্ত কণ্ঠে স্তুতি পাঠ করলেন—

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ—
ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ॥ ওঁ শান্তিঃ॥

গাইলেন—"হে ব্রহ্মন্ করহ পালন,
গুরু শিষ্য দুইজনে কর তুমি জ্ঞান বিতরণ
বীর্য্য দাও দুইজনে
শৌর্য্য দাও দুই মনে
দুইজনে অধ্যয়নে রাখ ভগবান
পরস্পর বিরোধের কর অবসান॥"

এ্কি গুরু শিষ্যেরই বিরোধ অবসান প্রার্থনা—বিদ্বেষ-মুক্তির ভিক্ষা? এ প্রার্থনা সেদিনকার অভিযাত্রী আর্য্যের প্রাণের স্বতঃ উৎসারিত শান্তির কামনা। বেদমন্ত্রের মধু-সমাপ্তি করে দিলেন তাঁরা সঙ্ঘ-কল্যাণী এই গানে—

,.সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহ চিত্তম্ এষাম্

সাম্যের সে গান গাইলেও, হিংসার সে রক্তাক্ত রূপ—এই মাটির কোলে এসে তাঁরা আজও ভুলতে পারেননি, ভুলতে পারেন না। একই কশ্যপ প্রজাপতির সন্তান তাঁরা, একই সুরলোকের অধিবাসী—কি করে, হিংসার জ্বালায় হ'ল সুর আর অসুর—দেব ও দানব! অর্থের কামনায়, শক্তির মত্ততায়, ভোগের লালসায় তারা এমনই নৃশংস অত্যাচারে মেতে উঠলো যে কশ্যপের সন্তান নিজের দেবলোক, সুমেরু সব ছেড়ে পালাল এদিকে, ওদিকে আর সেদিকে।

প্লাবিত ভূভাগের উপর দেবতার ছেলে নৌকায় করে চল্লো মাটির আশায়—প্রচণ্ড তরঙ্গের আবর্ত্তে তরণী তাদের দোলে—বুঝিবা সাগর-গর্ভে ডুবে যায়! আর অভিযাত্রীর দল—কাতর কণ্ঠে জলের দেবতা বরুণকে জানান—

"হে মরুদ্‌দেবগণ—
দিবস রাত্রি রক্ষা করিও মোদের তরণীখানি
তব করুণায় এ মহাসাগর পার হয়ে যাবো জানি।"

তরঙ্গ-ভঙ্গে তরণী এসে দাঁড়ায় এক পাহাড়ের কোলে। নৌ-বন্ধন করেন তাঁরা সেই গিরি-চূড়ায়, নামেন তারপর—এই ভারতে। সেইদিন দেবলোকের সন্তান প্রথম চরণ রাখলেন ভূ-লোকের মাটিতে—ধূলার ধরণীতে।

দূরে ঐ সুউচ্চ হিমালয়! সারা পাহাড়টা তাঁরা ডিঙ্গিয়ে এসেছেন, অতিক্রম করে এসেছেন সেই গভীর জঙ্গল, সেই উত্তাল পাহাড়-নদী, কোথাও বা শঙ্কু পথে বাঁশের সাহায্যে, কোথাও বা বাঁশের সিঁড়িতে—এসেছেন কত মুনি, কত ঋষি, কত সাধক আর কত ভাবুক; এসেছেন হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে তাঁরা সেই দূর সুমেরুর ধার

ধ'রে। সে অভিযানের কথা—ব্যথা, দুঃখ, তাঁরা ভুলতে পারেন না, ভুলতে পারেন না পথে পথে অসুরের অত্যাচার, আরণ্যক অন্ধ সব অসভ্যদের বীভৎস অনাচার। না আছে তাদের জ্ঞান, না বুদ্ধি, না শৃঙ্খলা, না সমাজ। অনাচার আর অত্যাচার নিয়েই যেন তাদের জীবন। বাসনা আর কামনা নিয়েই যেন তৃপ্তি ; আহার, নিদ্রা আর মৈথুন—এই যেন তাদের সব। কত বাধা এসেছে পথে, এসেছে কত লাঞ্ছনা, সব স'য়ে, মুখ বুজে সহ্য ক'রে শুধু সেই পরম ব্রহ্মের নাম নিয়ে তাঁরা এসে দাঁড়ালেন শতদ্রুতীরে।

স্মৃতির ব্যথা ভরা দেহ—ক্লান্ত শরীরকে শান্ত করতে তাঁরা নদীজলে করলেন স্নান। অবগাহনের পরে শান্তি এল মনে, নদীতীরে দাঁড়িয়ে তাঁরা করলেন উপাসনা—

"ভূ র্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ"

স্মরণ করলেন—"ভূঃ, ভুবঃ. স্বঃ এই ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হয়ে যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করেন—সেই জ্যোতির্ম্ময় সবিতৃ-দেবকে আমরা স্মরণ করি।"

উপাসনার পর মনে পড়লো সেই সৃষ্টিকর্ত্তার কথা। প্রাণ ভ'রে উঠলো সেই অতীতের দেব-মহিমায়। তাঁরা গাইলেন—

'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"

তাঁরা কল্পনা করলেন অরূপের এক অপরূপ রূপ—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং'

সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ সে পুরুষ—সর্ব্ব পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করে আছেন। আর দশটী আঙ্গুল অতিরিক্ত।

দেশ হারিয়ে ভাবলেন তাঁরা—তিনি তো সর্ব্বত্রই আছেন—সেই স্বর্গে, এই পৃথিবীতে—সব জায়গায় হাজার হাজার লোকের নয়ন-মন হয়ে আছেন তিনি। আর তাইতো তাঁর সহস্র নয়ন। আরও আছেন দশ আঙ্গুল বেশী। কী অপূর্ব্ব স্তুতি!

যত রূপ হোক তাঁর, যত রকমের অবতারে হোক তাঁর কল্পনা কিন্তু আমার তোমার হৃদয়টুকুতে থাকবার জন্য—নাভি-কমলের সৃষ্টি-কেন্দ্র থেকে হৃদয় পর্য্যন্ত হোক তাঁর ব্যাপ্তি। একেবারে আমার নিজস্ব হয়ে থাকবার জন্য থাকুন দশটি আঙ্গুল মাত্র বেশী।

মন ভরে গেল স্তবে,—পরম নির্ভরতায় প্রাণ হ'ল আবার দৃঢ়—আবার এগুতে হবে তাদের সামনের দিকে—কশ্যপের বংশ, সেকি কম? এগিয়ে যেতে হবে তাদের চিরদিন—সম্মুখে, পার্শ্বে, এগিয়ে যেতে হবে নূতন সমাজ গড়তে।

সে এগিয়ে যাবার কথা একদিনে তো শেষ হয়নি—ইন্দ্র মানুষের বেশে এই মানুষকেই এগিয়ে চলার মন্ত্র নিজ মুখে দিয়ে গেছেন—

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ৎ স্বাদুমুদুম্বরং
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্—চরৈবেতি"
'চলে মহাকাল মধুবর্ষী,—চলে নদী বহি ছল ছল,
দেখ, চোখে নাহি ঘুম তপনের, সেও চলে ঐ অবিরল
ওরে চল আগু পথে চল্ চল্।"

একটি জায়গায় থাকলে চলবে না। আজ এসেছেন তাঁরা, কাল আসবেন আরও, তারপর আরও—আরও, সেই অদিতির সন্তানের দল। দিতির সন্তান দৈত্য—তাঁদের কাউকে থাকতে দেবেন না সেখানে।

কিন্তু এখানে? পথেও তো তাঁরা কম অত্যাচার দেখলেন না। জঙ্গলে জঙ্গলে দেখলেন তাঁরা— কেউ খাচ্ছে কাঁচা মাংস, কেউ আছে গাছে, কেউ চট্ ক'রে একটা লোকের উপর ছুঁড়ে মারলো প্রকাণ্ড পাষাণের চাপ, কেউ বা কারও মেয়েকে নিয়ে কাঁধে ফেলে ছুটলো। তাদের অঙ্গে নেই বসন, পাশে নেই ভোজন—যে যখন যে ভাবে যা পাচ্ছে লুটে পুটে খাচ্ছে। রক্তে মাখা সে সব ছবি—ওঃ!

মনে মনে তাই তাঁরা ডাকলেন—তাঁদের উদ্ধারকর্ত্তা বিষ্ণুকে, ইন্দ্রকে, সূর্য্যকে বরুণকে আর অর্য্যমাকে, যাঁরা রক্ষক হয়ে তাঁদের বাঁচিয়েছেন ঐ অসুরের হাত থেকে। তাঁরা গাইলেন—

"ওঁ শং নো মিত্রঃ, শং বরুণঃ, শং নো ভবতু অর্য্যমা
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ, শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।"

রক্ষা করলেন অন্তরস্থ দেবতা—ভুবনস্থ করলেন দেবতার সন্তানদের—অমৃতের সন্তানকে—মানবকে এই ভারতেরই বুকে।

প্রথম চরণ পাতের দিনটি থেকে আজ পর্য্যন্ত এগিয়ে চলেছে কশ্যপের সন্তানগণ—অমৃতের পুত্রগণ ভারতের বুকে—জগতের বুকে।

সে অভিযানের সুরু এই ভারতের গিরিশৃঙ্গে, সে উপনিবেশের অভিযান এই ভারতের ব্রহ্মর্ষিদের আর্য্যাবর্ত্তে—আর তাঁরই ইতিহাস অক্ষয় হ'য়ে আছে বেদে। নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়, যুদ্ধ বিদ্রোহ, প্রাকৃতিক বিপ্লব কাটিয়ে বলতে পেরেছিলেন তাঁরা আনন্দের গান—শান্তির মন্ত্র—শুধু ভারতের শান্তি নয়—শুধু নিজেদের শান্তি নয়—পৃথিবীর শান্তি—সকলের শান্তির সে বাণী। ক্রমে এগিয়ে চল্লেন তাঁরা ভারতের বুকে, দেশে-বিদেশে সাগরপারে—কণ্ঠে সেই শান্তিমন্ত্র—

"ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ
পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তিঃ
ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্ব্বং শান্তিঃ
শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি।"

দ্যুলোকেতে শান্তি হোক্, ভূলোকের শান্তি হোক্
অন্তরীক্ষ হোক্ শান্তি ভরা
ওষধি ও বনস্পতি শান্তিময় হ'য়ে থাক
সলিলে বহুক শান্তি ধারা
দেববৃন্দে শান্তি হোক্ ব্রহ্মে শান্তি হোক্ স্থির
নিখিল হউক শান্তিময়,
শান্তি হোক, শান্তি হোক, শান্ত হোক সর্ব্বদিক
আমাদের শান্তি যেন হয়।

সত্যই সেদিন প্রার্থনায় শান্তি এল ভুবনে, এল শান্তি ভারতে।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড

আর্য্যদের প্রথম চরণ-পাত হ'ল এই ভারতের বুকে। তাঁদের চলার পথে যেমন বাধা, চলার মতেও তেমনই বাধা অনেক।

মন্ত্রের একটু হের ফের ক'রে কেউ বলছেন আর্য্যরা জলপ্লাবনের পর মহাহিমবন্ত ডিঙ্গিয়ে এলেন ভারতে—কেউ বলছেন ভারতেও এক জলপ্লাবন হয়, আর তাতেই দাক্ষিণাত্য এবং এদিক ওদিক থেকে আর্য্যরা এসে উঠলেন—হিমালয়ের চূড়ায়। নজির দেখান—মহেঞ্জদড়ো, হারপ্পা সব তাঁদেরই কীর্ত্তি। [১]

একদল বলেন ব্রহ্মালোক থেকে ব্রহ্মার সন্তান এলেন নেমে দেবলোকে, দেবলোক থেকে ব্রহ্মাণ্ডে—ব্রহ্মাবর্ত্তে বা ভারতে।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা

এখন প্রশ্ন কে ব্রহ্ম, কেই বা ঐ ব্রহ্মা ? কার গড়া এই ব্রহ্মাণ্ড।

এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন প্রতিদিন আর্য্য-ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যায়—

ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

বল্লেন, ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্লোকে যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করেন, সেই দ্যোতমান সর্ব্বান্তর্যামী জগৎ-প্রসবিতার বরণীয় (ব্রহ্মাত্মক) জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি—ওঁ।

প্রথমেই মন্ত্রটীর আরম্ভে দেখি প্রণব মন্ত্র "ওঁ"। এর তিনটি মাত্রা অ, উ, ম। প্রথম মাত্রা "অ" কার জাগরিতস্থান, বৈশ্বানররূপী সে ; তারপর "উ" কার স্বপ্নস্থান ; আর "ম" কার সুষুপ্তিস্থান। "অ, উ, ম" অর্থাৎ জগৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তিকে অতিক্রম করে মাত্রাহীন "ওঁ" কারে প্রবেশ করা মানেই ব্রহ্মে লীন হওয়া। কিন্তু যে ব্রহ্মে লীন হব সে ব্রহ্মটি কি ? এ প্রশ্ন শুধু কি আমার তোমার !

কোন সে পুরাকালে, বরুণ-পুত্র ভৃগু তাঁর পিতাকে এই প্রশ্নই করেছিলেন "হে ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিন।"

উত্তরে ঋষি বল্‌লেন, "যাঁহা হইতে এই ভূত সকল জন্ম গ্রহণ করে, যাঁহার দ্বারা জাত জীব সকল বাঁচিয়া থাকে, বিনাশ-কালে যাহাতে গমন করে ও বিলীন হয় তাহাকেই জানিতে চাও— তিনিই ব্রহ্ম। শরীর, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্ ইহারাই ব্রহ্মোপ-লব্ধির দ্বার।" তখন সুরু হ'ল ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য ভৃগুর তপস্যা।

তপস্যা মানে কি? বহির্মুখ যে ইন্দ্রিয় বা অনুভব—শরীর, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্ সব বাইরে থেকে টেনে অন্তরে প্রবেশ করিয়ে অন্তরস্থ জ্যোতিকে উপলব্ধি করাই তপস্যা।

সেই তপস্যা করে ভৃগু অনুভব করলেন ব্রহ্ম এই "অন্ন"; কারণ সর্ব্বজীবের উদ্ভব, স্থিতি আবার লয় সবই তো "অন্ন" নিয়ে। কিন্তু পিতা বল্‌লেন—"না আরও সাধনা কর." আবার তপস্যা— এবার ভৃগু অনুভব করলেন "প্রাণ"ই—ব্রহ্ম। কিন্তু পিতা আবার তপস্যা করতে বল্লেন—এবার ভৃগুর মনে হল "মন"—ব্রহ্ম। তাতেও পিতা তুষ্ট নন—বল্লেন আরও গভীরতর জ্ঞানে যাও। তখন চল্লো আবার তপস্যা—এবার ভৃগুর অনুভূতিতে এল প্রকৃত ব্রহ্ম— "বিজ্ঞান।" কিন্তু যখন দেখলেন এতেও ঋষির মন তৃপ্তি পায় না তখন আরও গভীরতর তপস্যার দ্বারা বিজ্ঞান-ব্রহ্ম থেকে উর্দ্ধে চলে গিয়ে তিনি পৌঁছলেন "আনন্দ" ব্রহ্মে। জানলেন—

"রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধাহনন্দীভবতি"
"—রসের স্বরূপ তিনি।
জীব শিব হয়— আনন্দময় সে রস স্বরূপে চিনি।"

প্রজ্ঞাবলে অনুভব করলেন ভৃগু—"আনন্দই ব্রহ্ম—আনন্দ হইতেই এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হইয়া আনন্দেই জীবন ধারণ করে আবার আনন্দেই প্রস্থান করে—আনন্দেই প্রবেশ করে।"

তাই চরমভাবে পরম সত্যকে তিনি স্বীকার করে নিলেন।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।"

"অন্ধকারের অতীত আদিত্য বর্ণ এই মহান পুরুষকে আমি জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিয়াই লোকে মৃত্যু অতিক্রম করে। সেই মহান মানুষকে লাভের আর কোন পথ নাই।"

সত্যই কোন পথ আর নেই। ঐ যে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান এই কোষগুলি এক একটি আবরণ, যেন পদ্মপত্র—ভিতরের রেণু-কেন্দ্র তারা ঢেকে রেখেছে। চিত্ত-কমলের মাঝে ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ—চিত্ত-কমলের পাপড়ি আছে তাকে ঢেকে—তপস্যা দ্বারা—অন্তর্মুখ সাধনার দ্বারা সে পত্রদলকে উন্মোচিত করতে পারলেই—অন্তরের পূর্ণানন্দ উদ্ঘাটিত হবে।

আবার প্রশ্ন আসে আত্মা কি? উত্তরে কঠোপনিষদ্ বলেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"

"এই আত্মাকে বেদ পাঠ দ্বারা লাভ করা যায় না। মেধা দ্বারা বা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা লাভ করা যায় না। যাহাকে ইনি অনুগ্রহ করেন তিনিই তাঁকে লাভ করেন।"

তাইতো কঠোপনিষদ্ মানুষকে জাগায়—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"

"ওঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞান লাভ কর। সেই সাধনার পথকে ক্ষুরের নিশিত ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া কবিগণ অর্থাৎ বিবেকীগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন।"

সাধনার যে বস্তু সে ব্রহ্মের স্বরূপ কি? মুণ্ডকোপনিষদ বলেন—

"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ
সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো
হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।"

সেই পুরুষ (ব্রহ্ম) দিব্য জ্যোতির্ম্ময়—ইহা নিশ্চয়। তিনি মূর্ত্তিহীন। অন্তর ও বাহিরে বর্ত্তমান। তিনি জন্মরহিত। তাঁহার প্রাণ নাই, মন নাই, শুভ্র তিনি। যে অক্ষয় বা অব্যক্ত তাহা হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ।

কি বিরাট কল্পনা! নিরাকার সে রূপ-চিন্তায় তো বিশ্ব সৃষ্টির কল্পনা আসে না—তাই বল্লেন—

> "অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
> দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
> বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বম্ অস্য
> পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥"

"যাঁহার মস্তক দ্যুলোক, দুই চক্ষু চন্দ্র ও সূর্য্য, কর্ণযুগল দিক বাক্য প্রকাশিত বেদসমূহ, প্রাণই বায়ু, হৃদয় নিখিল বিশ্ব এবং যাঁহার পদদ্বয় হইতে পৃথিবী জাত—তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।"

তবু পেলাম এক বিরাট রূপের কল্পনা, নিরাকার থেকে যেন পেলাম এক সাকারের আভাস—অক্ষয়, অনাদি, অব্যক্ত, অব্যয় ও অনন্ত কোন এক বিরাট জ্যোতি বা শক্তি থেকেই এই চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, বায়ু সঞ্জাত। পরম স্রষ্টার পরম সৃষ্টি সব!

ব্রহ্মাণ্ডের রূপ

ব্রহ্মাণ্ডের খবর দিতে গিয়ে যখন পাশ্চাত্য জগৎ ও আধুনিক বিজ্ঞান পরমাণু তত্ত্ব ও শক্তির কথা বললেন, দেখা গেল এ যুগের বিজ্ঞানের সে পাতা, সে যুগে—হাজার হাজার বছর আগে বেদের পাতায় দেখা দিয়েছে। প্রায় একই কথা বলে গেছেন বৃহস্পতি, অত্রি ও অথর্ব্ব প্রভৃতি সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা।

মহর্ষি কপিল তাঁর সাংখ্যে সৃষ্টিতত্ত্বকে ঠাকুর-দেবতার লীলা-খেলা স্বীকার না ক'রে তো প্রায় "নাস্তিক" আখ্যাই পেয়ে গিয়েছিলেন আর কি? অথচ সাংখ্যই প্রথম ভারতীয় দর্শন। যা বাস্তব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কথা ব'লে গেছেন।[২]

পুরাণ কিন্তু সেই ব্রহ্মকে ব্রহ্মা ক'রে সৃষ্টিকে ব্রহ্মাণ্ড ক'রে—সহজ সরল কাহিনীর মধ্যে তারই বিরাটত্বের বর্ণনা করেছেন।

সেখানে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা। কিন্তু সে কি ঐ একজন ব্রহ্মা—নাভিকমলে যাঁর জন্ম—যাঁর ছেলের বংশে ঐ কশ্যপ।

তা' তো নয়। পুরাণকার বলেছেন মহাকালের কোলে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড একটি নয়—অনন্ত। সময় বা কালও—মহান, তাই বলি মহাকাল। সে মহাকালের কোলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মিলে এক বিরাট ব্রহ্মাণ্ড। ভারত সেই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের একটি বুদ্বুদ।

চতুর্দ্দশ ভুবন ও মহাকাল

পুরাণের সেই ব্রহ্মাণ্ডে আছে মর্ত্তলোক থেকে সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্তলোকের সংবাদ, সপ্ত পাতালের কাহিনী, বিভিন্ন নরকের ঘটনা। সপ্তলোক আর সপ্ত পাতাল—এই ১৪টি ভুবন নিয়েই ব্রহ্মাণ্ড। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের দেহ বলে অভিমান করেন—তিনিই সেই হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম থেকেই ব্রহ্মা, সুরু সৃষ্টি। সৃষ্টির কাজ প্রজনন—ব্রহ্মা তাই "প্রজাপতি"। ব্রহ্ম-বর্ষে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল একশ বছর, তার পর হয় তাঁর লয়। এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের তখন ধ্বংস হয়—হয় মহাপ্রলয়।

সে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় মহাকালের মহালীলা। মহাকালের কথায় কালের একটু হিসাব নেওয়া দরকার। নইলে আধুনিক ইতিহাসেও যে লেখা হ'ল—তরল জ্বলন্ত গ্রহরূপে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রায় ২০০০,০০০,০০০ বছর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ ক'রে বর্ত্তমান রূপ পরিগ্রহ করতে সুরু করল [৩]—তার হদিস্ পাব কি করে? পুরাণের মতে বয়সটা কত জানতে গেলে আগে কালের হিসাবটা ধরা যাক্।

কী সূক্ষ্ম সে হিসাব! শাস্ত্র বলেন একটি পদ্মের পাতাকে সূঁচ দিয়ে বিঁধতে যেটুকু সময় লাগে তার নাম "লব"। কি সুন্দর কাব্যিক ভাবে জটিল হিসাবের প্রারম্ভ।

সূঁচ দিয়ে পদ্মপাতা বিঁধতে—লাগলো ১ লব সময়। তেমনই ৩০ লবে এক ত্রুটি, ৩০ ত্রুটিতে এক কলা। ৩০ কলায় এক কাষ্ঠা। চণ্ডীতে ঐ কলা-কাষ্ঠা থেকেই কালের সুরু। ৩০ কাষ্ঠায় এক নিমেষ, ৮ নিমেষে ১ মাত্রা বা শ্বাস—একবার শ্বাস নিতে চক্ষুর নিমেষ, মানে চোখের পাতা পড়ে আটবার। ৩৬০ শ্বাসে এক নাড়িকা।

দুই নাড়িকায় এক মুহূর্ত। ৩০ মুহূর্তে ১ দিন। ৭ দিন বা অহতে এক সপ্তাহ। ৩০ দিনে ১ মাস। ১২ মাসে ১ বৎসর।

এইখানেই যত গোল যোগ; এই যে বছর এটি মানুষের হিসাব। পুরাণ বল্লেন মানুষের একটি বছর দেবতাদের একটি অহোরাত্র। ৩৬০টি অহোরাত্রে ১ দৈব বৎসর। ১২০০০ দৈব বৎসরে ১ যুগ। ১০০০০ যুগে এক ব্রহ্ম দিন বা রাত্র। ৩০ ব্রহ্ম দিনে ও ৩০ ব্রহ্ম রাত্রে এক ব্রহ্ম মাস। ১২ ব্রহ্ম মাসে ১ ব্রহ্ম বৎসর। ১০০ ব্রহ্ম বৎসরই ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল।[৪] ব্রহ্ম, দৈব ও মনুষ্য তিনটি কাল পৃথক। এক ব্রহ্মদিন × ১০০০ দৈব যুগ × ১২০০০ দৈব বৎসর × ৩৬০ দৈব অহোরাত্র = মানুষের ৪৩২০০০০০০০ বৎসর। ব্রহ্মার যেদিন উদয়—সৃষ্টির সুরু যেদিন—সেদিনটিতে মানুষের ৪৩২০০০০০০০ বৎসর কাটলো। ওয়েলস্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের মতও অনেকটা তাই—সৃষ্টির প্রথম যেদিন থেকে তুষারপ্রবাহ, সরীসৃপ, মৎস্য প্রভৃতি নানাবিধ যুগে প্রায় ৪০২০০০০০০০ বৎসরের পর হ'ল প্রথম মানবাকারের জীব। আর তারই কিছুদিন পরে পূর্ণ মানব। পুরাণ তাকেই বল্লেন মানব বংশের প্রথম পুরুষ—মনুর স্রষ্টা ব্রহ্মা।

ব্রহ্মার শতবর্ষের প্রথম ৫০ বৎসর পদ্মকল্প পরের ৫০ বছর বরাহ কল্প। পরার্দ্ধের প্রথম দিনটি চলছে এখন—শ্বেত বরাহ কল্প।

যেদিন ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যায় সেদিন স্রষ্টা হন লুপ্ত—হয় মহাপ্রলয়। তখন আবার চলে নূতন সৃষ্টি। গ্রহদের আবর্ত্তনের মত এমনই করেই আবর্ত্তিত হ'য়ে চলেছে মহাকালের রথচক্র। সে আবর্ত্তন-চক্রে ঘুরছে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড।

মহাপ্রলয়ের মধ্যে ঘটে যায় এক এক খণ্ডপ্রলয়, মন্বন্তর বা কল্প।

কল্প ও খণ্ডপ্রলয়

এই মহাপ্রলয় ছাড়াও ব্রহ্মার নিজের গড়া প্রতিদিন অন্তে এক এক প্রলয় ঘটছে। প্রতিদিনটি কল্প, আর প্রতি রাতটি প্রলয়। একটি কল্প আর একটি প্রলয় মিলে, ব্রহ্মার হচ্ছে একদিন। সেই একদিনে ১৪টি মনুর আবির্ভাব, আবার তিরোভাব।

শাস্ত্রকার বলেছেন, খণ্ডপ্রলয়ে জম্বুদ্বীপ ডুবে যায়—ভেসে যায় সব ভুবন; শুধু জেগে থাকে জম্বুদ্বীপের বুকে হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, নীল, শ্বেত, শৃঙ্গবান, মেরু, মাল্যবান, গন্ধমাদন, মহেন্দ্র, মলয়, সনৎ, শক্তিমাদন ঋক্ষবান, বিন্ধ্য ও পারিজাত—এই ১৬টি পর্ব্বতচূড়া। এখন জম্বুদ্বীপ এই ভারত কি নিখিল ভুবন, কে জানে?

তবে মহাপ্রলয় হয়—সব ডুবে যায়, আবার সৃষ্টি হয়—এর স্বীকৃতি আছে সব দেশে—নানা পৌরাণিক ভঙ্গীতে।

এমনি করে ১৪ জন মনু শেষ হলে ব্রহ্মার একদিন কাটে।

এই চতুর্দ্দশ মনুর নামও আছে শাস্ত্রে—(১) স্বায়ম্ভুব (২) স্বারোচিষ (৩) ঔত্তমি (৪) তামস (৫) রৈবত (৬) চাক্ষুষ (৭) বৈবস্বত (৮) সাবর্ণি (৯) দক্ষ সাবর্ণি (১০) ব্রহ্ম সাবর্ণি (১১) ধর্ম্ম সাবর্ণি (১২) রুদ্র সাবর্ণি (১৩) দেব সাবর্ণি (১৪) ইন্দ্র সাবর্ণি।

স্তম্ভিত হ'তে হয় এই বিরাট সৃষ্টি ও ধ্বংসের কথা ভাবলে। আবার এক একটি মনুর শাসনকালে ৭১টি মহাযুগের হিসেবও আছে ঐ পুরাণের পাতায়। এক একটি মহাযুগ মানে সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি।

চতুর্দ্দশমনু ও মন্বান্তর

২ মাসে ১ ঋতু, ৩ ঋতুতে ১ অয়ন, ২ অয়নে ১ অব্দ। ৪,৩২০০০ অব্দ কলিমান। এর দ্বিগুণ দ্বাপরমানে ৮,৬৪০০০ অব্দ। তার ত্রিগুণ ১২৯৬০০০ অব্দ ত্রেতামানে। তার চতুর্গুণ কৃতমানে বা সত্য যুগে ১৭২৮০০০ অব্দ। চারিযুগের একত্রিত মান ৪৩২০০০০ অব্দ। ৭১টি চতুর্যুগে এক মন্বন্তর (মন্বন্তরমান ৩০৬৭২০০০০ অব্দ)।

তবেই দেখা যাচ্ছে এক এক মনুর সময় ৭১টি সত্য, ৭১টি ত্রেতা, ৭১টি দ্বাপর ও ৭১টি কলির আবর্ত্তন ঘটে যায়। হিসাবের মহাকাল নয় কি? তবে এর সঙ্গে বর্ত্তমান হিসেবের মিল হবে কি করে? তা ছাড়া বিভিন্ন পুরাণেও এর হিসেব বিভিন্ন।

যদি এই হিসেবই ধরে নেওয়া যায়, তবে পুরাণের পাতায় পাতায় লেখা বিভিন্ন আর বিচিত্র কাহিনী—কোন্ যুগে কোন্ মন্বন্তরে, মানে কোন্ মনুর পর, আর কোন্ মনুর আগে এ বোঝা

বড় কঠিন হ'য়ে পড়ে না কি? সত্য, ত্রেতায় প্রতিটি যুগই তো আসছে ৭১ বার, এক মনুর সময়ে—তেমনই ১৪ মনু উদয় হচ্ছেন ব্রহ্মার একদিনে। ব্রহ্মা থাকছেন শতবর্ষ। এখন এই যে মন্বন্তর এ কোন্ মনুর সময় যদি বা ঠিক্ হয়, কোন্ কল্পের সে মনু তাও তো ঠিক করা প্রয়োজন? সুতরাং শুধু মন্বন্তর বা মনুর নাম বল্লেই পুরাণের কাহিনীর সময় ঠিক করা যায় না। ধরা যাক্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা। তিনি দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে আবির্ভূত হ'ন। কিন্তু সে দ্বাপর কোন্ মহাযুগের? ৭১টি মহাযুগই চলে একটি মন্বন্তরে। এমনতো চতুর্দ্দশ মনু। অতএব শুধু দ্বাপর বা কলি বল্লেই বা বৈবস্বত মন্বন্তর বল্লেই কাল নির্ণয় সঠিক হবে না।

প্রশ্ন হবে ঘটনাটি শ্বেত-বরাহ কল্পে না পদ্ম-কল্পে। শাস্ত্র বলে—কল্প নির্দ্দেশ না থাকলে বর্ত্তমান শ্বেত-বরাহ কল্পই বুঝবে। সে মতে বৈবস্বত মনুই যখন বর্ত্তমান কল্পের মনু, তখন অনেক ঘটনা বৈবস্বত মনুর সময়েই ১১২ দৈব যুগের মধ্যে ঘটেছে তারপর চলছে কলি।

তবে অনেক ক্ষেত্রে যুগ, কল্প, মন্বন্তর, পৃথক পৃথক ভাবে বলা আছে বৈ কি? কিন্তু তাতেও প্রশ্ন উঠবে, কোন্ যুগে, আর কোন্ কল্পে, এই বা কে দেখে বা লিখে রেখেছে। এখানেই এল পরম প্রজ্ঞার কথা—অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা।

পরম পুরুষের সঙ্গে যোগ যাঁদের সিদ্ধ হয়েছে, সেই সব সিদ্ধ যোগীরা আপন বোধ বা জ্ঞানের আলোয় যতটা অতীত অন্ধকার আলোকিত করতে পেরেছিলেন, ততটা স্মরণ করে বলে যেতে পেরেছেন। তবে তার মধ্যে কেহ কেহ আবার নিজ সাধনা, ব্রহ্মচর্য্য, ও অপূর্ব্ব স্মৃতিশক্তির সাহায্যে অন্য যুগের কথাও স্মরণ করতে পারতেন। কেউ আবার পারতেন বিভিন্ন মহাযুগের কথা। কোন কোন মহর্ষি সেই ঊর্দ্ধ সাধনারই প্রভাবে সংবাদ রাখতেন বিভিন্ন মনুর—কারও বা বিভিন্ন মনুর সঙ্গে পরিচয়ই ছিল। সে যুগের মানুষটি হয়তো সাধনার শক্তিতে, ব্রহ্মচর্য্যের গুণে আত্মিক জগতে সেদিন পর্য্যন্ত অমর হয়েছিলেন—তাঁদেরই আমরা জানি সিদ্ধ যোগীরূপে। আবার পরম সিদ্ধ ছিলেন যাঁরা তাঁরা শুধু কল্পান্তর বা

মন্বন্তরের খবরই রাখতেন না মহাকল্পের কথাও তাঁদের দৃষ্টি পথে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো। ব্রহ্মা ছিলেন তাঁদের পরিচিত। শুধু কি ব্রহ্মাই—ব্রহ্মজ্ঞান-লব্ধ সেই মহাসিদ্ধ—বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মার খবরও দিতে পারতেন। তাঁদের সামনেই যে ঘটে গেল সেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বা ব্রহ্ম-শক্তিময় সৃষ্টি ও তিরোভাব!

সেই সব সিদ্ধ, মহাসিদ্ধ. পরম সিদ্ধদের বর্ণিত—ব্যাস, বাল্মীকি, জৈমিনী, হারীত কর্ত্তৃক লিখিত পুরাণই তো ভারতের ইতিহাস। তবে সেই ইতিহাসের পুরাতন কথা যে পুরাণ, তা'তে ধীরে ধীরে কালধর্ম্মে কত না কথা নূতন আরোপিত হয়েছে, আবার কত কথা মুছে গেছে তার পাতা থেকে। মনের কথা পাথরে আর তাল-পাতায়, তামার পাতে আর কাগজে উঠতে গিয়ে কতই না পরিবর্ত্তন হয়েছে। তবে এ কথাটুকু এখানে আমাদের মনে রাখতেই হবে এ সত্য—চির সত্য। মহাজনের মহাবাণী—ধ্রুব ও শাশ্বত।

ব্যাস. বাল্মীকি দেখিনি, কপিল. কণাদ, যাজ্ঞবল্ক্যকে হয়তো আজও চিনতে পারিনি—কিন্তু মহাবাণী স্মরণ করতে ভারত আজও তো উন্মুখ! তাই আজও বুদ্ধ জয়ন্তী, চৈতন্যের প্রেম-প্রবাহ, আজও দক্ষিণেশ্বর ও অন্যান্য 'পীঠস্থানে' মানুষ শান্তির জন্য পাগল হয়ে ছোটে—অরবিন্দের বাণীতে প্রতি জনচিত্তে ফোটে সেই পরম সত্যের তত্ত্বকথা। স্বামী ত্রৈলঙ্গ, ভাস্করানন্দ, রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, বিজয়কৃষ্ণ—এঁরা কি ছিলেন অজ্ঞানী, মিথ্যানুসারী?

তা' নয়! আর তা' নয় বলেই চিরদিন ভারত বিজ্ঞানের চেয়েও এঁদের জ্ঞানকে প্রজ্ঞাকে সম্মান করেছে এবং আজও করে। বিশ্বের নিখিল বিজ্ঞান যখন মনে শান্তি দেয় না তখন হিমালয়ের গিরি-কন্দরে কন্দরে, অরণ্য-আশ্রমে ওঠে শান্তির বাণী।

ভারতের ইতিহাস মহান,—ভারতের ইতিবৃত্ত, রক্ত মাংসের পরিচয়, কথা ও কাহিনীর উপকরণ—মাস তারিখের আড়ম্বরে আঁকা হয়নি। বংশতালিকার খিলান তুলে যুগের সঙ্গে যুগের বা অব্দের একযোগে সূত্র টেনে ভারতের ইতিহাসের ইমারত গড়েনি। ভারত তার ইতিহাস গড়তে ব্যাস, বশিষ্ঠের খুলি মাপার দরকার

মনে করেনি; বানর আর শিম্পাঞ্জির অস্থি-পঞ্জরের তুলনার কথা ওঠেনি। ব্যাবিলন, ইজিপ্ট, গ্রীস যখন কবর ক'রে অতীতকে টেঁকাতে চেয়েছে, মিশর যখন প্রাচীনকে 'মমি' করে পুঁতে রেখেছে—ভারত তখন অন্তরের অন্তস্থলে, মহাকালের ত্রিশূল সং-চিং-আনন্দের খননে—সত্ত্ব, রজ, তমর প্রভাবে সে পথ রচনা করে নিয়েছে। ভারতের ইতিহাস রচিত হয়ে আছে তার জ্ঞানের মধ্যে—আর তা' অক্ষয় বটবৃক্ষ হ'য়ে পিতৃ-পিতামহকে জিয়িয়ে রেখেছে—গোত্রের স্মরণে, শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে, বর্ণাশ্রমের স্তর-বিন্যাসে।

সমস্ত প্রাচীন ও অতীতকে তার বাঁচিয়ে রেখেছে—তার ভূমা ও অমৃতত্বের সাধনার মধ্যে।

তাই উপনিষদের ঋষিরা উদাত্ত কণ্ঠে বারম্বার বলেছেন—

"হে পূষন্, তুমি সত্যের অবগুণ্ঠন কর উন্মোচন।
এ জীব-জীবনে সত্য ধর্ম্ম যেন মোরা করি দরশন॥"

জীব-জীবনে সেই ব্রহ্মের অবস্থান তো ঐ উপনিষদেই ঋষি বলে গেছেন—

"বৃহচ্চ তদ্‌দিব্যমচিন্ত্যরূপম্
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরম্ বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতম্ গুহায়াম্॥"

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম বৃহৎ, দিব্য ও অচিন্ত্যস্বরূপ। সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতররূপে তিনি প্রকাশ পান। তিনি দূর হইতেও সুদূরে অথচ অতি-নিকটে এই দেহেই বর্ত্তমান। তিনি চেতন জীবগণের এখানেই, এই হৃদয়-গুহাতেই নিহিত আছেন।

জবালা সত্যকামকে যে মহাবাণী শোনালেন, সত্যকাম তাই ভারতের বুকে মন্ত্রে মন্ত্রে গেঁথে রেখে ভারতের সত্য ইতিহাসকে অক্ষয় করে গেলেন। সে অক্ষয়বটরূপী ভারতেতিহাস নানা শাখা-প্রশাখায় আজ দীর্ঘকাল ধরে ছড়িয়ে পড়েছে; কখনও শুষ্ক হতে চাইলেও তার রস—সকলের প্রাণ-বস্তুকে উন্মুখ ক'রে—ভাবতে দিয়েছে—'রসো বৈ সঃ'।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মলোক

ভারতই শুধু ব্রহ্ম ও ব্রহ্মলোকের পরিচয় দিতে গিয়ে বুদ্ধির অতীতে যে বোধ, বিজ্ঞানের অতীতে যে জ্ঞান—তারই বলে ব'লেছেন—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়ম্ অগ্নিঃ
ত্বমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বম্ ইদং বিভাতি ॥"

ওরে 'ব্রহ্ম' থাকে না সূর্য্যে চন্দ্রে
তারকা-বিজলি-আলোকে।
পরমদ্যুতি সে অনল তেজ তেজোময় করে কাহাকে ?
পরম পুরুষ দীপ্তিতে ভাতে নিখিল বিশ্বভাণ্ড,
স্বপ্রকাশ-প্রকাশে দীপ্ত ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড"

আপন প্রজ্ঞাবলে ভারত জানতে পেরেছে—

"হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি স্তদ্‌যদাত্ম বিদোবিদুঃ।"

"রজহীন নিষ্কলুষ ব্রহ্মরাজে হিরণ্ময় কোশে
তিনি শুভ্র জ্যোতির সে জ্যোতি আত্মবিদ্ জানে সে প্রকাশে।"

ব্রহ্মের রূপ-বর্ণনায় ভারতের উপনিষদ্ বলেছেন—

ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্ ইদং বরিষ্ঠম্ ॥

"ওরে ব্রহ্ম সে অমৃত।
পুরোভাগে ব্রহ্ম তোর, ব্রহ্ম তোর সম্মুখে পশ্চাতে
উত্তরে দক্ষিণে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম তোর ঊর্দ্ধ-অধঃ-পথে
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড শুধু এই ব্রহ্মময়—ব্রহ্মই শাশ্বত!
ব্রহ্ম সে অমৃত ॥"

কী অপূর্ব্ব মহান ভারতের এই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা!

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

卍

"কোদদর্শ প্রথমং জায়মানম্"

সৃষ্টির কথা কে বলবে? সৃষ্টির আগে কি ছিল আর কি ছিল না সেকি সাধারণ জ্ঞানে জানা যায়, না সাধারণ কেউ বলতে পারে। কেউ তো আর চোখে দেখেনি। অসাধারণ যে বেদ—সব জানা-অজানা যার জানা—সেই বেদও চুপে চুপে বলে গেছেন—

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ
অর্বাগ্ দেদা অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব।
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন
যে অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অংগ
বেদ যদি বা ন বেদ।"

"কেই বা প্রকৃতি জানে,
বর্ণিবে কেবা কেবা এল হেথা জন্মিল কে কেমনে?
কোথা হতে এই বিবিধ সৃষ্টি, দেবাতারা কতপরে,
কোথা হ'তে সব হইল উদয় কে রচিল বল কারে?
সৃষ্টি কি কারও? স্রষ্টা কি আছে? সৃষ্টি-কর্ত্তা যিনি
পরম ধামের প্রভু পরমেশ কাহার সৃষ্ট তিনি—
হয়তো তাহাও জানে না সেজন, কে কাহার কথা মানে,
কেই বা প্রকৃত জানে?"

তবে? জানার উপায়? এ প্রশ্ন কি আজকের।
এমনই প্রশ্ন একদিন করে বসলেন এক ঋষি—
'সৃষ্টির প্রথমে যিনি কে দেখিল তাঁরে?"
এরই উত্তর দিতে গিয়ে গুরু খুল্লেন পাতা—
"আসীদিদস্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ।"

আগে ছিল না কিছু, শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার—মহানিদ্রায় সুপ্ত!

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যায় গ্যাসীয় এক বিশেষ অবস্থা পেরিয়ে যখন সৃষ্ট এক গ্রহের দেহ আঁট বাঁধলো, তখন হ'ল এই পৃথিবী। এরকম গ্রহ অনেক, তাই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা হয়তো ভুল নয়। তারপর অক্সিজেন, হাইড্রোজেনের সংবাদ। তারপর ক্ষুব্ধ স্তর, স্তব্ধ স্তর প্রভৃতি স্তর-বিন্যাস,—চল্লো ৭০।৮০ কোটি বৎসর যাবৎ নানা তেজের উৎপাত, তারপর প্রায় ১৫০ কোটি বৎসর পরে এল জল, মাটি, পাথর, লোহা। বর্ত্তমান বিজ্ঞান সেই সব কথাই বুঝিয়ে দিল যে সব কথা হাজার হাজার বছর আগে মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনে লিখে সৃষ্টি-তত্ত্বের আবিষ্কার করে গেছেন।

আজ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেছেন যে সৃষ্টিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত, আয়নস্, ইলেক্ট্রন্স, নেগেটিভ পজেটিভ কপিলের সেই সাংখ্য মতেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

কপিল অবশ্য সৃষ্টিতত্ত্বে পঞ্চভূত ছাড়াও কাল, দিক, আত্মা ও মন, মোট এই নয় রকম পদার্থ ও চব্বিশ রকমের গুণে এই সৃষ্টির উদ্ভব বলে গেছেন। আর বলে গেছেন আকর্ষণ ও বিকর্ষণের দুই বিপরীত শক্তির ফলেই এই জগতের উৎপত্তি [১]।

"রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ"

কিন্তু যখন মনে প্রশ্ন জাগে কে করলেন ভূ-কম্পের এই লীলা, অগ্ন্যুৎপাত কার খেলা, আবার দীর্ঘ দিন পরে কে করলেন তা আয়ত্ত, কে আনলেন সৃষ্টির বীজ—তখন বিভ্রান্ত চিত্তে নানা মত ও পথ অনুসরণ করে শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন জ্ঞানী, বা বিভিন্ন ভাবে এই প্রমাণই করে গেলেন যে—"একজন অজ্ঞেয় পরমস্রষ্টা আছেন —যিনি পরমাত্মারূপে পুরুষ বা আত্মা ও প্রকৃতির মিলনে, জীব ও শক্তি সহযোগে সৃষ্টি সুরু করেছেন। সাংখ্যদর্শন বলে "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি।" পাশ্চাত্য "নষ্টিক" জ্ঞানযোগীর—তিন শ্রেণী।

"নাহো নরাত্রির্ননভো ন ভূমি
র্নাসৌ তমো জ্যোতিরভূন্নচান্যৎ।
শ্রোত্রাদি বুদ্ধ্যা নোপলভ্যমেকং
প্রধোনিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ॥"

"মহাসৃষ্টির আগে—
না ছিল দিবস, না ছিল রাত্রি, পৃথিবী আকাশ আলো।
দিবার অভাবে জ্যোতিও ছিল না, ছিল না রাতের কালো।
ইন্দ্রিয়গণে অগম্য যাঁরা বুদ্ধি-অতীতে স্থিতি,
পরম ব্রহ্ম পুরুষ আছিল, ছিল সাথে সে প্রকৃতি।"

সত্যই তখন ছিল শুধু পরম ব্রহ্ম—পরমাণু, বাক্য চিন্তা, মনে তার থই পাওয়া যায় না। অজ্ঞতার অন্ধকারে সব ঢাকা—।

সে অনেক অনেক বছর আগের কথা—
নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো ন ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীব কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্।
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি নরাত্র্যাবঅহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ
আনাবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।

—"যা নেই, যা আছে—পৃথিবী আর আকাশ কিছুই ছিল না। জল ছিল গভীর আর দুর্গম। মৃত্যু ও অমরত্ব ছিল না। রাত্রি দিন ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু—বায়ুহীন হয়েও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে টিকেছিল। সে ছাড়া কিছু ছিল না।"

প্রথম রচনা ও পরমাণু শক্তি

সেদিন আলো, বাতাস, আকাশ মাটী আর জল কিছুই ছিল না। চারিদিকে ছিল শুধু অন্ধকার। তার মধ্যে লুকিয়ে দুটী জিনিষ। একটি ছোট জিনিষ অথচ তার মধ্যেই আছে হাড়, মাংস সব। নাম তার পরমাণু। এমন সময় এল আর একটি জিনিষ—শক্তি বা তেজ যার নাম। পরমাণু অন্ধ—জড়। তাই শক্তি ঘুরেত ঘুরতে যেমনই হাতের কাছে পেল তাকে, ধরলো। অণুর সঙ্গে শক্তির হ'ল মিলন—পুরুষ প্রকৃতির মিলন, আত্মার সঙ্গে শক্তির মিলন।

এই মিলনেই হয় সৃষ্টির প্রথম রচনা মহত্তত্ব। যেই শক্তি মিললো পরমাণুতে, কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল—বোঁ বোঁ করে তারা ছুটলো, তারা ঘুরলো, বোঁ বোঁ করে দিগ্বিদিকে ঘুরছে তো ঘুরছেই।

বেশী ঘুরলেই কিছু হবে তো। হ'ল ধোঁয়া—ফাঁকা আকাশ। আকাশে এল বাতাস, বাতাসের শক্তি থেকে হ'ল তেজ, তেজ থেকে

উথলে উঠলো জল বা অপ। যখন সেই জল থেকে মাথা উঁচু করে জেগে উঠলো মাটি, বল্লাম—জল থেকে সৃষ্টি সুরু হ'ল।

পঞ্চভূত

'মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাম'—সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি থেকে পাই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ আর ব্যোম। এই পঞ্চভূতেই সৃষ্টির দ্বিতীয় রচনা বা ভূততত্ত্ব। ঋক্‌বেদও এই কথাই বলেছে। কপিল, কণাদ প্রভৃতি ঋষিরাও তাতে সায় দিয়েছেন।

সৌরলোক ও নবগ্রহ

ওদিকে আকাশে সেই শক্তি আর পরমাণুর ঘর্ষণে পরমাণুর কিছু শক্তি পড়লো খসে—এগুলো হল অণু। প্রত্যেক অণুর টুকরো খসে খসে হ'ল এক একটি জলন্ত নীহারিকা। প্রথম তো তারা আলাদা আলাদা রইলো—কিন্তু শেষ-ঘোরার মুখে কতকগুলো মিলে গিয়ে হ'ল খুব বড় এক জলন্ত তরল গোলক। শূন্যে ছুটে চল্‌লো সেই জ্বলন্ত প্রকাণ্ড গোলক—আটকে থাকার ঠাঁই চাই তার? চলন্ত জ্বলন্ত সেই গোলক থেকে আবার ছিটকে গড়লো ছোট ছোট জ্যোতি-পিণ্ড—তারাও আবার ঘুরতে সুরু করলে বোঁ বোঁ ক'রে তবে সব কটাই তো বড় জলন্ত, গোলকের টানে আছে আটকে—[২]

এ সব পাই বৃহস্পতি ঋষির বর্ণনায়। তিনি বলেছেন এই যে বড় জলন্ত গোলক ওর নাম সূর্য্য বা সবিতা। সূর্য্য গ্রহণ করে আছে যে সব পিণ্ড তারা অন্য নব গ্রহ। আমাদের সাত বারে আমরা সাতটি গ্রহের সংবাদ পাই—যেমন রবি (সূর্য্য), সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি আর তা ছাড়া রাহু ও কেতু। এই সব গ্রহের আমরা স্তব করি। এ ছাড়া আরও অনেক গ্রহ আছে ছোট বড় এদের সব নিয়েই হল সৌরজগৎ। সবার আগে গড়া এই সৌরজগতের প্রতিটি গ্রহকে আমরা দেবতা ভাবি। পৃথিবী ও সৌরজগতে একটি গ্রহ। সূর্য্য তো, পৃথিবীকে গ্রহণ করে আছেই আর পৃথিবীও গ্রহণ করে আছেন আমাদের।

এমনই গ্রহণ ক'রে যাঁরা হয়েছেন গ্রহ—তাঁদের মধ্যে অন্য গ্রহের খোঁজ এখনও চলেছে। দিনে দিনে নূতন নূতন গ্রহ বেরও

হচ্ছে। যেমন ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লেটো। আধুনিক আবিষ্কার, তাই আধুনিক নাম পেয়েছেন গ্রহরা।

দ্বাদশ আদিত্য

বৃহস্পতি ঋষি চন্দ্র বা সোমকে গ্রহ বল্লেন বটে, কিন্তু অত্রি ঋষি বলেন চন্দ্র স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রহই নয়। সূর্য্যের আলো ধার ক'রে নিয়ে ওর রূপের দেমাক। তবে এখনও অনেক বলেন চন্দ্র গ্রহ।

নব গ্রহের স্বরূপ বর্ণনায় যেমন দেখি মতান্তর, সূর্য্যের নানা নামেরও নানা মত। সূর্য্যের নাম এক এক ভাবে।

সূর্য্যকে আমরা দেখছি ছয় রকম। উদয় থেকে অস্ত পর্য্যন্ত তার গতি ও তেজ ভিন্ন ভিন্ন ছয় রকমের। আগে উদয়—শান্ত, তারপর একটু তেজ, তারপর পূর্ণ তেজ, তারপর স্তিমিত, তারপর অস্ত। এই ছয়টা রূপ বা গতির ছয়টি নাম। মিত্র বা জল থেকে উদয় মনে হয় বলে মধু (জলের এক নাম), তারপরের রূপ—অর্য্যমা বা শুক্র মানে গতিশীল বা স্বচ্ছ, তারপর পূর্ণতেজ বা ভগ। আবার অংশ কমে যায় বলে নাম অংশ, দক্ষিণে টলে যায় তাই দক্ষ, আর জলে ডুবে যায় তাই বরুণ বা মাধব। আদি আর অন্ত নিয়ে তাই সূর্য্যের নাম মিত্রাবরুণ বা মধু-মাধব। এ ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন দেশে সূর্য্যের গতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে, ঋষিরা নাম দিলেন ইন্দ্র, বিবস্বান, পুষা। মোট এই সব আদিত্যের আমরা স্তব করি বটে কিন্তু এই নাম বিভ্রাটে কত গল্পই না তৈরী হ'ল। সে সব বিভ্রাট নানা গল্পের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

সূর্য্যের আরও নাম আছে। বেদে উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্য্যন্ত সূর্য্যের গতি অর্দ্ধ বৃত্তাকারে কল্পনা ক'রে সাত ভাগে ভাগ করে ঋষি তার সাতটি নাম দিলেন। সপ্ত-গতির পরেও আবার তার আর একটি গতি মহামেরুর ওদিকে। এদিকের লোক দেখে না। আটটি গতির আটটি নাম শুনতে বেশ—আরোগ, ভ্রাজ, পটর, পতংগ, স্বর্ণর, জোতিষীমান, বিভাস এবং কশ্যপ।

শৌনিকের মতেও সূর্য্যের অন্য নাম সবিতা, ভগ, পূষ, বিষ্ণু, কেশী, বিশ্বানর ও বৃষকপি—এই সপ্তসূর্য্য।

কিন্তু আমরা জানি দ্বাদশ আদিত্যের কথাই বেশী। স্তব করি দ্বাদশ আদিত্যের—সুখ আর শান্তির জন্য।

ধাতা মিত্রার্য্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য্য এব চ
ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ
একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে।

মোটামুটি সৌর জগতের ব্যাপার নিয়ে, সূর্য্যের নানা দীপ্তি ও গতি ধরে তাঁর নানা নাম। তবে আমরা যেমন সূর্য্যের উদয় অস্তে তাঁর বিভিন্ন রূপ দেখি—তেমনই ঐ নয়টি গ্রহকেও দেখতে পাই এখান থেকে। আর আমাদেরও নয়টি গ্রহের লোক নিশ্চয় দেখতে পান আর হয়তো কোনো একটা নাম বলে প্রণামও করেন।

আমরা পৃথিবীর মানুষ—ঐ সৌরজগৎ, ঐ সূর্য্য, আগুন জল আর মাটীকে প্রণাম করি, স্তব করি, স্মরণে হোম করি আর করি পূজা। করি তো সব কিন্তু কেন করি—এটা তো জানতে হবে।

সূর্য্য ও পৃথিবী

প্রশ্ন—আমরা এলাম কোথা থেকে? কোন্ তেজ থেকে? মাটী উঠলো জল থেকে কখন? কখন পৃথিবী হ'ল ধরিত্রী?

অন্য গ্রহের মতন পৃথিবীও ঘুরছে জলন্ত সূর্য্যের চারিদিকে। কিন্তু সূর্য্যের তেজে পৃথিবী তখন এত উত্তপ্ত যে, তাতে জল, গাছ, জীব কিছুই হয় না, ধরিত্রী তখন বন্ধ্যা।

তারপর পৃথিবী ধীরে ধীরে যায় একটু দূরে, যত দূরে যায় হয় শীতল—আরও দূরে গিয়ে উত্তপ্ত পৃষ্ঠে পড়ে ত্বক—হয় মাটি—আরও দূরে গিয়ে হয় জল, গাছ, প্রাণী, জীব।

জীব-সমাগমে শিবময় হয় পৃথিবী, অশিব—অকল্যাণ যায় দূরে।

কিন্তু কে পৃথিবীকে শান্ত করে পার্থিব এ সবের জন্ম দিলেন? সৃষ্টি সুরু করলেন? ভারত ছাড়া অন্য দেশ তবু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নানা কথা লেখে, বলে, ভাবে, আবার স্বীকারও করে যে তা আজও অসম্পূর্ণ—ঠিক কিছুই হয়নি। ভারত শুধু সৃষ্টির সব কথা ভাবে আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে; বিরাট পুরুষের বিরাটত্বের কাছে মাথা নুইয়ে ভারত স্বীকার করে—"অনন্ত তুমি, সব তোমার লীলা।"

আবার শুধু জ্ঞানে নয়, বৈজ্ঞানিক চর্চাতেও প্রাচীন ভারত নীরব নয়। সৃষ্টির বাস্তব-রূপ দিতে গিয়ে সৃষ্টিতত্ত্বকে শাস্ত্রকাররা নয়ভাগে ভাগ করেছেন।[৩]

নবম সৃষ্টি

প্রথম সৃষ্টি—মহত্তত্ত্ব। শক্তি ও পরমাণু মিলনে সৃষ্টির সূচনা।

দ্বিতীয় সৃষ্টি—ভূতসর্গ। ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতে সৃষ্টির প্রারম্ভ।

তৃতীয় সৃষ্টি—বৈকারিক যুগ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিষের উদ্ভব। পঞ্চভূত থেকে বিরানব্বইটি ভূতের মিলন।[৪] সেই মিলনে হ'ল ঐ নীহারিকা, নীহারিকা সমষ্টি থেকে জ্যোতিষ্ক, সৌরজগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ।

চতুর্থ সৃষ্টি মুখ্যসর্গ। এই সময় হ'ল সমুদ্র, পর্ব্বত আর সমতল প্রদেশ। বাসের উপযুক্ত হ'ল এই পৃথিবী।

পঞ্চম সৃষ্টি—তির্য্যক্স্রোতা। জলে হল কীট, এঁকিয়ে বেঁকিয়ে চলে যারা, তারা পেল জন্ম। হাড় মাংস হয়নি তখন। যেমন—সাপ, কেঁচো, মাছ।

ষষ্ঠ সৃষ্টি—দেবসর্গ। উর্দ্ধস্রোতার সৃষ্টি হ'ল। হ'ল পাখী উর্দ্ধ মানে স্বর্গপানে—আকাশে গতি, যেন জল-ত্যাগের পথ দেখাল। তখন হচ্ছে ডিম থেকে সন্তান সৃষ্টি।

সপ্তম সৃষ্টি—অর্ব্বাক্স্রোতা। বাক্য নেই কার্য্য আছে। সন্তান হয়, স্তন্য পান করে। হাত পা দিয়ে মাটিতে চলে, তবে লোমশ ও লোমশূন্য দুই-ই হ'ল। যেমন—কূর্ম্ম, বরাহ, বানর।

অষ্টম সৃষ্টি—অনুগ্রহ যুগ। এ সময় জীব ধীরে ধীরে অন্যের অনুগ্রহ ছাড়াই চলাফেরা সুরু করে। গ্রহণ বা ধরতেও হয় না কিছু। শিম্পাঞ্জী থেকে সে অভ্যাস ছড়াল বনমানুষে, পরে মানুষে।

নবম সৃষ্টি—কৌমার যুগ। এই যুগেই মানুষ প্রথম আবির্ভূত। কুমারী-কাল এল, কুমার পুরুষ জাগলো। মানুষের প্রথম রূপে হ'লেন স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা—স্বয়ং জন্মালেন তিনি।

আমাদের প্রাচীন ভারতে বর্ণিত এই নবম সৃষ্টির ক্রমবিবর্ত্তন তো আধুনিক বৈজ্ঞানিকরাও স্বীকার করেই প্রায় নিয়েছেন।

ওয়েলসের পৃথিবীর ইতিহাসে দেখি যে তিনিও স্বীকার করেছেন ২০০,০০০,০০০ বছর, সূর্য্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে দূরে গিয়ে যখন শান্ত হ'ল, তখনই সুরু হল সৃষ্টি।

সৌর-জগতের ভূত-সর্গ ও বৈকারিক যুগের পর হল যে বাস্তব জগতের মুখ্য-সর্গ, তা' থেকেই ওয়েল্‌স সুরু করলেন মৎস্যযুগ The Age of the Fishes,—কিন্তু আমরা মুখ্যসর্গের মধ্যেই ধরেছি তার—The Age of Coal Swamps বরং মৎস্য যুগের শেষটুকু গেছে তির্য্যক স্রোতার যুগ, যেটা তাঁর—The Age of Reptiles, হয়তো দেবসর্গের উর্দ্ধস্রোতাই তাঁর The First Birds and The First Mammals,—আর আমাদের সেই অর্বাক স্রোতাই তাঁর—The Age of Mammals, আর তারপর অনুগ্রহ যুগকেই ওয়েল্‌স নাম দিলেন Monkeys, Apes and Submen এর যুগ। সব শেষে আমাদের নবম সৃষ্টির কৌমার যুগকেই তিনি The First True Men এর যুগ বলে স্বীকার করলেন।

এই সব কয়টী যুগ শেষ হতে যে সময় লাগলো আধুনিক বিজ্ঞান তা ৫০ হাজার থেকে সুরু করে লক্ষ কোটি বৎসর ধরেছেন। আমাদের সূর্য্যসিদ্ধান্ত সে সময়টার নির্দ্দেশ করেছেন—

গ্রহর্ক্ষ দেবদৈবত্যাদি সৃজতোঽস্য চরাচরম্‌

কৃতাদ্রিবেদা দিব্যাব্দাঃ শতঘ্না বেধসো গতাঃ ॥

৪৭৪০০ বৎসর গেলো, গ্রহ, নক্ষত্র, দেবতা, দৈত্য এবং চরাচর বিশ্ব সৃজনে।

এখানে দেবতা—ঐ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের অনুরূপ ধরণী, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, শূন্য-দেব প্রভৃতি। প্রকৃতির খেলা হয়ে গেল দেবতার লীলা-কীর্ত্তন। প্রকৃতির খেলায় যখন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—মা ধরিত্রী, বরুণ, অগ্নি, বায়ু ও কশ্যপ হয়ে দেবতার লীলা সুরু করলেন—তখনই ইতিবৃত্ত হল উপকথা।

এখন যাঁরা বলবেন সৃষ্টি ৫০ হাজার বছর তাঁরা সৃষ্টির জন্য ৪৭৪০০ বৎসর শুনে নারাজ হবেন না। আর যাঁরা বলবেন আরও

বেশী, তাঁরা ঐ দিব্যাব্দ কথাটা ধরে দৈব বৎসর হিসাবে ৪৭৪০০ বছরকেই (৪৭৪০০ X ৩৬০) ১৭০৬৪০০০ বছর ধরে নেবেন।

গ্রহ ও নক্ষত্র

তবে এখানে এই সৌরলোকের অভিযানের মধ্যে আমরা পাই এমন সব চমৎকার গ্রহ, নক্ষত্রের লীলার পরিচয় এবং সেই লীলার এমন সব কাহিনী, যা মানতে মন রাজী হয় শুনবার পর।

…নৃত্যতামিব তীব্রো রেণুরপাতয়ত (১০।৭২।৬ ঋক)

"রেণু রেণু হয় নৃত্যের ঘোরে—জ্যোতিষ্কে জ্বলে তারা"—

নীল আকাশে সৌরজগত। সে জগতে শুধু আলোর টুকরো! ছোট যেগুলো সেগুলোকে বলি নক্ষত্র—বড় হলে বলি গ্রহ। এরই তো প্রতিধ্বনি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের পাতায়।

গ্রহ বল্লেও আমরা যেমন সূর্য্যকে প্রধান স্থানে বসিয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রহের আসন দিয়েছি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও সূর্য্যকে গ্রহদের মধ্যে টেনে এক পংক্তিতে বসাননি। তাকে প্রধান রেখে অন্যান্যটিকে গ্রহ বলেছেন। তার মধ্যে আবার চন্দ্রকেও বলেছেন মৃত—গ্রহ নয়, উপগ্রহ। এর বদলে তারা পৃথিবীকে বলেছেন গ্রহ আর রাহু, কেতু নামটা উড়িয়ে দিয়ে চন্দ্র, রাহু ও কেতুর জায়গায় অন্য তিনটি নাম দিয়েছেন ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটো। সূর্য নিয়ে আমাদের নয় গ্রহ।

আর তাদেরও নয় গ্রহ—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি—ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটো। তবে সবগ্রহই সূর্য্যকে মাঝে রেখে ডিমের মতন গোল পথে ঘুরে—পাক খাচ্ছে।

সূর্য্য মাঝে তার সবচেয়ে কাছে বুধ তিনকোটি মাইল দূরে, দিন রাত তার একটা দিক সূর্য্যের দিকে—অর্দ্ধেকটা শুধু দিন। বাকীটা রাত।

তারপরই শুক্র—আমরা ডাকি কখন বা "শুক তারা", কখন বা "সন্ধ্যা তারা"। বছরের এক এক সময় এই শুক্রকেই সন্ধ্যার অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা রূপে দেখা যায়। আবার কোন সময় ভোরে দেখা যায় শুকতারা রূপে।

তারপরই দেখা পাই পৃথিবীর—যেখানে আমাদের ঘর-বাড়ী তাকে তো চিনছি দিনরাত।

এর পরেই মঙ্গল, ঠিক যেন পৃথিবীর কোলের কাছে, তাই যেন আমাদের শাস্ত্র বলেছে, "ধরণী গর্ভসম্ভূতং"—

তারপরই ধরণীর ছেলেকে, ঐ মঙ্গল গ্রহকে যেন আগলে আছেন দেবগুরু বৃহস্পতি। আশে পাশে—মঙ্গল আর নিজের মাঝে রাখছেন আগলে আরও কয়েকটি ছোট ছোট গ্রহকে। তারা ওখানে মোটমাট ১১টা—নাম নিয়েছে গ্রহিকা—পুরাণে এদেরই বলেছে "বালখিল্য"।

"আবৃতো বালখিল্যৈশ্চ ভ্রমতে রাত্র্যহানিতু"।

দিবারাত্র সূর্য্যকে বালখিল্য মুনিরা প্রদক্ষিণ করছেন। বৃহস্পতি গুরু—শান্তশিষ্ট—বৈজ্ঞানিকরা বলেন ঠাণ্ডা কন্‌কনে।

তারপরই শনি। প্রকোপ ভয়ানক তাঁর,অসাধারণ চেহারা—তিনটি মালার মতন বেড়া চারদিকে—যেন ক্রোধকে আটকে রাখার ব্যবস্থা। বোধ হয় এ বেড়াগুলোও ঐ গ্রহিকার মতনই কিছু হবে। তবে এখানেও আছে অন্য ৯টি উপগ্রহ।

তারপরের তিনটির কথা পুরাণে নেই—অথবা সে যুগে দেখাই দেয়নি। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকরাও বলেছেন, এগুলো নতুনই বটে—মানে অনেক পরে। প্লূটোর তো মাত্র ২০।২২ বছর বয়স।

ধূমকেতু

আমাদের পুরাণে আছে রাহু আর কেতু। ছিল আগে রাহু তারপর সুদর্শনে মস্তক ছেদের পর তার মুণ্ডটা রাহু হল—ধরটা হল কেতু। আবার ঐ কেতুরই মুণ্ডহীন কবন্ধের মতন লম্বাদেহ—রক্তহীন প্রাণহীন তাই ক্রমে হয়ে গেল ধূমের মতন—লেজের মতন হল পেছনটা নাম দিলাম ধূমকেতু। সব সময়ে বিশ্রী চেহারাটা নিয়ে হয়তো থাকতে চায় আড়ালে—যখন দেখা যায় তখন জ্বালায়—আতঙ্ক হয় সবার মনে—ক্রোধ তার উল্কা হয়ে ঠিকরে পড়ে আমাদের দিকে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকও তাই বলেন, ধুলোর কণার মতন বাষ্পভরা দেহ—হঠাৎ উদয় হয়—সূর্য্যের দিকে এগোয়—তাপ দেখে পালায়। নিজের ক্রোধে নিজেই পুড়ে উল্কা হয়ে মাটিতে পড়ে।

এসব কথা দূরবীন দিয়ে পরখ করে—ঘষেমেজে বৈজ্ঞানিকরা এযুগে বলেছেন বটে কিন্তু আমাদের প্রাচীন জ্ঞান-বৃদ্ধ ঋষিরা প্রায়

একই কথা বলেছেন। যেটুকু অদল বদল—তা শোনা বা গোণার পথের অমিল মাত্র, অথবা প্রাচীন হলেই তো তাতে একটু ক্ষয় আসে।

যেমন বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদেরই আগের দল বলেছেন সূর্য্যকে নিয়ে নটি গ্রহ। প্লুটো তখনও দেখা দেয়নি। প্লুটো এল, মত গেল পাল্টে। মোটমাট আধুনিক বিজ্ঞানে যে নয়টা গ্রহের কথা বলে আর তাদের স্থান নির্দ্দেশও যে ভাবে করে আমাদের বেদেও তার ইসারা নেই কি? বরং পুরাণের রাহু কেতু বেদে জমকেই বসেনি।

আমাদের ঋগেদের ১০।৭২।৭ সূক্তে পাই সূর্য্য কেন্দ্রে অন্য গ্রহকে আকর্ষণ করে আছে। ১০।৭২।৯ সূক্তে পাই আর্য্যগণ সূর্য্য, বুধ, শুক্র, পৃথিবী (স্বর্ভানু) চন্দ্র (স্বর্ভানু) মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই নয় গ্রহ ঠিক করেছেন।

'স্বর্ভানু' নামটা দিয়ে বোঝান হ'ল ওদের নিজের তেজ নেই, সূর্য্যের তেজে ওদের তেজ। এক রকম মৃত গ্রহই বলতে হবে তা'হলে। বেদ ও আধুনিক মত প্রায় একই হ'ল না কি?

পুরাণ একটু গোলমাল করলে—হঠাৎ রাহু কেতুর গল্প ব'লে। অন্য গ্রহের সঙ্গে তাদের দিল মিলিয়ে—পৃথিবীকে নিল দল থেকে বের করে কারণ সেতো আমাদেরই ঘর। আমরা নিজেদের নিজেরা প্রধান করবো কেন? অন্য গ্রহদেরই দেবতা বলে প্রণাম করলাম। পৃথিবী ধরে আছে তাই বল্লাম ধরণী। ওদের ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো আর আমাদের রাহু, কেতু, চন্দ্র—এরাই অমিলের মূল। তবে "স্বর্ভানু" শব্দের জোরে তারও মীমাংসা হয়েছে। সে সব গল্প হবে পরে।

এযুগে গ্রহদের পর পর থাকার যে বিবরণ ওরা যন্ত্রে পেল, দেখতে পেলাম সেই কথা আমরা পুরাণের প্রাচীন মন্ত্রেও—

নক্ষত্রেভ্যো বুধশ্চোর্দ্ধং বুধাচ্চোর্দ্ধন্তু ভার্গবঃ
বক্রস্তু ভার্গবাদূর্দ্ধং বক্রাদূর্দ্ধঃ বৃহস্পতিঃ।
তস্মাচ্ছনৈশ্চরশ্চোর্দ্ধং............

ভার্গব হলেন শুক্র আর বক্র হলেন মঙ্গল। শ্লোকটি একেবারে ওদের তথ্যেরই ভারতীয় প্রাচীনতম সত্য।

এই সব গ্রহ নিয়ে কাহিনীর অন্ত নেই পুরাণে—আর রাশি নক্ষত্র নিয়েও সে কী অপূর্ব্ব গল্প কথা।

প্রথমেই তো, রাশি ও নক্ষত্রের নামকরণেই দেখি—কী অপরূপ কল্পনা।

সৌরলোকে যখন পৃথিবীর প্রথম উদ্ভব, প্রথম যাত্রা—যখন মানুষ আনতে পারেননি তিনি টেনে তাঁর বুকে, ছিলেন শুধু তপ্ত, ঊষর, বন্ধ্যা তখন তার কত ব্যথা! যখন সৃষ্টি হ'ল সব, তখনকার সেই প্রসব-ব্যথাও কি তাঁর কম! তারপর—আনন্দ

রাশি ও নক্ষত্র

গল্প যাই হোক, এর মধ্যে পৃথিবীর গতির সঙ্গে, তার রাশি বা নক্ষত্রে জড়িয়ে, পৃথিবীর বুকের মানুষের ভাগ্য বা অবস্থাও বদলাতে লাগলো বৈ কি?

সূর্য্য সিদ্ধান্তের মতে ৪৭৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত যে গ্রহ, নক্ষত্র, বা বিশ্ব-সৃষ্টি হ'ল, তা' ৯ রকমর হলেও ঋষিরা রাশি নক্ষত্রের নাম ও কাজের মধ্যে পৃথিবীর সেই ৯ রকম অবস্থার বর্ণনা করে গেছেন।

আর সেই কারণেই পৃথিবীর নিজের ঘোরার পথ বা কক্ষকে ২৭ ভাগ করে ২৭ নক্ষত্রের নামকরণ আর পরিক্রমার পূর্ণ কাল ৩৬০ দিনকে ১২ ভাগ করে বারটি রাশির নাম হ'ল, দীর্ঘতমা ঋষি তা সমর্থনও করে গেছেন তার জ্যোতিষ গণনায়। ঋগ্বেদের ঋক্ অনুসারে ধার্য্য হয় যে—গতিশীলা আধার-রহিতা পৃথ্বী সূর্য্যের আকর্ষণে শূন্যে থেকে অশ্বিনী নক্ষত্রে যাত্রা সুরু করে রাশিতে রাশিতে মানে ভাগে ভাগে ঘুরে ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ৯ মিনিট ১০·৭৫ সেকেণ্ডে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করেন।

সূর্য্যের কোঠা থেকে ছিটকে ঘুরতে ঘুরতে গ্রহের রাজ্যে যখন তিনি দূরে সরে যেতে লাগলেন, তখনকার তার গতি-পরিক্রমা হিসেব করে রাশি তৈরী করলেন শাস্ত্র-কারগণ। গতির রাশ মানাতে যেমন হল রাশি, নিজের কক্ষে আবর্ত্তনের সময় মেপে ঠিক হল নক্ষত্র।

ঋক্ বেদ আছে—দীর্ঘতমা ঋষি বলেছেন—"এক চক্র, দ্বাদশ পরিধি ও তিন নাভি। কে তাঁহার গতি রোধ করিতে পারে?"

অর্থাৎ পৃথিবীর একটি পূর্ণ চক্র এক বৎসর, তার মধ্যে দ্বাদশ পরিধি মানে ১২টি রাশি আর নক্ষত্র ও রাশিকে তিনভাগে ভাগ করে তিনটিভাগের সন্ধিস্থল মানে নাভি।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে আবার মিস বা মেষ রাশিকে অগ্নি রাশি বলা হয়।—পৃথিবী যে তখন আগুনের মত—তেজে, রঙে আর স্বভাবে।

রাশিকে তিন ভাগে ভাগ করলে হয়—

(১) মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট

(২) সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক

(৩) ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন

সাতাশ নক্ষত্রকেও তিন ভাগ করলে হয়—

(১) অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষা।

(২) মঘা, পূর্ব্ব ফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা।

(৩) মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী।

এখন রাশির চারটি আর নক্ষত্রের নয়টি নিয়ে যে গ্রন্থি—আর তার সেই রকম ৩টি গ্রন্থির স্তর হ'ল ত্রিনাভি।

আর্য্য ঋষিরা কক্ষা বা ঘরকে অক্ষ বলতেন।

সূর্য্য থেকে সুরু করে অক্ষাংশ নিয়ে পৃথিবী ছুটতো। সেই গতিপথ ভাগ হ'ল এই রাশি আর নক্ষত্রে। তাতেই হ'ল পৃথিবীর অবস্থা-বিপর্য্যয়, দুঃখ থেকে সুখ, সুখ থেকে দুঃখ, শূন্য থেকে পূর্ণ।

মানুষও তাই, তার জন্মের সময় পৃথিবীর গতি পথের রাশি নক্ষত্রটি নিয়ে নিজের ভাগের ছক কাটে শূন্যে। সূর্য্য পরিক্রমণের পথে পৃথিবী ছিল বাষ্পপূর্ণ, সূর্য্যের আলো যেত না তাতে—তারপর যখন সে একটু দূরে গেল, বাষ্প গেল কমে, সূর্য্য কিরণে উদ্ভাসিত হ'ল পৃথিবী—বিকশিত হল তার রূপ। বিকাশ অর্থে মিস্। এই মিস্ থেকে হ'ল মেষ রাশি—লোকে বলে সূর্য্য ঠাকুর মেষের মতন নিরীহ হয়ে পৃথিবীর বশ হল।

পৃথিবী যখন মেষ রাশিতে,—কক্ষভাগে নক্ষত্রেরও বিচার এল। প্রথম ভাগে যেমন মেষ রাশি প্রথম ভাগেই নক্ষত্র অশ্বিনী। ঋগ্বেদে অশ্ব অর্থাৎ সূর্য্য-তেজ। ঘূর্ণায়মাণ পৃথিবীর ঐ শক্তিটাই তো প্রথম। অতএব সে গতি-পথ প্রথম বর্ণনায় নাম হ'ল **অশ্বিনী**, প্রথম সৃষ্টি থেকে পৃথিবী অশ্বিনী নক্ষত্রে রইল শুধু গতি-বেগে। প্রথম সৃষ্টির সময় থেকে ৪২৩২ বৎসর গেল কেটে। বৈজ্ঞানিকের মতে এটা ৫৪৫২৫—৫০২৯৩ খৃঃ পূর্ব্বের কথা।

তারপর পৃথিবীতে এল ভরণের ক্ষমতা। চন্দ্র নিজ প্রভাবে জোয়ার ভাটা সুরু করলে—এল জল। পৃথিবী হ'ল শীতল। চন্দ্র পৃথিবীকে করলো ভরণ, **ভরণী** নক্ষত্রে। এ নক্ষত্রে ভ্রমণ চল্লো তার ৮৪৬৫ সৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

তারপর পৃথিবী আর তরল নয়। জমাট-ভাব এল তরলে, ত্বকের মতন একটা আবরণ পড়লো তার গায়। ত্বকের আর একটি নাম কৃত্তি। পৃথিবী এল **কৃত্তিকা** নক্ষত্রে। এই অবস্থায় কেটে গেল ১০৫৮ বৎসর—কেটে গেল ৯৫২৩ সৃষ্টাব্দ।

এর পরই তো বর্ষণ। তবে না হবে শস্য। বর্ষণে বৃষ্ ধাতু। রাশির নাম হল **বৃষ**। কৃত্তিকার পর এই রাশিতেই রোহিণী অংশ অতিক্রম। পৃথিবীর ত্বক এবার মোটা হয়েছে, পাহাড় গজিয়েছে—নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনে মাটি হয়েছে—সেই উৎপাতে উঁচু-নীচু। উঁচু হয়ে জীবের উঠবার বা আরোহণের স্থান হলো। নক্ষত্রের নাম হ'ল **রোহিণী**। ১৬৯৩০ সৃষ্টাব্দ গত হল। তখনও কিন্তু গাছ নেই, প্রাণী নেই, জল নেই, রস নেই। পৃথিবী মৃতা। মৃ ধাতু মানে মৃত্যু। মৃত হয়েও কিন্তু পৃথিবী গতিময়ী (মৃ+গ)। তারই শিরোভাগে অবস্থান করে নক্ষত্র নাম নিল **মৃগশিরা**। কাটলো ১৯০৪৬ সৃষ্টাব্দ।

কিন্তু এর পরই এল জল। পৃথিবী আর্দ্রা নক্ষত্রে এসে হল আর্দ্র। যতক্ষণ জল আসেনি, পৃথিবী আর্দ্র হয়নি—ততক্ষণ ছিল মাটির নানা স্তর। বৈজ্ঞানিকরা সেটাকে বলেছেন Pre-cambrian স্তর। জীব নেই। তাই Azoic যুগ। প্রাচীন ঋষিরাও তৎকালীন ও পরবর্ত্তী নানা স্তরের ৭ ভাগ করে নাম দিলেন—পাতাল, সুতল,

মহাতল, গভস্থিমৎ, নিতল, বিতল ও অতল। এই সপ্ত পাতাল, পুরাণের নানা কাহিনী রচনা করেছে।

আর্দ্রা নক্ষত্র পৃথিবী যখন এল তখনই সৃষ্টির বসবাসের স্থান যেন প্রস্তুত হচ্ছে। পুরুষ ও প্রকৃতি যেন সজাগ হয়েছে। যেন অংকুর দেখা দেয় উদ্ভিদের—যেন সৃষ্টি এবার সুরু হবে। তাই নৈসর্গিক ওলটপালট এ যুগে বেশী। এ যুগেই এল প্রথম সৃষ্টি জীব। এল জীবে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই—এল মিথুন। রাশির নাম হল **মিথুন** রাশি। প্রথমেই হল সমুদ্র সৃষ্টি। আধুনিক পণ্ডিতরা বল্লেন এটাকেই Cambrian ও Silurian যুগ। ২৩২৭৮ সৃষ্টাব্দ গেল কেটে।

এই সময় প্রথম হল কীট। ওরা বলে Trilobites আমরা না হয় বল্লাম ত্রিলোবী। তিনটি অস্থিতে হয়তো গঠন তার। তার পরই তো তির্য্যক-স্রোতার সৃষ্টি। মিথুনে এসে গেছে পৃথিবী। তাই সৃষ্টি হল সব উদ্ভিদ জীব ও জন্তু। যেমন হয়েছে শৈবাল, শামুক কীট—তেমনই হয়েছে কৈটভ বা মধু কৈটভ। আর তাদেরই মেদে হল মেদিনী। Star Sish থেকে সুরু করে Migalosorus পর্য্যন্ত সব। এই সব জন্তুগুলিই হয়তো আমাদের পুরাণের 'শরভ" বা বাঘ, সিংহ ও হাতীর চেয়েও বড় ও ভীষণ।

এযুগে কেটে গেল ২৫৩৯৫ সৃষ্টাব্দ। বিদেশীরা বলেন এটা Triasic যুগ। আমাদের তির্যকের সময় এটা।

জীব যেমনই হ'ল সঙ্গে সঙ্গে হ'ল বাসস্থান। পুনঃ মানে আবার, বস্ মানে বাসস্থান হল। পৃথিবী পরিক্রমায় নক্ষত্রের নাম হ'ল **পুনর্বসু**। বাসস্থান হিসেবে মেরু থেকে পাহাড় আর সমতল সব হ'ল বটে, কিন্তু মৎস্যই হয়ে রইল এযুগের প্রধান। তাই আমরা জীব মধ্যে মৎস্যকে অবতারের সম্মান দিয়ে পূজা করি। সেই হিসেবে সত্যযুগের সুরুও বলা যায় বৈকী। হ'ল জীব কিন্তু কু বা কুৎসিৎ সে। বেঁকান তার রূপ ও চেহারা তাই যুগটির নাম-করণ হ'ল কর্কট। ঋগবেদেও 'কুচর" বলছেন এই কর্কটকে—কুৎসিত জীবকে। তখন সৃষ্টাব্দ ২০৬৬৫ রাশি হ'ল **কর্কট** এই সময়

বিভিন্ন গাছ হ'ল—আবার উত্তাপে ও নৈসর্গিকবিপ্লবে বহু গাছ কাঠ কয়লা হয়ে গেল—তাই এটাকে অঙ্গার-জনক যুগ বলা হয়। বৈদেশিকগণ নাম দিলেন Carboniferous age. সরীসৃপ থেকে, গাছ, ফল কীট পতঙ্গ হয়ে পৃথিবীকে পোষণ করতে সুরু করলো—এই পুষ্যা-নক্ষত্রে। কেটে গেল সৃষ্টির ৩৫৮৬০ বৎসর।

সেই সব মানুষই আবার দিনে দিনে রকমারি বর্ণের আর রকমারি আকৃতির হ'য়ে দেখা দিয়েছে, দেশ ও ঋতুর চাপে।

প্রথম হল **কৃষ্ণবর্ণ**, মাথার পাশটা চাপা সামনেটা উঁচু, নাক মোটা চেপ্টা, ঠোঁট পুরু, চুল কোঁকড়া, ধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য।

তারপর **তাম্রবর্ণ**। তখন চুল কাল, সোজা শক্ত, শ্মশ্রু স্বল্প, নাসিকা কিছু সূক্ষ্ম, ঠোঁট পুরু, অস্থির চিত্ত, যুদ্ধপ্রিয় ও নাস্তিক।

তারপর **কটাবর্ণ**—এরা আগের চেয়ে একটু ভাল। শীকার করে, বন্য-পশুর মাংস খায়।

তারপর **পীতবর্ণ**—এদের নীতিজ্ঞান না থাকলেও কৃষিকার্য্যে দক্ষ, শ্মশ্রু দীর্ঘ, নাক, চোখ, মুখ গোল। অনুকরণপ্রিয় ও কিছু সভ্য।

তারপর **শ্বেতবর্ণ**—এরা এখন সভ্য। শিল্প ও শিকারে দক্ষ, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা সরু, মস্তক বৃহৎ, কেশ কৃষ্ণবর্ণ, নীতিজ্ঞান প্রখর ও উন্নতিশীল।

এই সময় মাছের পাশে এসেছে কুর্ম্ম—দেহের শল্ক বা আঁশ হয়েছে শক্ত। বিদেশী ভূ-তত্ত্ববিদগণও বলেন এই সময় "প্লিনিওসরস্" নামক এক অদ্ভুত জীব ছিল—মুখ গো-সাপের মতন, দাঁত কুমীরের, ডানা তিমির, গলা রাজহাঁসের মতন—একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ আর কি! হয়তো আমরা বল্লাম কুর্ম্ম-অবতার। সেদিনও এক কঙ্কাল পাওয়া গেছে ৫৭৫ মণের। দৈর্ঘ্য সে কঙ্কালের ১৫৬ ফুট—সে সব কীট, পশু হলেও দৈত্য বৈ কী? পৃথ্বী তখন ব্যাপ্ত, মাটী তার ১৩০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত পুরু। ব্যাপ্তি অর্থে অশ্ ধাতু, লেশ মানে অল্প। অল্প ব্যাপ্ত হয়েছে। বসবাসের জন্য অল্প স্থল ভাগের উদয় হয়েছে—অশলেশ বা অশ্লেষা নক্ষত্রে।

তারপরই পৃথ্বী এলেন পুষ্যায়—পোষণ সুরু হল তার। সর্ব্ব

প্রাণীর স্তন্যপানে জীব হ'ল পুষ্ট। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন সে যুগকে Jurassic বা ক্রিটাসিয়স্ যুগ অর্থাৎ চাখড়ির যুগ। শামুক ঝিনুকের যুগ গেল। তাদের নাশ করলো বড় বড় জীব, যেমন বরাহ। পুরাণে শঙ্খনাশী জীবের বর্ণনা হ'ল—হ'ল শঙ্খাসুর বধ বা বরাহ রূপে করেন হিরণ্যাক্ষ বধ। হিরণ্য মানেও শম্বুক-শঙ্খ আর বর মানে শ্রেষ্ঠ—অহ অর্থে নিয়োগ। বরাহ হলেন তখন শ্রেষ্ঠ অবতারের প্রতীক। গেল কেটে ৩৮০৯২ সৃষ্টাব্দ **পুষ্যা** নক্ষত্র—পথের পরিক্রমায়।

এর পর শ্যামল পৃথ্বী ফলে, ফুলে, নদীজলে, হলেন ভূষিতা। "মঘ" মানে ভূষণ—তাই ভূষিতা পৃথ্বী এলেন সে **মঘা** নক্ষত্রে। বৈদেশিকগণ বল্লেন Euocene বা Oliogessin যুগ। ঋগ্বেদে আবার অঘ মানে বল্লেন পাপ। সুন্দর পৃথ্বী দেখেই হ'ল পরশ্রী-কাতরতা—এল হিংসা পাপ তাই নামটাই পাপপূর্ণ মঘা। আজও ঐ নক্ষত্রে কেউ যাত্রা করেন না। পৃথ্বী কিন্তু সেই যাত্রাতেই এলেন **সিংহ** রাশিতে; সিংহবিক্রমে সূর্য্য কিরণ পড়েছে ধরাতলে —মানুষ সিংহবিক্রমে জেগে উঠেছে প্রাণী জগতের উপর।

৪২৩২৫ খৃঃ কেটে গেল। তারপর পৃথ্বী এসে হাজির পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্রে। ফল্গু মানে বিদীর্ণ অথবা ফলবতী। মাটি বিদীর্ণ করে এই যুগে উঠল হিমালয় ও আল্পস্। পৃথ্বী—এ যুগেও হল ফলবতী। প্রথম দিকটা তার **পূর্ব্ব ফাল্গুনী** শেষ দিকটা **উত্তর ফাল্গুনী**। সেই সময় বসুন্ধরার শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হল—হল মানুষ। কৌমার সৃষ্টির সময় স্বয়ম্ভু হলেন জাত। তারপর হল মানব জাতির সুরু।

ব্রহ্মা বা স্বয়ম্ভু হলেন যখন, তখন ৪৭৪৬২ সৃষ্টাব্দ গেছে কেটে। আর তার ঠিক এক বৎসর পর থেকেই ব্রহ্মাব্দ হল সুরু।

স্বয়ম্ভু হলেন কিন্তু সৃষ্টির জন্য চাই কন্যা। পৃথ্বী তাই এলেন **কন্যা** রাশিতে। বুঝি প্রথম বিবাহ হল স্বয়ম্ভু পুত্র মনু ও কন্যা শতরূপার। বাইবেলের আদম্ ও ইভের হ'ল পরিণয়। সব দেশে তখন কন্যার প্রাধান্য। রাশি তাই কন্যা রাশি বা যুগে প্রসিদ্ধ

হল। কাটল ৪৭৯৪৬ সৃষ্টাব্দ। কিন্তু তার পরেই আবার জলপ্লাবন ও হিমপ্রবাহ। আর্য্যরা পালিয়ে এলেন সুমেরু দেশে।

এর পরই ধরিত্রী হেসে উঠলেন, আর্য্য বা মনু সন্তানদের বিদ্যা ও জ্ঞানে। হস্ ধাতু যোগে নক্ষত্র হ'ল হস্তা। এই সময় ত্রেতা-দ্বাপর ও কলিরা কিছু ভাগ কেটে গেল জ্ঞান ও বিদ্যা শিল্প-কলার সাধনায় হস্তা নক্ষত্রে পৃথ্বী হেসে উঠলেন। এমনই করে কাটল ৫৪৫২৬ সৃষ্টাব্দ। ওদিকে যীশু হলেন—ওরা ১ খৃষ্টাব্দ থেকে সুরু করলে। আজ অবধি তাহলে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ৫৬৪৮২ সৃষ্টাব্দ কেটে গেছে পৃথ্বীর সৃষ্টির পর। কলি কিন্তু এখনও পূরো কাটেনি। তবু এই নক্ষত্রেই জ্ঞান সকলকে উন্নত করে, জীব চিৎ-শক্তি পায়। চিত্রা নামে নক্ষত্রটি খ্যাত হয়। চিত্রাতেই তো জগৎ চিৎ বা জ্ঞান দ্বারা ত্রাণ পেয়েছে। চিত্রার অধিপতি—বিশ্বকর্ম্মা। তাই না এই নক্ষত্রেই যত শিল্প কলা আর বিজ্ঞানের উন্নতি। আজও আমরা বা আমাদের পৃথিবী চিত্রা নক্ষত্রের কোঠায় চলেছি। এরপর প্রাচীন গণনানুসারে কলির প্রথম কলা শেষ হবে ৫৭১৩৮ সৃষ্টাব্দে। সাঙ্গ হবে ব্রহ্মার একটি দিন, হবে শেষ তাঁর প্রথম কল্প।

পরবর্ত্তী সে পরিক্রমায় পৃথ্বী যাবে তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীনে—বাকী নক্ষত্র-পথের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা আলোচনা ক'রব না, তবে ১২ রাশিতে ও ২৭ নক্ষত্র পরিক্রমার পর মী অর্থাৎ মৃত্যু আসবে ব্রহ্মাণ্ডের। শেষ হয়ে যাবে সব মীন রাশিতে।

সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী।

এখন পৃথিবী এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে চল্লেন। পূর্ব্ব পশ্চিমেই ঘোরেন। রেণু ঋষি—'বিষু" নাম দিলেন ঐ ঘোরার পথটার।

সেপথে উত্তরে দক্ষিণে মেরুদণ্ডে পৃথিবী আছে হেলে। সে ভাবটার নাম দিলেন ঋষিরা 'শুনঃশেফ"। শুন মানে গমন করা আর শেফ মানে শি—ফস্ অর্থাৎ ফস্ ভাবে স্ফীত জিনিষ, শী-অর্থে শয়ন করা। অর্থাৎ যে স্ফীত জিনিষ শোয়া অবস্থায় চলতে থাকে তাই হ'ল "শুনঃশেফ"। দীর্ঘতমা কর্ত্তৃক শুনঃশেফ অর্থাৎ হেলান ভাবের পৃথ্বীকে নিয়ে নক্ষত্র, রাশি প্রভৃতির বিচারে নিজ

মতানুসারে গণনা করার কাহিনী নিয়ে অর্থাৎ হেলান ভাবে পৃথিবী নিয়ে জ্যোতিষের বিচার ধরে কত রকম গল্প হয়েছে পুরাণে। নরমেধ যজ্ঞের অবতারণা হয়েছে কাব্যে আর কাব্য-রসিকের হাতে।

শুনঃশেফ মানে হেলান ভাবে পৃথিবীর গতি। অথচ এই নামটি নিয়ে পুরাণে বড় বড় দুটো গল্পই হয়ে গেছে। প্রথম গল্প রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়। রাজা হরিশ্চন্দ্র নিজ ধর্ম্ম পালনের জন্য নিজের ছেলে রোহিতকে—বলি দিতে চাইলেন। ছেলে রোহিত রাজী হ'ল না।

তখন অজীগর্ত্ত নামে দরিদ্র এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজেরই দারিদ্র্যের জন্য অর্থের বিনিময়ে নিজের ছেলে শুনঃশেফকে বলি দিতে স্বীকার করলেন। কাঠগড়ায় মাথা দিতে বালক স্বীকার করলেও এ নরবলি বিশ্বামিত্র মেনে নিতে রাজী নন। তিনি শুনঃশেফকে বললেন দেবগণের স্তুতি করতে। তুষ্ট দেবগণ তখন বালকের কাতর ক্রন্দনে তুষ্ট হয়ে তাকে মুক্তি দিলেন। হরিশ্চন্দ্রও সত্য-মুক্ত হলেন। গল্পটি ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে। বেদে শুনঃশেফ ঋষির লেখা সূক্তেরও অভাব নেই।

শুনঃশেফ নিয়ে অপর একটি কাহিনী আছে রামায়ণে—

রাজা অম্বরীষ যজ্ঞ করবেন—যজ্ঞ করে হয়তো ইন্দ্রত্বও পেয়ে যেতে পারেন—ইন্দ্র তাই যজ্ঞের পশু চুরি করলেন। উপায়! পুরোহিত বল্লেন সঙ্কল্পিত পশুর পরিবর্ত্তে একমাত্র ব্রাহ্মণ শিশুকে বলি দেওয়া যেতে পারে। হ'ল ব্যবস্থা—ব্রহ্মর্ষি ঋচীকের ছেলে শুনঃশেফ—তাকে আনা হল কিনে—বাঁধা হল বলির কাঠগড়ায় —কিন্তু এখানেও বলি হলনা, বিশ্বামিত্র এখানেও তাকে দেবতা-দের আরাধনা করতে বললেন। দেবতারা সে আরাধনায় তুষ্ট হলেন—শুনঃশেফ মুক্তি পেল। মুক্তি কিন্তু সব গল্পে সর্ব্বত্রই—

অনুরূপ একটি কাহিনী আছে—"নরমেধ যজ্ঞে"। নহুষের প্রেত-আত্মার মুক্তির জন্য এক দ্বিজ- শিশুর বলি। সেখানেও দ্বিজ শিশু বিষ্ণু কৃপায় মুক্ত হয়েছিল। মুক্তি পেলেও কাঠগড়ায় তিন স্থানে বাঁধা নিয়ে আবার অন্য গল্প তৈরী হ'ল।

সে যুগে দীর্ঘতমাচক্র নামক যে সৌর বিচার—তাতে পৃথিবীর গণনা

চলতো তিন জায়গার সম্বন্ধ নিয়ে। ত্রৈতনে আবদ্ধা পৃথিবী—কর্কট ক্রান্তি, বিষুবরেখা আর মকর ক্রান্তি—উত্তর মেরু, মধ্যস্থ বিষুবরেখা আর দক্ষিণ মেরুতে বাঁধা হলেও গতিপথে যেন একটু হেলান।

পৃথ্বীর সর্ব্বদা ভয়—হেলান এ ভাবে তিনটি বাঁধনের একটি খসলে শেষ হতে হবে। তাই তাঁর প্রার্থনা। সে মন্ত্রে বেদ পূর্ণ।

"ত্রিতন" বা তিনটি বাঁধন নিয়ে—আরও গল্প হ'ল তৈরী। কারণ দীর্ঘতমা পৃথ্বীর এই ত্রিতন বা হেলান ভাব নিয়ে যে গণনা-চক্র করলেন বলিরাজার সময় তা গেল পালটে। প্রচলিত হ'ল বলি-চক্র। বলিরেখার "বলি" হ'য়ে গেল রাজা বলি।

দীর্ঘতমা-চক্র ও বলি-চক্রের মতান্তের হ'ল এক কাহিনী। রাজা বলি নিজের শক্তি ও ভক্তি নিয়ে যখন সাধনার বলে স্বর্গ মর্ত্ত জয় করতে বসলেন—তখন ভগবান বিষ্ণু দেবতাদের কাতরতায় বামনরূপ ধরে বলিরাজের দানের সভায় উপস্থিত। ছোট বামন—বেঁটে লোকটি ভিক্ষে চাইল তিন পা জমি। বলিরাজার পুরোহিত শুক্রাচার্য্য বুঝলেন সব, বারণ করলেন এ দান করতে, কিন্তু ভিক্ষা চেয়েছেন বামন—দাতা সে ভিক্ষা পূর্ণ করবেনই। তাইতো বলি শ্রেষ্ঠ দাতা! স্বীকার করলেন বলি—তিন পা জমি দেবেন। সঙ্কল্প হবে—শপথ করতে হাতে কমণ্ডলুর জল নেবেন—জল পড়েনা। পুরোহিত শুক্র—যজমানকে বাঁচাতে নিজ আত্মাকে রাখলেন কমণ্ডলুর ছিদ্রপথে বাধা দিতে। বামন বিষ্ণু বুঝলেন, কুশ নিয়ে ফুঁড়ে দিলেন সেই গর্ত্ত—শুক্রাচার্য্যের একটী চক্ষু গেল।

বলিরাজার দান সাঙ্গ হল, বামন বিশাল একপদে স্বর্গ ঢাকলেন, দ্বিতীয় পদে ঢাকলেন মর্ত্ত কিন্তু তৃতীয় পদ রাখেন কোথায়—স্থান কই? রাজা বলি দিলেন নিজের মাথা পেতে—বল্লেন "দাও দেবতা—ও চরণ আমার মাথায় দাও।" "অতি দানে বলির্বদ্ধঃ"—বাঁধা পড়লেন বলি—তৃতীয় পায়ের চাপে গেলেন পাতালে।

যাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চান পুরাণ কাহিনীর ব্যাখ্যা তারা করেন—"বলি" কথাটার মানে বলিরেখা—পৃথ্বীর বলিরেখা মানে স্থূল যে স্থান—বুঝি পর্ব্বত-শৃঙ্গ। বিষ্ণুপুরাণে নাম আছে শৃঙ্গবান।

আজও বলিচক্রে বিষ্ণু মানে সূর্য্য সর্ব্বদা অয়ন বিন্দু অর্থাৎ বামন রূপে থাকেন।

দীর্ঘতমা আর বলির বিচার-কলহেও আবার হ'ল এক পৃথক কাহিনী।

দীর্ঘতমা মানে তম যাঁর দীর্ঘ—কেউ বল্লেন অন্ধ, কেউ বলে কামনায় অন্ধ। গল্পে রইল গাঁথা যে ঋষি দীর্ঘতমাকে নিয়ে।

দীর্ঘতমার জন্মই যে কাম-প্রবৃত্তির মধ্যে। বৃহস্পতির বড় ভাই ঋষি উতথ্য। একদিন তাঁর স্ত্রীকে বৃহস্পতি করলেন গর্ভিণী, সেই গর্ভেই জন্ম হ'ল দীর্ঘতমার, আর গর্ভেই তিনি হলেন অন্ধ। একে অন্ধ, তাতে জন্মের সঙ্গেই রক্তে মিশেছে কামনার গ্লানি। তাঁর দুর্ব্বলতা ছিল "গো-ধর্ম্ম"—যথায় তথায় স্ত্রী-সম্ভোগ, বাদবিচার ছিল না। রাজ্যের সবাই ক্ষেপে উঠলো—স্ত্রী পুত্ররাও।

দীর্ঘতমার গণনা তখন অচল, গণনায় বলিচক্র সুরু হয়েছে ত্রিতনে। তাঁর গণনা কেউ মানেনা—সবাই মিলে ত্রিতন নামক চাকরকে দিয়ে মুনিকে কষে বেঁধে জলে ফেলে দিলেন।

মজা—শাস্ত্রে ত্রিতন মানে ত্রেতাকাল, ত্রিতন মানে তিন জায়গায় বাঁধা আবার ত্রিতন চাকরের নাম!

ভাসতে ভাসতে চল্লেন দীর্ঘতমা,—বলির রাজ্যে ঋষিকে দেখে সবাই ওঠালেন তাঁকে। রাজা দিলেন আশ্রয়।

ওদিকে বলির বহু রাণী—কারও সন্তান হয় না।

তাই রাজা রাণী অনুরোধ করলেন দার্ঘতমাকে পুত্রদানের জন্য, ঋষি হয়তো পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন অথবা ক্ষেত্রজ পুত্র দানের বিধি নিয়ে—তিনি রাণীদের গর্ভে পাঁচপুত্রের জন্ম দিলেন।

একদিন এই পাঁচছেলেরই নাম হল—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র আর সুহ্ম।

পাঁচ ছেলে কালে পাঁচটি রাজ্য স্থাপন করেন—আজ আমাদের বাঙ্গলা বঙ্গ-প্রতিষ্ঠিত সেই রাজ্যেরই একটি রাজ্য।

কোথায় কর্কট-মকর-বিষুব, কোথায় শায়িত ভাবে পৃথ্বীর গতি, কোথায় দীর্ঘতমা চক্র আর বলিচক্রের বিরোধ, আর কোথায় নরমেধ যজ্ঞ, বামন ভিক্ষা আর অঙ্গ-বঙ্গ প্রতিষ্ঠা!

পুরাণের পাতায় বিচিত্র এইসব কাহিনীর আর অন্ত নেই! নাম বিভ্রাট আর সংস্কৃত শব্দের বিভিন্ন অর্থ আর ব্যাখ্যা সম্বল করে কবির-কৌতুক-কল্পনা যেন রহস্য-চ্ছলে সমস্যা দাঁড় করায়! আর সে সমস্যার বেশীর ভাগই জ্যোতিষ আর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে। প্রথম সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে ঋগ্বেদে বৃহস্পতি ঋষি বলছেন—

ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি।

"উত্তানপদ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিক্ সকল, অদিতি হইতে দক্ষ, দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন।"

প্রথমেই বিস্ময় জাগে অদিতির ছেলে দক্ষ আবার সেই দক্ষেরই মেয়ে অদিতি! আবার সৃষ্টিই যখন সুরু তখন কোথায় দক্ষ আর কোথায় সেই অদিতি—ব্রহ্মাই যে হয়নি তখনও! আবার ঐ উত্তান-পদ, মানে শূন্য থেকে এই পৃথিবী, পৃথিবী থেকে দিক—প্রকৃতির এই সৃষ্টি-পরিচয়ের সঙ্গে দক্ষ অদিতি সব মিশেই বা যাবে কেন?

অতএব এর অর্থ আছে নিশ্চয়। মানেটা পরিষ্কারও করেছেন অনেকে নিজ নিজ পাণ্ডিত্যে। তাঁরা বলেছেন—প্রথম অদিতি অর্থে—অৎ ইতি মানে তেজ আছে যাতে। তা' থেকে সম্ভূত হল (দক্ ষ প্রত্যয়ে) দক্ষ অর্থাৎ জল। তেজ থেকে জল, আবার জল থেকে অদিতি—এ অদিতি মানে পৃথিবী। দো অর্থে ছেদন করা, তি অর্থে ক্রিয়ার রূপ। পৃথিবীকে চলেনা ছেদন করা তাই, সে অ—দিতি। অতএব মোটমাট তেজ থেকে হল জল, জল থেকে হ'ল পৃথিবী।

সৃষ্টির বহু বছর পরে, অনেক পুরুষ কাটবার পর তবে না মনু-শতরূপার সন্তানক্রমে এলেন দক্ষ, অদিতি, কশ্যপ, সব। সৌরজগতের কাহিনী—সৃষ্টির আদি কল্প-কথা, গল্প কথায় দাঁড়িয়ে গেল।

দক্ষের কন্যা সাতাশটি নক্ষত্র—চন্দ্র তাদের বিয়ে করলেন। এ আকাশের চাঁদ নয়। আর ঐ চঞ্চলা নক্ষত্রও সে চাঁদের স্ত্রী নয়। পুরাণের সে গল্প হয়তো গ্রহ-গতির রূপক মাত্র।

চাঁদ নক্ষত্র সৃষ্টির অনেক পরে সেই দক্ষ রাজা। আদর করে তিনি আকাশের নক্ষত্রের নামে নাম দিয়েছিলেন হয়তো মেয়েদের।

সে কল্পিত কাহিনীর প্রথমেই দেখি—"এক যে ছিল রাজা, তাঁর নাম ছিল দক্ষ—তাঁরই সাতাশটি মেয়ে—ঐ আকাশের সাতাশ তারা—" ঋগ্বেদের মতে এ গল্পের গোড়াতেই গলদ। সম্পতি ঋষি ঋগ্বেদে বলে গেছেন বৃহস্পতি ঋষি গ্রহদের জন্ম বৃত্তান্ত বলেছেন, অথর্ব্ব ঋষি তা অবধারণ করেছেন আর ভৃগুবংশ দক্ষে অর্থাৎ নক্ষত্র বা রাশি চক্রে পৃথিবীর গতি নির্দ্ধারণ করেছেন। সে যুগে রাশিচক্রের নাম ছিল দক্ষ।

এযুগে যন্ত্রে যা হচ্ছে সিদ্ধ, বিজ্ঞানে যা হচ্ছে প্রমাণিত, প্রাচীন যুগে তাই প্রমাণিত হয়ে রয়েছে—বেদের সূক্তে আর পুরাণের রূপকে।

মলমাস

এ গল্পের মূলে আছে, নক্ষত্র ধরে চন্দ্রের আরোহণ-অবরোহণের কথা। চন্দ্র উপগ্রহ, আলো নেই নিজের। আমাদের পৃথিবী থেকে চাঁদের যে আলো দেখি, তা সূর্য্যের কাছে ধার করা আলো। নক্ষত্রের পথ ধরে চলার চাকা ঘুরছে তার—আর সেই ঘোরার পথে ১৫ দিন চন্দ্রের বুকে পড়ে সূর্য্যের আলো—হয় পূর্ণিমা, ১৫ দিন আলো পড়ে না তার বুকে, হয় অমাবস্যা। এই নিয়েই চান্দ্রমাস হয় ঠিক ৩০ দিনে। ফলে সূর্য্যের হিসেবে গণা সৌরমাসের সঙ্গে চান্দ্রমাসের হয় অমিল—রোজই একটু কম। বছরে কমে ১০দিন। তিন বছরে এক মাস বাড়ে—তারই নাম **মলমাস**।

রোহিণী নক্ষত্রকে ধরেই চলে এই আরোহণ ও অবরোহণ পর্ব্ব। তাই কবি বল্লেন রোহিণীকে চাঁদ ভালবাসে বেশী। তাই অন্য বোনেরা পিতা দক্ষের কাছে করলো নালিশ। দক্ষ শাপ দিলেন চন্দ্রকে তোমার যক্ষ্মা হোক। ভয়ে সাতাশটি মেয়েই কেঁদে উঠলো। স্বামী-হারা হবে সব। দক্ষ নিজের ভুল বুঝে বর দিলেন—মাত্র ১৫ দিন থাকবে শাপের জ্বালা—আবার হবে চন্দ্র আরোগ্য। এমনই ক'রেই শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের হল সৃষ্টি।

সৌরজগতের বাস্তব কাহিনী মরজগতের কল্পনাতে ঠাঁই পেল।

সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ

আবার এই চাঁদকে নিয়ে হয়েছে চন্দ্রবংশ, সূর্য্য থেকে সূর্য্যবংশ। আকাশের চন্দ্র সূর্য্য যেন মাটিতে আছড়ে পড়লো।

সৃষ্টির অনেক পরে বৈবস্বত মনু। তিনিই প্রথম এলেন ভারতে—নতুন বংশ স্থাপন করলেন। কিন্তু পিতামহ তাঁর নিজের ছেলেকে আদর করে গ্রহ-সূর্য্যের নামে নাম দিয়ে ছিলেন বিবস্বান। তিনি বিবস্বানের ছেলে—বৈবস্বত। বিবস্বান সূর্য্যেরই এক নাম—তাই বিবস্বানের বংশ হয়ে গেল সূর্য্যবংশ। ধর, আশুতোষের ছেলে শ্যামা প্রসাদ,—সে কি কৈলাসপতির বংশধর, না তাঁর বাড়ী ঐ কৈলাসে?

চন্দ্রের বেলায়ও তাই। হিমালয়ের এক প্রদেশে এক শৈব রাজা ছিলেন—নাম তাঁর অত্রি। হঠাৎ তিনি তপস্যায় রত হলেন। রাজার তখনও কিন্তু রজোগুণ যায়নি। সেই পার্ব্বত্য ভূখণ্ডেই এসে নামলেন এক কানন-চারিণী অপ্সরা। দুর্ব্বলচিত্ত রাজা তপস্যার আসনে বসেই কামাহত হলেন—বীর্য্য স্খলিত হল। হ'ল অপ্সরার গর্ভ। তাতেই হ'ল চন্দ্রের উৎপত্তি।

চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে—এই বাস্তব ঘটনা আর পুরাণের উক্ত কল্পনা মিলে কাশীখণ্ডের পাতায় অন্য গল্পের রূপ নিল।

ব্রহ্মার-মানস পুত্র অত্রি। তপস্যার আসনে ত‍াঁর কামনার বশে রেতঃস্খলিত হয়েও ঊর্দ্ধগামী হয়ে চোখ থেকে নির্গত হ'ল।

ব্রহ্মার মানসপুত্রের বীর্য্য। বিধাতা দশটি দেবীকে (দশদিক) তা' ধারণ করতে বল্লেন। ত‍াঁরা পারলেন না। তখন সে বীর্য্য সোম রূপে পড়লো পৃথিবীর বুকে। ব্রহ্মা পিতামহ সেই সোমরূপ চন্দ্রকে রথে বসিয়ে পৃথিবী ঘোরালেন।

গল্পের সঞ্চিত-বীর্য্যে সন্তান-উৎপত্তিও তো আজকাল অবিশ্বাস্য নয়। দ্রোণ প্রভৃতির জন্মের সে সব কথা শুনে অনেকে হাসতো—শ্লেষ মিশ্রিত সে হাস্য। আর এখনও হাসে—তবে কৌতূহল-বিস্ময়ে মৃদুহাস্য। আজ বিজ্ঞানের মতে আধুনিকের দল এসব মানতে বাধ্য হয়েছে। যাক্—সেই বীর্য্যে পৃথিবীর বুকেই চন্দ্র আসুক আর অপ্সরার গর্ভেই চন্দ্র আসুক কবি একই গল্পে সৌরজগত আর পরবর্ত্তী ইতিহাসকে জড়িয়ে ফেল্লেন।

শুধু কি এই। এবার ঐ গ্রহ আর গ্রহের গতি নিয়ে যে বিরাট গল্প লেখা হয়েছে পুরাণে—সে হ'ল সমুদ্র-মন্থনের গল্প।

সমুদ্র-মন্থন

স্বর্গের সে কাহিনী হচ্ছে—একদিন দেবতারা স্থির করলেন অমৃত লাভ করে তাঁরা মৃত্যুকে এড়াবেন। মরণে দেবতাদেরও বুঝি বড় ভয়!

অ-মৃতের উপায় করে দিলেন বিষ্ণু, বল্লেন—সাগরে আছে অনেক ওষধি, সম্পদ ও রত্ন—রত্নাকর সে। মন্থন কর—অমৃত পাবেই।

হয়তো বিষ্ণু বলেছিলেন কর্ম্মসাগর মন্থন করলে যে সিদ্ধির অমৃত লাভ হয়,—"অমৃতস্য পুত্রাঃ"—দেবতার তাতেই হবেন অমর।

পুরাণ-কার গল্প ধরলেন—সব দেবতা মিলে করলেন সমুদ্রমন্থন। অসুরদের সাহায্যে মন্দার পর্ব্বতকে নিয়ে এসে করলেন মন্থন দণ্ড।

ভীষণ পাহাড়—দেহ ভারি, পৃথ্বীর বুকে—সমুদ্রের গর্ভে তা সইবে কেন? কূর্ম্ম অবতার বসলেন সাগরতলে। তার শক্ত পীঠে চাপান হল মন্দার পর্ব্বত। এখন এ পর্ব্বত টানে কে—বাঁধবে কি দিয়ে? এলেন অনন্ত নাগ বাসুকী—তাঁর দীর্ঘ দেহ নিয়ে। মুখ দিয়ে ঝরছে গরল—চালাক দেবতা তাই বিষ-নিঃশ্বাসের দিকটায় রাখলেন অসুরের দলকে—নিজেরা ধরলেন ল্যাজ। চল্ল মন্থন।

শঙ্খ-ঝিনুক-কীট যা ওঠে তা মধু বা জলের ঘূর্ণীতে পড়ে সব মারা যায়। মরে শঙ্খাসুর, কৈটভ সব—পচে তার মেদ—পচে ওষধি আর লতাগুল্ম। পচে, আবার পড়ে ঐ সাগরের গর্ভে। আবার চলে মন্থন—ফলে নীল সমুদ্র হয়ে উঠল ক্ষীর সমুদ্র!

ক্ষীর থেকে হল ঘৃত। তারপর উঠলেন চন্দ্র, উঠলেন লক্ষ্মী, সুরাদেবী, উচ্চৈঃশ্রবা, অশ্ব, কৌস্তুভমণি, অমৃত, সুরভিগাভী, দেববৈদ্য ধন্বন্তরী, ঐরাবত হস্তী আর অপ্সরা। এক এক দেবতা এক একটি ভাল জিনিষ নেন—অসুররা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

তখন দেবতারা বল্লেন "অমৃত সব আছে, ও থেকে তোমরাও নিও।" কিন্তু ইন্দ্র রাজী নন, বিষ্ণুকে ধরলেন—ওরা অমৃত পেলে মৃত্যুকে এড়াবে, তারপর সুরু হবে অনাচা, আসবে অশান্তি। বিষ্ণু দেখলেন সত্য। চট্ করে এক নারী মূর্ত্তি ধারণ করে অমৃত পাত্র নিয়ে পরিবেশন সুরু করলেন। দেবতাদের দিতে দিতে অসুরদের পংক্তিতে পৌছয় না। তারই মধ্যে রাহু আর কেতু কোন ফাঁকে খানিকটা

অমৃত নিয়ে খেতে খেতেই সুদর্শন তাদের গলা দিল কেটে—পেটে গেল না অমৃত, অসুরেরা পেলনা অমৃত হ'ল না অ-মৃত।

এই অনাচার, এই বঞ্চনা, এই অপমানে অসুরেরা হয়ে উঠল মরিয়া। সূর্য্য আর চন্দ্রকে দেখলেই এরা তাড়া করে—মাঝে মাঝে গিলেও ফেলে। কিন্তু কাটা মুণ্ড—পেট ত আর নেই—বেরিয়ে পড়ে, সূর্য্য চন্দ্র। রাহু যখন গ্রাস করে সূর্য্য চন্দ্রকে, তখনই হয় গ্রহণ।

তখন থেকে যে কোন দেবতাকে যে কোন অসুর দেখতে পায় সুরু করে লাঞ্ছনা—এমনই করতে করতেই বড় বড় যুদ্ধ হয়, সুরু হয় বৃত্রাসুর আর অন্য সব অসুরদের অত্যাচার। এখন এ গল্প হল পুরাণের—ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণের। কিন্তু বেদে ?

সোমরস

বেদে আছে অসুর-অত্যাচারে-ভীত দেবকুল শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য "পঞ্চ" মিলে করলেন যজ্ঞ। যজ্ঞের আগুন ও ব্রতের নিয়ম পালনের জন্য চাই উদ্দীপনা ও শক্তি—চাই সোমরস, তাই দেবতারা "সোমরস" তৈরী করতে আয়োজন করলেন সুরদের জন্য। সে সুরা পান করে তারা অসুরদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তাই এই উত্তেজক জিনিষের প্রয়োজন।

"যমী গর্ভমৃতাবৃধো দৃশে চারুমজীজনৎ,
"কবিং মংহিষ্টমধ্বরে পুরুস্পৃহঃ" ॥

"যজ্ঞের সময় যজ্ঞানুষ্ঠানকারীগণ অতি সুদৃশ্য অতি পূজ্য বহুজন কমনীয় সোমরস উৎপাদন করিলেন। (ঋক ৯।১০২।৬)।"

সোমরস তৈরীর নিয়ম—সোমলতা পাথরে রেখে পাথর দিয়ে বেঁটে সেই সোমরসে কাঁচা দুধ এবং দধি মিশিয়ে কলসীতে রাখতে হবে। রাখার আগে কুশ নির্ম্মিত ছাঁকনিতে ছেঁকে কলসীর মুখে মেষ লোমের ঢাকনি রেখে ঢালতে হবে ঐ রস কলসীর মধ্যে। এই কলসীকেই তাঁরা বলেন সমুদ্র, তখন বংশদণ্ডে মন্থন সুরু হয়, নিঃসৃত হয় অমৃত, যেমন করে দুধ থেকে তোলা হয় মাখন।

এখন এই কলসী হ'ল সমুদ্র, মন্থনদণ্ড হ'ল মন্দার পর্বত, রজ্জু হ'ল বাসুকী, জ্যোতির্ম্ময় রূপ হল চন্দ্র, তাই খেয়ে সৌভাগ্য ফিরবে এই আশাকেই বলা হয় লক্ষ্মীর উদয়—মত্ততা আসবে তাই হল

সুরাদেবী,—খেলে আসবে দেহে বেগ তাই উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া, আসবে শক্তি তাই ঐরাবত, বলাধান ঔষধের কাজ করবে এই সোমরস তাই ধন্বন্তরী—আর সোমরসের কৃপায় পাবে রত্ন, গাভী, অপ্সরা—সব সুখ, সব আনন্দ। এই সুরা বা সোমরস তৈরীই হয়তো পুরাণে গিয়ে হয়েছে সমুদ্র-মন্থনের গল্প। কে বলবে কোনটা সত্যি। সোমরস তৈরী করে যে হাতী, ঘোড়া, রত্ন সৃষ্টির জন্য আর্য্যরা ঐ সোমরসের কাছেই প্রার্থনা করেছিলেন, তার প্রমাণ ঐ বেদেই আছে—

"গোবিৎপবস্ব বসুবিদ্ধিরণ্যবিদ্রেতোধা ইন্দো ভুবনেষর্পিতঃ"

"ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া ঝরিয়া পড়গো হে সোমলতা
অশ্ব ও গাভী স্বর্ণ বিলাও হে সোমরস—
ত্রিভুবনে তুমি জনক হও, হওগো পিতা"।

শ্রদ্ধাভরা এই পুরাণ কাহিনী নিয়েই আজও লোক ভাগলপুরের কাছে মন্দার পর্ব্বতগাত্রে বাসুকীর দাগ দেখায়।

তবে একটা কথা সমুদ্র-মন্থন গল্পের মূল আর যজ্ঞে সোমরস তৈরীর উদ্দেশ্য এক—ঐ অসুর নিধন। অসুরদের অত্যাচার থামাতে দেবতারা সত্য মিথ্যা সব আশ্রয় নিলেন—তবু প্রবল শক্তি তাঁদের, কেউ এঁটে উঠতে পারলেন না। তারপরই সব দেবাসুর যুদ্ধ।

এই সমুদ্র-মন্থনে আবার প্রকৃতি-বর্ণনার এক অপরূপ তথ্যের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। মহাকালের মহালীলা তা'।

কাল-সমুদ্রতো সৃষ্টি-প্রলয়ে মথিত হচ্ছেই। তার মধ্য থেকে প্রথম উদয় দেখি চন্দ্র ও সূর্য্য।

মন্থনের পূর্ব্বে দেবতা বিষ্ণু যেন কূর্ম্ম পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন আর ঐ সূর্য্য-রশ্মি যেন অশ্ব। ইন্দ্রধনু অর্থে পাই ঐরাবত, জগতে শোভা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়। তাই হয় দিক প্রকাশ। পশ্চিমদিকের এক নাম বারুণী। সমুদ্রের রত্ন ঐ চন্দ্র, সামুদ্রিক উদ্ভিদ ঐ মহৌষধি। সৃষ্টির এই বিকাশ-পরিপূর্ণতাই সমুদ্র-মন্থন। এরপর মানব—তাঁরই রূপ-প্রকাশ ঐ ধন্বন্তরী, অমৃত তার হাতে তাই তাঁরা অমৃতের পুত্র, কিন্তু পুনঃ মন্থনের ফলেই মানুষের সংসারে হল কালকূট। সংহার মূর্ত্তি ছাড়া তার গতি কোথায়?

এ রহস্য যদি সমুদ্র মন্থনের পৌরাণিক কাহিনীর অপূর্ব্বতায় অতুলনীয় হয়ে থাকে—সেকি উপহাস্য ?

রাহু, গ্রহ ও গ্রহণ

গ্রহদের কথা আছে বেদে—কিন্তু রাহু কেতুর গল্প নেই বেদের পাতায়। রাহু কেতুর পরিচয়েই হয়তো 'স্বর্ভানু' শব্দটি বেদে এসেছে। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে আছে—

যত্ত্বা সূর্য স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অক্ষেত্রবিদ্যথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ॥

"হে সূর্য্য যখন স্বর্ভানু মানে চন্দ্র তোমাকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে, তখন তাহা বুঝিতে অক্ষম ব্যক্তির ন্যায় নিখিল ভুবন মুগ্ধ লক্ষিত হয়"।

হয়ই তো—সূর্য্য আর পৃথিবীর মাঝে এসে চন্দ্র যখন আড়াল করে—হয় গ্রহণ—লোক তো তখন মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হয়ই।

আর তাই রহ ধাতু অর্থে ত্যাগ নিয়েই ঐ রাহু। ত্যাগ আর গ্রহণ নিয়েই পুরাণে হল রাহুর গল্প—আর বেদের সূক্তের উক্ত "অসুর" শব্দটায় গ্রহণকাল হ'ল অপবিত্র।

পুরাণের গল্প রচিত হয়েছে পরে কিন্তু বেদের কথায় ঐ সূর্য্য-ঢাকা চন্দ্রের ছায়াই যে পৃথিবীর কাছে গ্রহণ আনে এই কথাই তো বলছে বর্ত্তমান বিজ্ঞান। নতুন কিছু বলেনি।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকেরা বলেন ঘোরার পথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে সূর্য্য চন্দ্র আর পৃথিবী যেমনই একই সারিতে এসে পড়ে—সূর্য্য পড়ে একটু আড়ালে, পৃথিবীর লোক আমরা চন্দ্রকে দেখি অন্ধকার—কারণ চন্দ্রের নিজের যে আলোই নেই—ফলে হয় অমাবস্যা।

চন্দ্র যেমনই একটু এদিক ওদিক হয় অমনি হয় অর্দ্ধ গ্রহণ—ঘোরার পথে সূর্য্য ঢাকা পড়লেই বলি সূর্য্য গ্রহণ। ঘুরতে ঘুরতে আবার চন্দ্র আর সূর্য্যের মাঝে যখন যায় পৃথিবী—হয় পূর্ণিমা—কিন্তু যখন পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে সূর্য্যের আলোয় পৃথিবী নিজেই নিজের ছায়া দেখে চন্দ্রে—হয় চন্দ্র গ্রহণ।

এখন কি বলবো, আগে বৈদিক যুগে মুনি ঋষিরা এসব জানতেন না—গ্রহণের আসল কারণ প্রাচীন ভারতের জানা ছিলনা ?

জানা তো ছিলই, বুঝি প্রমাণও করেছেন হাতে হাতে অতি প্রাচীন যুগের অথর্ব্বা, দীর্ঘতমা, বৃহস্পতি, শুনঃসেফ—আর প্রাচীন ভাস্করাচার্য্য বরাহ মিহির, আর্যভট্ট। তাই হয়েছে সেযুগেই সৌরকেন্দ্রিক ভৌমকেন্দ্রিক প্রভৃতি নানারূপে জ্যোতিষের বিচার।

তা ছাড়া পুরাণে প্রথম যে গল্প ছিল এক, পরে হয়েছে অনেকটা বিকৃত। অনেকে বলেন ১৯০২ খৃঃ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন পৌরাণিক যুগ আর ৭।৮ খৃষ্ট শতাব্দীতে সেই পুরাণই হয়েছে বিকৃত—নাম হয়েছে পৌরাণিক যুগ বিকৃত।

তবে এসব সৃষ্টি, সৌরজগত বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা আজ জানা যায় আধুনিক এষ্ট্রনমি, এষ্ট্রলজীতে, জানা যায় আমাদের অতি প্রাচীন বেদের মন্ত্রে বা পুরাণের গল্পে, আর আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, বরাহ মিহিরের খাতার পাতায়।

সৃষ্টি পর্ব্বের এই তত্ত্বকথা আমরা যতই বলি—পরমজ্ঞানে সকলকে মেনে নিতেই হয়েছে যে—সব জ্ঞান বিজ্ঞানের অতীত একজন। তাঁরই ইচ্ছামত চলছে এই সৃষ্টি পর্ব্ব—তাঁরই ইঙ্গিতে কীট থেকে মানুষ। মহাশূন্য ঐ আকাশ থেকে ধরণীর এই মাটি।

পঞ্চগুণ ও পঞ্চ দেবতা

বিজ্ঞানের সে বিচার বলেছে—পার্থিব প্রতি সৃষ্টি মধ্যে পাই আমরা শব্দ, বায়ু, রূপ, রস আর গন্ধ। যখন শুধু শব্দ আছে, নেই বায়ু, নেই রূপ, রস আর গন্ধ—তখন হ'ল শূন্য—এই আকাশ। এই আকাশেরই এক নাম কশ্যপ। কশ্যপ থেকে সৃষ্টি সুরু। আকাশে যে বাজের শব্দ হয় তা দেখা যায় না। মেঘের শব্দ ছোঁয়া যায় না, না আছে তার রূপ, না আছে রস, না গন্ধ, তাই প্রথম সৃষ্টি আকাশ। পুরাণ ইঙ্গিত করলেন আকাশ স্বর্গ।

আকাশে এল স্পর্শ—হল বায়ু। স্পর্শ করে বায়ু প্রতি দেহ, প্রতি পদার্থ—পাতা, ফুল, জল, স্থল। তা হলে বায়ুতে আছে শব্দ আছে স্পর্শ। পুরাণে 'বায়ু" এক দেবতা।

তার সঙ্গে যোগ হল রূপ। তৈরী হল তেজ। তেজে শব্দ আছে স্পর্শ আছে আর রূপ আছে নাম হল অগ্নি—পুরাণে দেবতা হলেন।

এরপর যোগ হল রস উৎপত্তি হল জল। জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস সব আছে। নাম হল বরুণ। পুরাণ দেবতা বলে বরণ করলেন।

আর এই চারের সঙ্গে যোগ দিল গন্ধ, সৃষ্টি হল মাটি—তাতে আছে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস আর গন্ধ। নাম হল ক্ষিতি—পুরাণ নাম দিলেন পৃথিবী—ভূলোক। সমস্ত জীব বরণ করে নিল দেবী বলে, জননী জন্মভূমি বলে।

ত্রিগুণ, ত্রিলোক ও ত্রিদেব

মাটি যেমন পেল পাঁচটি গুণ—মাটির মায়ের ছেলেরা আবার তেমনই পেল ত্রিগুণ—বায়ু, পিত্ত, কফ কিংবা সত্ত্ব, রজ, তম। প্রথম তিনটিতে তৈরী স্বাস্থ্য, শেষের তিনটিতে তৈরী হয় প্রভাব—প্রবৃত্তি।

এখন এই বিজ্ঞানের কথার মূলে জ্ঞানের কথা—আবার তা বোঝাতে পুরাণ—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, ব্যোম, এই পঞ্চভূত. সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিগুণ এবং শব্দ, রস, স্পর্শ, রূপ গন্ধ এই পঞ্চতন্ত্রে পৃথ্বী ও পার্থিব জীব নিয়ে গাঁথলেন গল্প।

মানুষ ত্রিগুণের প্রভাব পেলেও—সত্ত্ব গুণে যিনি পূর্ণ তিনি এগোলেন মৃত্যুহীন অমরার দিকে, রজোগুণে যারা মাতলো—তারা পড়লো পঞ্চভূতে—এই মৃত্যু-শীল মাটির ধরণীতে, আর যারা তমোতে মাতলো তারা চলে গেল তার চেয়েও দূরে—বুঝি জাহান্নমে। মনে হয় সত্ত্বগুণে ব্রহ্মালোক—রজোগুণের যখন আধিক্য তখনই ছিল স্বর্গ। তমোর আধিক্যে গড়ে উঠল ভূলোক।

এখন পুরাণকার গল্প করলেন পরম পুরুষ এক সৃষ্টি কর্তা—সৃষ্টি করলেন ত্রিগুণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গুণ তাদের রজ, সত্ত্ব ও তম। কার্য্য তাঁদের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়।

পুরাণ বল্লেন—আকাশের এক নাম কশ্যপ। যখন রজো গুণ বিশিষ্ট হয়ে স্ত্রী অর্থাৎ কাশ্যপী সেই দিতি, অদিতি ও দনুর সঙ্গে মিলিত হলেন—তৈরী হ'ল সংসার।

এই কশ্যপ আর কশ্যপী—আকাশ আর মাটী, স্বর্গ ও পৃথিবী দিয়েই আমাদের সৃষ্টি, আর তাই ঋগ্বেদ বলে গেলেন—

"ইদং দ্যাবাপৃথিবী সত্যমস্তু পিতর্মাতর্যদিহোপব্রুবাম"

"হে পিতা স্বর্গ, হে মাতা পৃথিবী যজ্ঞে যে করি প্রার্থনা
সত্যই তাহা সফল হোক।"

এ প্রার্থনা সৃষ্টির ও স্থিতির, স্বর্গ ও পৃথিবীর ॥

সৃষ্টিতত্ত্বের এরকম সব দুর্ব্বোধ্য লীলা নিয়ে পুরাণ সরল কাহিনী আঁকলো। প্রথম গল্পটিই অপূর্ব্ব !

মহাপ্রলয়ের পর যখন চারিদিকে জল আর জল—মাটির চিহ্নই নেই তখন জাগলেন নারায়ণ।

জলের এক নাম হচ্ছে 'নারা'। সেই নারায় অয়ণ মানে থাকার জায়গা করে নিলেন নারায়ণ। সাপের হ'ল বিছানা। সে অন্তহীন অজগরের অনন্ত শয্যায় শুলেন নারায়ণ, পরম পুরুষ ভগবান যিনি—সব তর্ক-বিচারের অতীত, ভক্তিতে যিনি ধরা দেন, সেই নারায়ণ। পায়ের তলায় তাঁর লক্ষ্মী—সংসারের ভাগ্যদেবী।

নারায়ণের নাভি কমল থেকে উঠলো এক কমলবৃন্ত। বৃন্তের মাথায় একটি ফোটা পদ্ম। অপরূপ পদ্ম। তারই উপরে আসন বিছিয়ে জেগে উঠলেন পদ্ম-যোনি, স্বয়ং—ব্রহ্মা। অতিমন যুক্ত—মানে সব জানেন তিনি—তাই তিনি ব্রহ্মা, স্বয়ং হলেন তাই স্বয়ম্ভূ, পদ্মে জন্ম তাই নাম পদ্মযোনি। এতদিনে পৃথিবীতে প্রথম সৃষ্টি-কর্ত্তা এনে দিলেন ভগবান। ব্রহ্মা থেকেই সৃষ্টি হ'ল আরম্ভ।

আদি জনক জননী

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উদয় হ'ল। সুন্দর সে চেহারা,—শ্বেতবর্ণ, প্রশান্ত বদন, ভগবানের দান। অপরূপ সৃষ্টি, সব শাস্ত্র, সব ধর্ম্ম তাঁর মুখে। আজকাল যাকে বলি আমরা চার বেদ, সবই তিনি বলতেন। উপদেশ দিতেন সেই চার বেদের কথা। দৃষ্টিও তাঁর চারদিকে, নইলে সৃষ্টি করবেন কি করে! নিজে হয়েছেন তাই তিনি স্বয়ম্ভূ— আগুনের মত লাল তাঁর তেজ, সবাই ভাবলেন তিনি রক্তবর্ণ, চারদিকে তাঁর দৃষ্টি—সব বিষয় চতুর্দ্দিকে তাঁর জ্ঞানে তাই তাঁর উপাধি হ'ল চতুর্ম্মুখ। তাঁর আবির্ভাবই হ'ল সৃষ্টির জন্য। তিনি ভাবলেন সৃষ্টি করতে হবে। ইচ্ছা হ'ল তাঁর—

"একোঽহং বহু স্যাং প্রজায়েয়"—"এক আমি বহু হব।"

কিন্তু সৃষ্টি করবেন কি করে? একা তিনি,—সন্তান হবার চাই বাপ, চাই তার মা। মা না হ'লে কে তাকে পেটে ধরবে, কে তাকে স্তন্য-দুগ্ধে মানুষ করবে। তা ছাড়া আরও এক ভাবনা—ব্রহ্মার নিজের আসন পদ্ম বলে—সবাই কি আর থাকবে সেই পদ্মে? মানুষ হ'লেই তার চাই ঠাঁই বা আধার, তাই চাই তার মাটী।

মেদিনী

ব্রহ্মার সন্তানদের ধারণ করতে সর্ব্বাগ্রে তৈরী হ'ল ধরণী—মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা। মাটিই বটে তবে মেদ মানে চর্ব্বি দিয়ে তৈরী সে মাটি নাম হল মেদিনী। চর্ব্বি জমেই হয়তো হ'ল মাটি। সব জিনিষেরই শেষ পরিণার মাটি।

কিন্তু সে মেদ কার? কি করে মেদে হ'ল মেদিনী? প্রথম তো আর মানুষ হয়নি—আর বড় বড় পশুও হয়নি। প্রথম হয়েছিল জলে পোকা। জল আর জলই তো তখন সার। স্থল তো উঠলো মেদিনী হবার পরে। তাই সবার আগে জলে জন্মালো পোকা বা কীট। সেই কীট ধ্বংস করা হ'ল মেদিনীর জন্য।

জলকীট নিয়েই দুনিয়ায় এল প্রথম উৎপাত। তারা দেখলে—জলে তো বেশ ছিলাম সারা-ভুবনে জল, তাদের বসবাস, এমন সময় আবার নতুন সৃষ্টির আয়োজনই কেন? চটলো তারা। তাদের মধ্যে ছিল দুই ভাই—দুই-ই মহা শক্তিধর মধু মানে জল, কীটরূপ দৈত্য হল কৈটভ। তাই তাদের নাম মধু কৈটভ, আর তাদের নিয়েই প্রথম উৎপাত।

জলে মধু কৈটভ উঠলো গর্জ্জে। ভগবান বুঝলেন এই সুযোগ—অনন্তশয্যা ছেড়ে ভগবান বিষ্ণু ওদের যুদ্ধে বধ করলেন। ওরা মরলো—মরলো ওদের সঙ্গে লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে সব জলকীট।

কিন্তু তারা মরে যাবে কোথায়? রইলো ঐ জলে, ক্রমে ওরা পচে উঠে জলে ভেসে উঠলো—আর জলে ভেসে জলজমা বরফের পাশে পাশে তাদের চর্ব্বি সব জমা হ'ল; এমনই করে জমা হ'তে হ'তে স্তূপীকৃত বরফ আর মেদের উপর তৈরী হল নতুন মেদিনী—মৃত্তিকা—ধরণী। এ মেদিনী শুধু ভারতবর্ষ নয়—সারা ভুবন,—এই ত্রিলোক।

কালিকা পুরাণেও এই জল অর্থে মধু নাম দেখি, মধু-অসুরের বধে—

> "তৎকর্ণ-মল-চূর্ণেভ্যো মধুনামাসুরোঽভবৎ
> উৎপন্নাসবপানার্থং যস্মাৎ মৃগিতবান মধু
> অতস্তস্য মহাদেবী মধু নামাকরোত্তদা"

কর্ণ মলে এ মধু তৈরী—এর মধ্যেও দেখি সৃষ্টির লীলা। ময়লায় যে কীট জাতীয় জীব তাঁরই বিনাশ রহস্য।

মনুসংহিতায় আমরা প্রথমেই পেয়েছি বিষ্ণু যে জলে ছিলেন, সে জল ছিল ৫০০০ বর্ষ। "পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি বাহু প্রহরণো বিভুঃ।" জল ছিল বলেই মধু-কৈটভের যুদ্ধ হয় ৫০০০ বৎসর।

সে জল শুকিয়ে গিয়ে কীট পতঙ্গ সব নষ্ট হল তারপর ঐ দেবাসুর যুদ্ধ ব্রহ্মবর্ষের শতবৎসর সে যুদ্ধ। মানুষের হ'ল পূর্ণ ৩৬৫০০ বসর! তারপর পরিপূর্ণ মানব!

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক H. G. Wells বলেছেন "৫০।৬০ হাজার বছর আগে......পৃথিবীতে প্রায় মানুষের মতন এক জীব ছিল।"

হয়তো তারাই মধুকৈটভ আর মহিষাসুরের জাত!

দেবী পূজায় চণ্ডীপাঠ হয়। মহাশক্তি কেমন করে মহিষাসুরকে বধ করলেন—চণ্ডী তারই ইতিহাস। মার্কণ্ডেয় পুরাণের গল্প। কত সুন্দর তার বর্ণনা। মধুকৈটভ বা মহিষাসুর সবই আজ সেই অর্দ্ধ-মানবের প্রতীক—তারপর পূর্ণ মানবের উদয়। মহিষাসুর বধে লাগলো ৩৬৫০০ বছর আর মানুষ হয়েছে তাও আজ থেকে যে ৯০২০ বছর আগে তা আগেই আমরা দেখলাম। অতএব ঠিক মানুষ নয়—প্রায় মানুষ এমন এক জীব ছিল ৩৬৫০০+৯০২০ বছর অর্থাৎ ৪৫৫২০ বছর আগে।

চণ্ডীলীলায় এই দীর্ঘ সময়ের সে যুদ্ধে দেখি উদগ্র, চিক্ষুর, চামর, বিড়ালাক্ষ ও মহাহনু তারপর মহিষাসুর বধ।

বর্ত্তমান জীবতত্ত্বেও অতি প্রাচীনকালে জল আর স্থল-চারী বরাহ বা গণ্ডারাকৃতি এক বিশিষ্ট জন্তু ছিল। যার সামনে খড়্গের মতন শিং বা দাঁত উদ্যত বা উদগ্র—অথবা ক্ষুর-যুক্ত, তারপর চামরী গাই বা চামরযুক্ত ল্যাজবিশিষ্ট গো-জাতীয় জন্তু, তারপর বিড়ালাক্ষ অর্থে—বিড়ালের মতন চক্ষু—হয়তো বাঘ নয় সিংহ। তারপর মহাহনু অর্থাৎ বনমানুষ দেখা দিল। সৃষ্টির সুন্দরতম রূপ বিকাশের জন্য, পৃথিবীর শান্তির জন্য দেবী সে যুদ্ধে দৈত্য-প্রায় অর্দ্ধ-মানবদের নিহত করলেন।

সৃষ্টিতত্ত্বেও বর্ত্তমান বিজ্ঞান প্রায় সেই কথা বলেছে—দৈত্যের মেদে মেদিনী সৃষ্টি বলেনি বটে, তবে জ্বলন্ত অগ্নি-পিণ্ডেরই মতন তরল এক পদার্থ—আর তারই তেজে, উপরের জল হচ্ছে উত্তপ্ত, হচ্ছে বাস্প গ্যাস—আর নীচে, অনেক নীচে গলিত প্রবাহের বন্যা। এই প্রবাহই হয়তো কল্পিত সাগর, আর ঐ গ্যাস প্রভৃতি বিষাক্ত দ্রব্যই অনন্ত নাগ। অনন্তে শায়িত বিষ্ণু এই রূপকেরই হয়তো প্রতীক কিন্তু সে উত্তাপ শান্ত হলেই তো হবে সৃষ্টির আধার।

অবতার বাদ

মধুকৈটভের পর কৈটভ বা কীট রইলনা বটে কিন্তু রইল মাছ কীটের রাজা, শুধু জলে থাকে।

অতএব "ঈশ্বর" প্রথম জীবে অবতার হ'লেন—**মৎস্য**

কিন্তু ব্রহ্মা যখন পেলেন সৃষ্টির মাটী, তখন মৎস্য অবতারের জাতভাইদের পীঠ শক্ত হল—হ'ল কূর্ম অবতার, স্থলেও উঠে। এদিকে শক্তমাটী তাকে দাঁত দিয়ে খোঁচাতে হবে, দন্তী-জীব চাই, যে জলে স্থলে থাকতে পারে একটু জায়গা পেলেই। পুরাণে যে বরাহ অবতার, তাঁর রোমগুচ্ছ ছিল পর্ব্বতশৃঙ্গের মতন কঠিন অর্থাৎ শুধু দন্তী নয় শৃঙ্গীও বটে অর্থাৎ দাঁত, শিংওয়ালা জীব হ'ল ধীরে ধীরে। তার মধ্যে **বরাহ** আগে, তাই অবতার। বরাহে তিনি বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।

এবার চল্ল ধীরে ধীরে নানা জীব ও জন্তুর উদ্ভব, মৎস্য পুরাণে আছে—নানা রকম মুখ, নানান আকৃতি তাদের। আজ বৈজ্ঞানিকগণ কতরকম অস্থি-পঞ্জরইত পাচ্ছেন এখানে সেখানে।

বরাহের পর হ'ল অর্দ্ধ মানুষ আর অর্দ্ধ পশুর মিশ্রিত এক জীব ফল ও পাতা খায়, বুকে হাঁটে না, হাঁটে পায়—আবার গাছেও চড়ে। তারাই হ'ল শিম্পঞ্জী হনুমান বানর আর **নরসিংহ**।

তারপর হ'ল মানুষ—স্বর্গ, মর্ত্ত্য আর পাতালে ছড়ালো—যে মানুষের চরণ পড়লো ত্রিলোকে—নিখিল সংসারের পরিমাণে চেহারাটা তাঁর "বামন", কিন্তু তিনটী পায়ে ত্রিলোক বিজয় করলেন। তখন ত্রিপদ চতুস্পদ হয়েছে। ত্রিবিক্রম **বামন** সেই পঞ্চমাবতার। সৃষ্টির এই দাপটে বুঝি ডারউইনের বানরের লেজ খসে "বা" বাদ গিয়ে রইল নর, বন-মানুষ হ'ল মানুষ।

তারপরই মানুষ কুঠার নিল, জঙ্গল কেটে, পথে হেঁটে, দৈত্য ছেঁটে, ত্রিসংসারে উগ্র যা তা নাশ করে, তিনি রাজ্য বসালেন—নূতন রাজ্য। এ অবতার **পরশুরাম**।

এদিকে প্রথম সৃষ্টি থেকে অষ্টম সৃষ্টি পর্য্যন্ত গ্রহ, উদ্ভিজ ও পশু-জগৎ তৈরী হল, নবম সৃষ্টি বা কৌমার যুগে প্রথম উদয় হলেন—মানব। আসল মানুষের সেই প্রথম রূপ!

আমরা এই যে পর পর জীবের জন্ম আলোচনা করলাম—একেই বলে অবতার-বাদ।

তারপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৎ মানুষ যাঁরা তাঁরাও পেয়েছেন এ সংসারে যুগেযুগে অবতাররূপে পূজা।

জয়দেব খুব রকমারী করে যে দশবতারের স্তবগীতি গেয়ে ছিলেন—পুরাণেও তার সাড়া পাওয়া যায়—

> 'যস্যা লীয়তে শরুসীস্পি জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং
> দ্রংষ্ট্রায়াং ধরণী, নখে দিতিসুতাধীশঃ, পদে রোদসী
> ক্রোধে ক্ষাত্রগণ, শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরো
> ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্ম্মিকফলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ।"

যাক এসব ঘটনাই ঘটলো পদ্মকল্পে—ব্রহ্মার পদ্মে জন্মান ও সৃষ্টির প্রারম্ভ পর্য্যন্ত।

প্রারম্ভেই ব্রহ্মা হলেন—নিখিল বিশ্বের, সারা সংসারের জনক।

জনক তো তিনি বটেই, জন্ম দেবার জন্যই তো তাঁর আবির্ভাব। কিন্তু জননী? জননী তো তাঁর চাই। তাই তার মনে কামনা হ'ল—মূর্ত্তি-মতী একটী নারী আর তাদেরই মিলনে একটী সন্তান। বৃহদারণ্যকে আছে—

> "বিরাট পুরুর মনে মনে চায়
> সঙ্গিনী তাঁরই পাশে নব-সৃষ্টির আশে—"

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

> "যে মতি চনক দ্বিদল শস্য—দুটী দলে এক দানা,
> তেমতি শাস্ত্রে জানা—
> একটি মিথুনে সৃষ্টি কর্ত্তা স্ত্রীপুরুষ রূপে ছিল,
> সৃষ্টির কালে পতি ও পত্নী দুই হ'য়ে দেখা দিল।"

গায়ত্রী

মিথুন হ'ল সৃষ্টি—নব ও নারী। প্রথম যে নারী হলেন তাঁরই নাম গায়ত্রী। গায়ত্রীকে ব্রহ্মা পত্নী করলেন। তাঁরই গর্ভে হ'ল স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার প্রথম সন্তান স্বায়ম্ভুব। গায়ত্রী হলেন বিশ্বের আদি জননী। ব্রহ্মাণী এই গায়ত্রীকে আমাদের দেশ নিত্য তিনবেলা স্মরণ করে ব'লে—"তোমার দীপ্তি সূর্য্য-তেজে ভূঃ, ভুব, স্বঃ এই ত্রিলোককে উদ্ভাসিত করুক। আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করুক।"

আজও সারা ভারত মনে করে—প্রথম যে 'মা' তাঁকে স্মরণ করা জীবনের পথে চরম আর পরম মঙ্গল।

কিন্তু গায়ত্রীকে যেমনই মানুষ মা মনে করলো, অমনি মনটায় একটা খোঁচা এল। ব্রহ্মার দেহ থেকে হলেন যিনি তিনিই হবেন ব্রহ্মার পত্নী। কেমন যেন লাগে! কেউ বলেন, 'না গো ব্রহ্মা নিজের তেজে মনের ইচ্ছায় মানস পুত্র তৈরী করলেন আর তাই স্বয়ম্ভূর ছেলে স্বায়ম্ভূবের নাম 'মনস্'। আর সেই মনস্ থেকে মানুষ বা মনুষ্য—আমরা মনুষ্য বা মানুষ। আদিম মানুষের গল্পটি বলতে যদি ঐ প্রথম গল্পটাই ধরা যায় আমাদের বেদে যা আছে, তাতেই বা গ্লানি কি? যখন মানুষ হ'ল না, সমাজ হ'ল না, তখন সৃষ্টিকর্ত্তা যদি নিজেকে দুভাগ করে, পুরুষ ও প্রকৃতি—স্বামী আর স্ত্রী তৈরী করে সৃষ্টি সুরু করেন, তাতে দোষ কি?

আদিম মানুষের এমনি সৃষ্টি প্রায় সারা জগৎ মেনে নিয়েছে।

আমাদের আদিম বলতে যে ঘটনা বাইবেলে তো সেই একই গল্প, আবেস্তায়ও প্রায় তাই, মুসলমানদেরও প্রায় এক। তাছাড়া মজা এই যে মনু কথাটার সঙ্গে দুনিয়ার প্রায় সব জায়গায় আদিম মানুষটার মিল আছে। ইজিপ্টের আদিম মানব মেনস, গ্রীসে মিনস্, লিজিয়ার মেনস্, ক্রিজিয়ার মনিস, জার্ম্মানীতে মেন্নুস, আদিম মানবের নাম এই ভাবে আদমী আদম প্রভৃতি। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে আছে—বাইবেলেও আছে ঐ এক কথা।

"দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ"॥—

"And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him an helpmate for him. And God caused a deep sleep to fall upon Adam—and he slept; and he took one of his ribs and closed up the flesh instead there of. And the rib which the Lord God had taken for man made be a woman and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh; She shall be called woman, because she was

taken out of man. And Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living."

মনে হয় না কি এ উক্তি একেবারে আমাদের বেদেরই অনুবাদ!

সুরু হ'ল সৃষ্টি। তারপর এক এক দল এক এক দিকে এক এক কারণে চলে গেলেন। নিয়ে গেলেন ঐ নামগুলোর ভাঙ্গা গড়া নাম। যেমন আদিম থেকে আদম। মনু থেকে মু।

কেউ কেউ বলেন ব্রহ্মা নিজ দেহ থেকে আদিম পুরুষ মানসকে আর গায়ত্রীকে তৈরী করলেন। স্বয়ম্ভুরই এক রূপ—স্বয়ম্ভূব আর গায়ত্রী। তাদের সন্তান হ'ল দ্বাদশটি। এগারটি ছেলে আর একটি মেয়ে। এদের মধ্যে ছোট ছেলের নাম স্বায়ম্ভুব। তিনিই হলেন তখনকার সমাজের প্রথম শাসক—রাজা বা নেতা। তার উপাধি হ'ল মনু। এই মনুই বিবাহ প্রথা তৈরী করলেন, সমাজ গড়লেন, রীতিনীতির প্রতিষ্ঠা করলেন। তা ছাড়া যজ্ঞ, উপাসনা, সাধনার নানা প্রথাও রচনা করলেন তিনি। তাই সারা ভুবন তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে নিজেদের পরিচয় দিলেন 'মানব' বলে। মনু থেকে তাদের প্রতিষ্ঠা—তাই তাঁরা হলেন মানব। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আর অন্য দুএক জায়গায় আবার ব্রহ্মা ও গায়ত্রী কথাটাকে অন্যভাবে বলা হয়েছে।

"এবং যুক্ত কৃতস্তস্য দৈবজ্ঞা বেক্ষতস্তদা
কস্য রূপমভূদদ্ধে ধায়ৎ কায়মভিচক্ষতে।"

ব্রহ্মা এই রকম চিন্তা করে, বিশ্বের কর্ম্ম সাধনের জন্য দৈবের প্রতি দৃষ্টি রেখে অর্থাৎ দেবতার করুণার কথা স্মরণ ক'রে তাঁর রূপকে দুভাগে বিভক্ত করে নিলেন। আর প্রতিটি পূর্ণ দেহের নাম রাখলেন "কায়" বা "কায়া"। 'ক' শব্দের মানে ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টি যা তাই "কায়া"।

এ ছাড়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ তো ব্রহ্মার সব সন্তানকেই 'অযোনি-সম্ভবা' অর্থাৎ মা-ছাড়া ছেলে তৈরী করেছে। তাঁরা নাকি কেউ কারও পেটে হয়নি। প্রথম মন থেকে হল চার ছেলে সনক, সনন্দ, সনাতক, ও সনৎ কুমার। তাঁরা ব্রহ্মার ছেলে, হয়েই

হলেন ব্রহ্মর্ষি, সাধনার জন্য চল্লেন বনে। ব্রহ্মা সংসারে উদাসীন ছেলেদের ত্যাগ ক'রে—রেগে সৃষ্টি করলেন এগারটী ছেলে। সে রাগ কি কম রাগ। তাই ছেলেও হলেন সব রুদ্র—মহান্‌, মহাত্মা, অতিশয়, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঋতুধ্বজ, ঊর্দ্ধকেশা, রুচি, শুচি, পিঙ্গলাক্ষ ও কালাগ্নি—এই একাদশ রুদ্র। কিন্তু রুদ্র দিয়ে সংসার চলে না—স্বয়ং শিব এদের বংশধরদের শুধু সাথী করে নিলেন—শ্মশানে আর মশানে।

আবার তখন ব্রহ্মার এক এক অঙ্গ থেকে এক এক ছেলে হ'ল। চোখ, মুখ, কান, সব থেকে গজালো ছেলে।

হয় তো এ সব রূপকের মূলে আছে অনেক বাস্তব ইতিকথা।

এমনই সব নানা মতের মধ্যে মোটামুটি হিসেবে পাওয়া যায় প্রথমে সৌরজগৎ হবার পর মাটির পত্তন হয়েছে। আর তার ৪৭৬:৬ বৎসর পরে ব্রহ্মার হল উদয়। তখন থেকেই সুরু হ'ল সত্যযুগ বা ব্রহ্মাব্দ। সৃষ্টির প্রথম দিনটি থেকে ব্রহ্মা চুপে চুপে সৃষ্টি করলেন এ বিশ্বের প্রজা বা সন্তান। তাই তার নাম প্রজাপতি। শাস্ত্রেই আছে—

"মহাকাল কালরূপে—
চুপে চুপে তবে নিঃশ্বাসে রচে
নূতন সৃষ্টি তাঁর,
প্রজাপতি রূপে কল্পে কল্পে
বিবিধ সৃষ্টি যাঁর।
কামনা হইল, তপ সাধনায় সৃষ্টি হইল সুরু,
মহাকাল ঐ মহাকাল রূপে হইল পরম গুরু ॥"

মানব বংশ প্রতিষ্ঠা

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ছেলে স্বয়ম্ভুব—মানবের আদি পুরুষ।

স্বয়ম্ভুবের এগারটি ছেলে— ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দশভব, অত্রি, বশিষ্ঠ আর ছোট ছেলে স্বায়ম্ভূব। মেয়ে তার চেয়েও ছোট—শতরূপা।

স্বায়ম্ভূব ও শতরূপা

স্বয়ম্ভুবের একমাত্র কন্যা শতরূপার কী রূপ! বিধাতা যেন প্রথম নারী তৈরী করতে বসে যে অঙ্গে যতটুকু মাংস আর রক্ত, মাটী আর রং দিতে হয় দিয়েছেন। আলুলায়িত কেশ, লীলায়িত তনু, চোখে কাল পাতা, অধর লাল, কপোলে অরুণিমা, বাহুতে লতার কম্পন, বক্ষে সুধা-ভাণ্ড। এমনই তার রূপ। এগারটি ভাই তাঁর। সবাই তো পুরুষ—সবাই যেন প্রথম নারী-রূপ দেখে একটু চঞ্চল। নূতন গড়া মেদিনীর বুকে কামনার যেন প্রথম সঞ্চার। কামিনী ছিল না এতদিন তাই কামনা ছিল অলক্ষ্যে। অতনু তখন কাম, রূপ নিল যেন প্রথম কন্যা শতরূপার দেহে। 'কন্যা' কথাটা সেদিন থেকে হ'ল। কন্ অর্থে প্রীতা—নারী যে বয়সে অন্যকে পারে 'প্রীত' করতে সেই বয়সের "কমনীয়া" নারীকেই বলে কন্যা।

বাল্য শৈশব কাটিয়ে শতরূপা যখন হ'ল কিশোরী, তখনও সেদিকে তেমন কেউ তাকায়নি। কিন্তু যখন এগিয়ে এল দেহে তার ষোড়শীর পদ-চিহ্ন—প্রথম দৃষ্টি পড়লো শতরূপার অঙ্গে শতরূপারই নিজের দৃষ্টি। কোন অঙ্গের ছায়া দেখে সে 'সীতা' নদীর জলে। কোন অঙ্গের রূপ দেখে সে নির্জনে, একমনে—দর্পণে।

শত রূপে শতরূপা যখন পূর্ণ যৌবনা তখন একদিন স্বায়ম্ভূব এল তার কাছে। গতরাত্রে পিতার আদেশ নিয়েছে সে, নিয়েছে সম্মতি সে সকল ভাইদের। যুবক সে, কর্ম্মচঞ্চল মন, পিতার তৈরী সেই সংসারকে সে বহুজনের সমাজ করতে চায়। মেদিনীর রূপ

দেখে জানে সে, এই বিশাল ভুবন তো আমাদের দ্বাদশের জন্য নয়। অফুরন্ত ভাণ্ডার এর, অসীম মাটী, এর ভোগের জন্য চাই অসংখ্য মানব, চাই বংশ বিস্তার—চাই সন্তান। তাই নির্জ্জন এক কুঞ্জ-ছায়া-তলে গোপন-চারিণী শতরূপার কাছে এসে সে দাঁড়াল!

পরামর্শ হয়েছে গতরাত্রে—সৃষ্টির পরামর্শ। সন্তান আনতে হবে মাটীর বুকে—পরামর্শ হয়েছে তাই শতরূপা ও স্বায়ম্ভুবের মিলনের। অন্য নারী নেই, নেই অন্য নর। শতরূপাও তা জানে।

“হইলা আনত শির দেবী শতরূপা…
একই রক্তে দেহ গড়া, একই পিতামাতা,
স্নায়ুতে স্নায়ুতে শোনে গোত্রের আহ্বান,
মহাপ্রাণ মনু ভাই, ভগ্নী শতরূপা—
তবুও বরিতে হবে স্বামী রূপে তারে?
ভ্রাতারে করিতে হবে শয্যা-সহচর?
বুঝিলেন মনু, ভগ্নী-অন্তর-বিপ্লব—
সঙ্কোচ, সমাজ-লজ্জা। তবু এ মিলন!
যৌবনের দ্বার-প্রান্তে তরুণ-তরুণী—
স্নেহ কণ্ঠে আহ্বানিলা স্বায়ম্ভুব মনু—
‘দেবী, শুধু সৃষ্টির কারণ—আমাদের
এই আচরণ। আজ বিশ্বে নাই অন্য নারী,
জননীর সে আসনে কাহারে বসাই?
সৃষ্টি কি হইবে রুদ্ধ? পিতার কামনা—
তাঁহার সৃজন-লীলা, অকালে বিফল হবে?
তাই এই অনাচার নহে অত্যাচার।
করিনু শপথ, এ মিলন অন্তে মোরা
সমাজে আনিব বিধি-বদ্ধ বিবাহানুষ্ঠান,
আমি নিজে সমাজের বিধান রচিব।
দেহে দেহে শিরায় শিরায়—
এক রক্ত যেথা ব’হে যায়—
এক গোত্র, এক বংশধারা—তারা কভু

হইবে না প্রেমের মিথুন।
শুধু এইবার, একবার, শেষবার দেবী,
সহ্য কর হেন অনাচার—সৃষ্টির লাগিয়া।
দেবী শতরূপা—লজ্জা-আনত-বদনা
ধীরে ধীরে চাহিলা নীরবে—সহোদর পানে।
নিমেষে ধাতার লীলা আনিল দোঁহার
নয়নে অসীম প্রেম, হৃদয়ে কামনা—

* * * *

মনু শতরূপা দোঁহে সৃজিল সন্তান,
মনুর সন্তান হল মাটীর মানব।

প্রথমেই শতরূপার গর্ভে স্বায়ম্ভুবের হল দুই ছেলে প্রিয়ব্রত আর উত্তানপাদ। আর মেয়ে হল তিনটী—আকুতি, প্রসূতি এবং দেবাহুতি। এবার আর মনু ভাই বোনে বিয়ে দিলেন না। তবে অন্য গোত্র আর বংশই বা পাবেন কোথায়? তাই খুড়ো, খুড়তুতো ভাই, কি সম্পর্কে ঠাকুরদা যাঁরা, তাঁদের সঙ্গেই চল্ল বিয়ে।

এমনই সব বিয়ে আমরা ঘটতে দেখলাম মনুরই সময়। প্রথমেই তিনি মেয়ে প্রসূতির বিয়ে দিলেন নিজের ভাই দক্ষের সঙ্গে। মেয়েরই অভাব তখন, তাই বোধহয় সবার কামনায় ঈশ্বর প্রসূতির গর্ভে দিলেন আটটি মেয়ে। এ মেয়েদের বাপ যে দক্ষ, তিনি সেই দক্ষ রাজা নন—যাঁর মেয়ে সতী। সে অনেক পরের কথা।

যাক্ এই আটটি মেয়ের নাম হ'ল খ্যাতি, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, ক্রিয়া অনুসূয়া, শান্তি আর অরুন্ধতি। মনু এ সব মেয়েদেরও বিয়ে দিলেন অন্য ভাইদের সঙ্গে। ভৃগুর সঙ্গে দিলেন খ্যাতির বিয়ে, সম্ভূতিকে দিলেন মরীচির হাতে, অঙ্গিরার সঙ্গে হ'ল স্মৃতির বিয়ে, প্রীতির সঙ্গে পুলস্ত্যের, ক্ষমার সঙ্গে পুলহ, ক্রিয়ার সঙ্গে ক্রতু। অত্রির হাতে দিলেন অনুসূয়াকে, শান্তিকে দিলেন অথর্ব্বের হাতে আর বশিষ্ঠের সঙ্গে বিয়ে দিলেন অরুন্ধতির।

এতগুলো দম্পতি তৈরী হ'ল—আর এঁদের সন্তান সন্ততিতে মানব বংশ বিস্তার হয়ে চল্‌লো।

আদি বাসস্থান

ব্রহ্মলোক

মানুষ হ'ল, হ'ল তার ঠাঁই মেদিনী—কিন্তু সবাই তো আর এক জায়গায় থাকতে পারে না। তাই যত লোক বাড়লো তত বাড়লো দেশ, নগর, শহর, গাঁ আর ভিটে।

মাত্র প্রসূতির আটটি মেয়ে আর স্বায়ম্ভুব মনুর ভাইদের দিয়েই বংশ বাড়লো—কিন্তু ছেলেদের কথা তো এখনও বলাই হয়নি।

স্বায়ম্ভুব আর শতরূপার ছেলে দুটি। প্রিয়ব্রত আর উত্তানপাদ। এই উত্তানপাদই ধ্রুবর বাবা। প্রিয়ব্রত বড় তাই—স্বায়ম্ভুবের পর রাজা হলেন তিনি। এর মধ্যে স্বয়ম্ভু মানে ব্রহ্মা, তাঁর বংশ ছড়াচ্ছে দেখে বুড়ো বয়সে চলে গেলেন ভরা সংসার ফেলে—অনেক দূরে অনেক উঁচুতে তাঁর সাধনার জন্য। নাম হলো সে জায়গাটির ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক। শুধু ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মারই বাস হ'ল না। যাঁরা সিদ্ধ, ব্রহ্মার গড়া সংসারে যাঁরা বড় সাধক, সাধনা করে মুক্ত হ'লেন যাঁরা, তাঁরাও যেতেন চলে ঐ ব্রহ্মলোকে।

ইলাবৃত্ত বর্ষ বা মেরু প্রদেশ

এদিকে ব্রহ্মার গড়া মেদিনীর যে দিকটায় প্রথম জন্মস্থান বসলো —সংসার বসলো, যজ্ঞ সুরু হ'ল, আগুন জ্বললো সেই জায়গাটার নাম দ্যৌ, দ্যুলোক, স্বর্লোক বা ইলাবৃতবর্ষ।

"অগ্নিঃ প্রথম ইলস্পদে সমিদ্ধঃ।"

"অগ্নি পৃথিব্যা নাভা ইলায়াস্পদে জাতঃ।"

"পৃথিবীর নাভি ইলাস্পদেই প্রথম অগ্নি জ্বলে।"

মানুষের প্রথম কৃতিত্ব—অগ্নি-সংস্থাপন—হ'ল এই ইলাবৃত বর্ষে।

'বর্ষ' মানে বৎসরও বটে আবার দেশও বটে। কে আজ দেখিয়ে দেবে, কোথায় সেই ইলাবৃত বর্ষ। কোনটা সেই স্বর্গ আর ব্রহ্মলোক। বেদে এ প্রশ্নও আছে—"পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ?"—কোথায় সেই নাভি? উত্তর হল—"অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।"

বেদের কথায় সেই নাভি—বা ইলাবৃতবর্ষটাই স্বর্গ বা দ্যৌক।

"দ্যৌ র্নঃ পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্ন মাতা পৃথিবী মহীয়ম্ ॥"

"এখানেই নাভি, দ্যৌ বা স্বর্গ, মোদের পিতৃ-ভূমি—
মহিমময়ী সে পৃথ্বী মোদের মাতা।"

স্বর্গ ও আদি স্বর্গ

আসলে ইলাবৃতবর্ষে তখন যাঁরা থাকতেন তাঁরা দেশটাকে পর্ব্বতের নামে না বলে স্বর্গ বলে ডাকতেন। স্বঃ, দ্যৌ, দিব আরও কত! আর যাঁরা ব্রহ্মলোকে গেলেন চলে তাঁরাও নামটার মোহ ভুললেন না—তাঁরা সেখানে একটা জায়গার নাম দিলেন স্বর্গ। আর ইলাবৃতবর্ষটাকে বল্লেন 'আদি স্বর্গ'। আদি স্বর্গের লোক করতেন রাজত্ব, সংসার, যুদ্ধ, মারামারি, নাচ-গান, উৎসব। আর যাঁরা সাধন, ভজন, তপস্যা করতেন তাঁরা যেতেন ঊর্দ্ধলোকের স্বর্গে। এসব কথার নজির পাই নানা গ্রন্থে।

প্রমাণ যতই থাক অতীত বিষয়ে সন্দেহ থাকেই জনসাধারণের,—শুক্ল যজুর্ব্বেদেও সে সন্দেহের কথা জানতে পারি।

"কে জানে কোথায় সে নাভি যেথায় মানুষ জন্ম নিল
কেবা ও স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ আখ্যা দিল,
কেবা জানে ঐ সুবিশাল জড়—সূর্য্য সৃজন কথা
কে জানে চন্দ্র কাঁহার সৃষ্টি—সৃজনের সে বারতা।"

তবু ঠিক তো করতেই হবে আমাদের দেশ কোথায়। আদিম সে মানুষটী কোথায় জন্মাল। আর কি করেই বা তাঁর বংশ ছড়ালো। তবে দেবতারা বা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষরা যাঁরা দেবত্ব পেয়েছিলেন তাঁরা এমন মেরুর দেশে নিশ্চয় থাকতেন না যেখানে ছয়মাস সূর্য্য ওঠে না—বরফে ঢাকা থাকে, মানুষ যেতেই পারে না। ব্রহ্মা বা সিদ্ধ সাধকরা হয় তো যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন, কিন্তু যাঁদের একটুতে রাগ, ঝগড়া, হিংসা, তখনও সর্ব্ব অঙ্গে লেগেছিল, তাঁরা কখনই সেখানে যাননি। তবে ব্রহ্মা, দেবরাজকে ত্রিলোক দান করে ব্রহ্মলোকে পালালেন ও ইন্দ্রাদি দেবতারা বরফ ঢাকা মেরুতে ছিলেন না রইলেন ইলাবৃত বর্ষে।

রামায়ণেও সুগ্রীব বানরদের সীতা অন্বেষণের জন্য বলছেন—সব জায়গায় যেও, শুধু উত্তর কুরু, যেখানে ব্রহ্মা আর ব্রহ্মর্ষিরা থাকেন সেই অসীম সূর্য্যোদয়হীন দেশে কখনও যেও না অথচ তাঁরা গন্ধমাদনে গিয়েছিলেন—মানে ইলাবৃতবর্ষে গিয়েছিলেন।

তার মানে আমাদের পূর্ব্বে ধ্রুব, ইন্দ্র, বরুণ, বৃহস্পতি সব ছিলেন ঐ স্বর্গে ইলাবৃতবর্ষে—তাদের বলি দেবতা। ইলাবৃতবর্ষকে বলি স্বর্গ।

প্রাচীন আর অতি প্রাচীন জিনিষটা জানতে যতই চেষ্টা হয়, ততই দেখা যায় তার মতও তেমনই অনেক।

অনেকে দেবতা আর স্বর্গ এমন করে মনে এঁকেছেন যে হেঁটে স্বর্গে যাওয়া যায়—এ যেন বিশ্বাসই হয় না। অথচ যুধিষ্ঠির গেলেন হেঁটে। সাবিত্রী গিয়েছিলেন যমের পিছনে সেই পথে। মহাভারতে পাণ্ডবদের দেশ-ভ্রমণ গল্পে বেশ বোঝা যায় একথা।

মহাভারতে আছে, একবার রাজা পাণ্ডু কুন্তী আর মাদ্রীকে নিয়ে গন্ধমাদনে বেড়াতে গেলেন, পাণ্ডুর রাজ্য তখন ভারতবর্ষে—হস্তিনাপুরে। সখ—যাবেন গন্ধমাদনে—দেখবেন স্বর্গ আর ব্রহ্মলোক।

এক অমাবস্যার রাত্রে সেই গন্ধ-মাদন পার্ব্বত্য পথে দেখলেন কয়েকজন ঋষি যেন কোথায় যাচ্ছেন। প্রশ্ন করলেন "কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?" ঋষিরা বল্লেন "যাচ্ছি আমরা ব্রহ্মলোকে—সম্প্রতি সেখানে একটি সমবায় সভা (conference) হবে—সব দেবতা, পিতৃলোকবাসী, মুনি ঋষিরা আসবেন। ব্রহ্মাকেও সেখানে দেখতে পাব—তাই যাচ্ছি"।

পাণ্ডুও সঙ্গ ধরলেন রাণীদের নিয়ে। ইচ্ছা একবার স্বর্গ আর ব্রহ্মলোকটা ঘুরে আসবেন। এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়!

তখন ঋষিরা বল্লেন,—"মহারাজ এ পথ অতি দুর্গম, এ পথে বার মাস শীত, পশু-পক্ষীও এ পথ দিয়ে যাতায়াত করে না। একমাত্র বায়ু আর বায়ুভূক সিদ্ধগণই যেতে পারেন। আপনার সঙ্গে রমণী, আপনি নিবৃত্ত হউন। ঋষিদের আদেশ পাণ্ডু অবহেলা করলেন না। দেশে ফিরে এলেন।

বেদ পুরাণের ব্যাখ্যা আমরা যে যেভাবেই করি. আর মহেঞ্জদড়ো বা হারপ্পা নিয়ে যত অতীতের কথাই বলি—প্রাচীন যুগের ইলাবৃত বর্ষটি যেখানেই হোক—তাকে মেরুই বলি, আর স্বর্গই বলি—তার শোভার কথা আছে প্রাচীন সাহিত্যে, পুরাণে।

স্বর্গের সে শোভা ভাস্করাচার্য্য তার ভূবনকোষে লিখে গেছেন সংস্কৃত ভাষায়। বর্ণনা তার অপূর্ব্ব—অনুবাদে অনেকটা দাঁড়ায়—

"নিষধ নীল, গন্ধমাদন, মাল্যবান সে গিরী,
আবৃত করিয়া রেখেছিল ইলাবৃতে,
মাঝে ছিল তার মরু পর্ব্বত, মণি-মাণিক্যে ভরা,
দেবগণ সেথা রহিত হর্ষ-চিতে।
পুরাণ কয়েছে সে পুরাণো কথা এ মরু-চূড়ার পরে,
ব্রহ্মা হলেন উদয় সৃষ্টি তরে,
নাভি-পদ্মের বীজকোষ ঐ কেন্দ্র-কর্ণিকারে
ইলাবৃত বলি প্রচারে সর্ব্বভিতে।

তার মানে ইলাবৃত বর্ষটাই যেন নাভিপদ্ম আর পর্ব্বত চূড়াটা যেন পদ্মের মধ্যের সেই কর্ণিকা—বীজকোষ।

ব্রহ্মা জন্মালেন পদ্ম-কর্ণিকায়, কিন্তু গড়ে নিলেন ইলাবৃত বর্ষ।

এখন এই ইলাবৃত বর্ষ যদি মধ্য এশিয়ার আলটাইর কোলেই হয়, ক্ষতি বা দুঃখ তাতে কিছু নেই—দুঃখ স্বর্গ তার শ্রী, কল্যাণ, পবিত্রতা হারিয়ে ফেলেছে। স্বর্গের যে সুখের জন্য, আনন্দের জন্য, আড়ম্বরের জন্য মানুষ পাগল—তা আজ তাতে নেই, আর নেই বলেই স্বর্গ বলে তাকে ভাবতে পারি না। নইলে দেবতা হওয়া বা স্বর্গ রচনা তো সর্ব্বত্রই সম্ভব!

রাজা ও রাজ্য-বিস্তার

প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ

এই স্বর্গ বা ইলাবৃতবর্ষে যথা নিয়ম স্বায়ম্ভুব মনুর বড় ছেলে প্রিয়ব্রত হলেন রাজা। উত্তানপাদ রাজার মতন সম্পত্তি আর সুখ পেলেও রাজা হ'লেন না; কারণ তিনি কনিষ্ঠ।

প্রিয়ব্রত খুব ভাল লোক। সকলের প্রিয়, তার হলো চার ছেলে—আগ্নীধ্র, ঔত্তমী, তামস আর রৈবত।

এই প্রিয়ব্রতই সাগর পারের পণ্ডিতদের নিকট 'স্পেতাম্বাস' নামে হয়তো খ্যাত।

প্রিয়ব্রত বুদ্ধিমান, বুঝলেন, ঠাকুরদাদার তৈরী ভুবন পেয়েছি, ত্রিভুবনই তো তার তৈরী, অতএব এক জায়গায় থাকা কেন—নতুন নতুন দেশে গিয়ে সব ছেলেই তো রাজা বা মনু হ'তে পারেন। তিনি বড় ছেলে আগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপের রাজ্যে বসালেন।

আগ্নীধ্র বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ বিচার শক্তি তার। বুঝলেন এক জায়গায় বসে সমগ্র দেশটা শাসন করতে হ'লে একে বিভিন্নভাবে ভাগ করে উপযুক্ত লোকের হাতে শাসন ভার দিতে হবে। তিনি ভাল ভাল স্থপতি আর কারিগর নিয়ে জরীপ করে পুরো জম্বুদ্বীপ বা এশিয়াকে নয় ভাগে ভাগ করে ফেল্লেন।

নয় বর্ষ ও নয় লোক

এশিয়া বা জম্বুদ্বীপকে আগ্নীধ্র নয় ভাগে ভাগ করলেন। মাঝখানে রইল ইলাবৃত বর্ষ—পর্য্যায়ক্রমে তার উত্তরে রম্যকবর্ষ, হিরন্ময় বর্ষ, কুরু-বর্ষ এবং দক্ষিণে সুমেরু বর্ষ, হরি বা নিষধবর্ষ, হিমবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ আর হিমবৎ বর্ষ বা ভারতবর্ষ। দক্ষিণ দিকের নাম ক'টা একটু অদল-বদল হয়েছে—কারণ রাজা ও রাজ্য ওলট-পালট হয়েছে এদিকে বেশী তো। ইলাবৃত বর্ষের পূর্ব্বে—ভদ্রাশ্ববর্ষ আর পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ।

ধর্ম্ম আর পরলোক নিয়ে যাঁদের চর্চ্চা তাঁরা আবার ভুবনের এই

ভাগকে তেমন পছন্দ করলেন না। নাম দিলেন পর্য্যায়ক্রমে উত্তরে স্বর্গলোক, মহলোক, তপোলোক আর ব্রহ্মলোক, দক্ষিণে ভূলোক। পূর্ব্বে ভুবলোক আর পশ্চিমে জনলোক। তাদের মতে মোট সপ্ত-লোক।

এই ভাবে যাঁরা ভাগ করলেন, তাঁরা বল্লেন—স্বলোকে বা ভূ কিম্বা ভূবলোকে যাঁরা সাধনা করবেন, তপস্যা করবেন, তাঁরাই যেতে পারবেন ক্রমে ঐ জনলোকে, তারপর মহলোকে, আরও সাধনা করলে তপো-লোকে আর মুক্ত হ'লে ব্রহ্মালোকে। এ হ'ল ধার্মিক ভাগ।

আবার একদল বলেন ত্রিলোক হিসেবটাই ভাল। ভূ, ভূর্ব, স্বঃ যা সাধারণ ভাবে বুঝি স্বর্গ, মর্ত্ত্য আর পাতাল।

অমৃত লোক বা স্বাস্থ্য-নিবাস

ছান্দ্যোগোপনিষদ্ কিন্তু এই সপ্ত লোকের জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়ী পথটাকেই বলেছেন এক একটি 'স্বাস্থ্য-নিবাস' আর তাদের নাম দিয়েছেন "অমৃত"।

ছান্দ্যোগ বলেন—ভারত বা ভূ-লোক থেকে বেরিয়েই প্রথম উঠতে হবে সেই "অমৃতলোকে" বা স্বাস্থ্যাবাসে যেখানে অষ্টবসু বাস করেন। অগ্নি এখানের নেতা। হয় তো আজ তারই নাম তিব্বত।

তারপর উঠতে হবে দ্বিতীয় অমৃতে—যেখানে একাদশ রুদ্র আছেন ইন্দ্রের নেতৃত্বে; আজ হয় তো তাকেই বলি চীন বা তাতার। তারপর হ'ল বরুণের নেতৃত্বের দেশ, হয় তো তা মঙ্গোলিয়া—সে অমৃতে বা স্বাস্থ্যনিবাসে থাকেন দ্বাদশ আদিত্য। তারপর চন্দ্রের নেতৃত্বে আছেন উনপঞ্চাশৎ বায়ু—সেই চতুর্থ অমৃতে; আজ হয়তো তাই দক্ষিণ সাইবেরিয়া আর পঞ্চম অমৃতেই সেই ব্রহ্মালোক বা উত্তর কুরু, ব্রহ্মা সেখানকার অধিপতি।

কেউ আবার বলেন ও সব এশিয়ার মানচিত্রের ব্যাপারই নয়। ঐ যে সব ব্রহ্ম লোক ইন্দ্রলোক এসব এ পৃথিবীর মধ্যেই নয়—।

বিষ্ণু পুরাণ এই দ্বীপ, বর্ষ, লোক বিভাগের সব কথা বলেছেন, এবং আরও বলেছেন যে পৃথিবীর চারদিকে ছিল সুন্দর চার পুরী বা পুর। উত্তরে সিদ্ধ পুরী, পূর্বে যমকোটী পুরী, দক্ষিণে লঙ্কাপুরী ও পশ্চিমে রোমক পুরী।

প্রথম পঞ্চ-মনু

এশিয়া ভাগ করে আগ্নীধ্র নরটী বর্ষের মালিক হয়ে বসলেন। নাম নিলেন দ্বিতীয় মনু—স্বারোচিষ মনু।

প্রিয়ব্রত বড় ছেলের ব্যবস্থাই শুধু করলেন না ঔত্তমীকে পাঠালেন এক দ্বীপে—তামসকে অন্য দ্বীপে—রৈবতকে অন্য দ্বীপে। অনেকে বলেন বর্ত্তমান পরিচয়ে সেই সব দ্বীপের নাম করলে, বলতে হয়—**তৃতীয় মনু** ঔত্তমী গেলেন সেই দ্বীপে, যেখানে আজ জার্ম্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড, হাঙ্গারী, ইটালী ও অস্ট্রীয়া। তামস গেলেন আফ্রিকায়—নাম হলে **চতুর্থমনু তমাসু।** আর **পঞ্চম মনু রৈবত**—এশিয়া মাইনরের দিকে বসালেন রাজ্য। অবশ্য এ সবই অনুমান মাত্র। আর সে অনুমান এসেছে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার ফলে—ইণ্ডো-ইরানিয়ান, ইণ্ডো-ইউরোপিয়ান—এশিয়ান প্রভৃতি জাত ও ভাষায় ভারতীয় কৃষ্টির ছাপ দেখে।

সপ্ত সমুদ্র ও সপ্ত দ্বীপ

বিষ্ণু পুরাণে আছে সমস্ত ভুবনটায় সাতটা দ্বীপ আছে। সপ্ত-দ্বীপা বসুন্ধরা, - আর তাকে ঘিরে আছে সাত সমুদ্র। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্ত দ্বীপ আর লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পী, দধি, দুগ্ধ আর জল এই সপ্ত সমুদ্র। নামগুলো বড় মজার। আহা যদি দুধ, দই আর ইক্ষু অর্থাৎ আখের রস আর সুরা মানে মদের সমুদ্র হ'ত—তবে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ লাগতো দিনে হাজার বার। তাতো আর নয়, এগুলি শুধু নাম। কাল ছেলের নাম পদ্মলোচনও তো হয়,—যেমন আজকালকার রেড সি (Red see), তার জল কি আর লাল। তা নয়, ও সব নামের বাহার।

যাক্ সেই সপ্তদ্বীপের মধ্যে ঐ যে জম্বু দ্বীপ তাকে আমরা এখন বলি এশিয়া, অন্য দ্বীপগুলোরও এমনি নাম বদলেছে।

এর মধ্যে জম্বু দ্বীপেই ছিলেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা। প্লক্ষ দ্বীপে রাজা ছিলেন মেধাতিথি—তাঁর সন্তানগণ ছিলেন শান্তভয়, শিশির, মুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক এবং ধ্রুব (এখানেও দেখি ধ্রুব)। শাল্মলী দ্বীপের রাজা ছিলেন বপুষ্মাণ, তাঁদের বংশধরগণ শ্বেত, হারীত

জীমূত, রোহিত, বিদ্যুৎ, মানস ও সুপ্রভ। কুশ দ্বীপের রাজা জ্যোতিষ-মান। বংশধরগণ ছিলেন—উদ্ভিত, বেনুমতি, বেল্লা, লক্ষণ, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল। ক্রৌঞ্চ দ্বীপের রাজা ছিলেন দ্যুতিমান, সন্তানগণ তাঁর—কুশল, মন্দ, উষ্ণ, উষর, অন্ধকার, মণি ও দুন্দুভি। শাক দ্বীপের রাজা ছিলেন ভব্য—বংশধরগণ তাঁর জলদ, কুমার, সুকুমার, মনিবক, কুসুমাঙ্গ, মোদক, মহাক্রম। পুষ্কর দ্বীপের রাজা সবল—বংশধর ছিল তাঁর মহাবীর, বর্য ও ধাতক। আজ একথা ভুললে চলবে না সে যুগের এই সব দেশই হয় তো প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের দ্বীপ সমূহ—এই সব দেশই—সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারী প্রভৃতি।

কিন্তু বেশী দিন আগ্নীধ্র ইলাবৃতে থাকতে পারলেন না। উত্তান-পাদের ছেলে ধ্রুব বিরাট শক্তি নিয়ে তাকে যুদ্ধে হারিয়ে তাড়িয়ে দিলেন,—ভক্ত ছেলে ধ্রুব কেন যে আবার তাঁকে যুদ্ধ করে তাড়ালেন সে কাহিনী হবে—বংশ বিস্তারটার পর।

তবে ধ্রুব যখন তাড়ালেন আগ্নীধ্রকে, আগ্নীধ্র তখন ইলাবৃত বর্ষ বা স্বর্লোক ছেড়ে দলবল নিয়ে এলেন হিমবর্ষে মানে ভারতে নয়—ভারতের উপরে হিমালয় প্রদেশে। এইখানেই সেই নতুন নামটা নিলেন স্বারোচিষ মনু। নতুন রাজ্য গড়লেন, লোক বসালেন আর ৬৭৭৬ খৃঃ পূঃ প্রচলিত করলেন নতুন লৌকিকাব্দ। সেদিন প্রতি ১০০ বছরে একটি অব্দ শেষ হ'ত। আবার এক থেকেই হত সুরু। অনেকে বলেন সেটা ৬৭৭০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের কথা।

বিভিন্ন-বংশ-বিস্তৃতি

স্বায়ম্ভুব মনুর নাতী নাতনীদের দিয়েই তো মানব। তাঁদের বংশেরই আমরা সব। তাঁদের সন্ততিদের মধ্যে পেয়েছি আমরা শুধু দুই ছেলে আর এক মেয়ে প্রসূতির পরিচয়। মনু বাকী দুই মেয়ে আকুতি আর দেবাহুতিরও বিয়ে দিলেন। আকুতিকে দিলেন ভাই রুচির হাতে আর **দেবাহুতি** মালা দিলেন **কর্দ্দমকে।** আকুতির গর্ভে রুচির হ'ল ছেলে যজ্ঞ আর কন্যা দক্ষিণা। লক্ষ্মী-নারায়ণের অংশ জেনে ঋষিরা তাঁদেরই দিলেন বিবাহ। তাঁদের হ'ল বারটী ছেলে।

দেবাহুতির গর্ভে কর্দ্দমের সন্তান হ'ল **কশ্যপ** আর পূর্ণিমা নামে দুই ছেলে। মহামুনি **কপিল দেবও** এই কর্দ্দমেরই ছেলে। অনেকে আবার এই দেবাহুতির নাম মরীচিও বলেন।

কর্দ্দমের এই যে বড় ছেলে কশ্যপ, ইনিই আমাদের ভারতীয়দের মূল পুরুষ। কশ্যপই আসেন প্রথম ভারতবর্ষের দ্বারে—নতুন এক দেশে বা মেরুতে। নাম হয় তাই সেই নতুন মেরুর—কাশ্যপের মেরু বা কাশ্যমেরু বা কাশ্মীর।

তার পর তার সন্তানরা নামলেন প্রথম পঞ্জাবের পঞ্চ নদীর দেশে, আর সেখানেই যজ্ঞ ও সংসার সুরু করলেন।

কশ্যপ বংশ তো নামলেন কিন্তু তার ভাই পূর্ণিমা বোধহয় রয়ে গেলেন স্বর্গে বা মধ্যপথে। তাঁর দুই ছেলে বিরজ ও বিশ্বগ, মেয়ে হল দেবকুল্যা। অত্রির ৩টী ছেলে—দত্ত, **দুর্ব্বাসা** ও সোম। অঙ্গিরার হয় চার মেয়ে সিনিবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি। আর দুটী ছেলে—উতথ্য ও **বৃহস্পতি।** এরা দু'জনেই বিশেষ বিখ্যাত। তাছাড়া বৃহস্পতির এক ভগ্নী ছিলেন **ব্রহ্মবাদিনী**—যোগসিদ্ধা। দেশময় তার পাণ্ডিত্যের যশ—সংসারে অনাসক্ত হয়ে বের হলেন ব্রহ্মবাদিনী তীর্থ পরিক্রমায়। পথে দেখা তার প্রভাসের সঙ্গে। বসুদের মধ্যে অষ্টম বসু তিনি, যেমন রূপ, তেমনি গুণ। বিবাহ হ'ল দু'জনার।

আর সেই শ্রেষ্ঠ মানব-মানবীর গর্ভেই জন্ম নিলেন **বিশ্বকর্ম্মা**। শিল্পী তিনি—সে যুগে যে সব জিনিষ তৈরী করেছেন রথ, ভবন, যান, যন্ত্র.—আজ তারই নানা অনুকরণ বা অনুসরণ চলেছে।

ব্রহ্মার বংশজ পুত্রদের মধ্যে পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, অথর্ব্বা ও ভৃগু প্রভৃতি সকলেরই বংশ-বিস্তার হ'ল ধীরে ধীরে। পুলস্ত্যের ছেলে হল হবির্ভূবের গর্ভে—আর তিনিই হলেন **অগস্ত্য**। আরও এক জন ছেলে তাঁর—নাম বিশ্রবস। তিনি মহাতপস্বী। এই বিশ্রবসার দুই স্ত্রী ইলাবিলা ও কেশিণী। সেযুগে এই প্রথম আমরা দেখি এক জনার দুই স্ত্রী।

যক্ষ ও রাক্ষস

ফল এর ভাল হ'ল না। ইলাবিলার গর্ভে হ'লেন **কুবের,** যক্ষদের রাজা। কিন্তু কেশিণীর গর্ভে হলেন রাক্ষস **রাবণ, কুম্ভকর্ণ** ও **বিভীষণ**। কামনার বশে একাধিক স্ত্রীর পরিণামই এই তমোপূর্ণ সন্তান। পুলস্ত্যের হয় তিন ছেলে—কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়স্ ও সহিষ্ণু।

সপ্তর্ষি ও বালখিল্য

ক্রতুর স্ত্রী ক্রিয়ার গর্ভে হয় ষাট হাজার বালখিল্য ঋষি। এই সব 'হাজার' হয়তো নক্ষত্র পুঞ্জ বা প্রজাসমষ্টিরই রূপক।

নক্ষত্র লোকে শুধু বালখিল্য নয় সপ্তর্ষিও দেখতে পাই। ব্রহ্মা বা স্বয়ম্ভূ পুত্র সাত জনই 'সপ্তর্ষি' নামে খ্যাত। নাম তাদের—মরীচি, অত্রি. অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। মতান্তরে বশিষ্ঠের সাত ছেলেই "সপ্তর্ষি"। তাঁদের নাম চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বন, বসুভুদ্‌যান, দ্যুমন।

কেউ কেউ বলেন এক এক মন্বন্তরে এক এক 'সপ্ত-ঋষি-মণ্ডলী' সপ্তর্ষির সম্মান পান। আকাশের সাতটী তারা দেখিয়ে আমরা এঁদের স্মরণ বরি।

অথর্ব্বার ছেলে **দধীচি** ও অশ্বশিরা—ভৃগুর সন্তানদের মধ্যে তিন ছেলে ধাতা, বিধাতা ও কবি এবং তিনটি মেয়ে শ্রী, নিয়তি ও আরতি। এদের মধ্যে আরতি ও নিয়তির বিয়ে হয় দুই ভাই—ধাতা ও বিধাতার সঙ্গে। এই ধাতার ছেলেই মৃকণ্ড এবং বিধাতার ছেলে প্রাণ।

শুক্রাচার্য্য ও দক্ষ

এই মৃকণ্ডুর পুত্রই বিখ্যাত **মার্কণ্ডেয়** মুনি আর প্রাণের ছেলে **দেবশিরা**। কবির ছেলেই দৈত্যগুরু **শুক্রাচার্য্য** বা উশনা।

এই হল একদিকে—আর একদিকে দক্ষের হল ষাটটী মেয়ে। তার মধ্যে তিনি আটটী দেন ধর্ম্মকে, এগারটি রুদ্রকে, ত্রয়োদশটি কশ্যপকে, সাতাশটি চন্দ্রকে এবং আদরের মেয়ে সতীকে দেন শিবের হাতে। মনে রাখতে হবে **"দক্ষ"** এক উপাধি—এর পর অনেক দক্ষ আছেন। ইনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

শিব কিন্তু মনু বংশের মানব নন। সত্যলোকবাসী তিনি। তবু সতীর আরাধনায় দেবাদিদেব মহাদেব হলেন প্রসন্ন। সে কি সহজ সাধনা—অথচ সইলনা তাঁর স্বামীর ঘর। রাজা দক্ষ ভিখারী শিবকে অহঙ্কারে অপমান করার জন্য যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করলেন না—তবু শিব এলেন, কিন্তু হলেন অবমানিত। স্বামীর অবমানে সতী দেহ ত্যাগ করলেন। কেমন করে শিব সেই মৃতদেহ কাঁধে করে নিয়ে জগৎ সংসারে পাগলের মত ঘুরে বেড়ান—কেমন করে সতী-অঙ্গ টুকরো টুকরো করে এই মাটীর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, কেমন করে সে অঙ্গ-স্পর্শে একান্নটি পীঠস্থান মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, আর সতী পর-জন্মে কি ভাবে শৈলপুত্রী পার্ব্বতী হয়ে হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মান, সে গল্প আছে পুরাণের এক করুণ কাহিনীর মধ্যে।

ধর্ম্মের আট পত্নী, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, মতি, সুমতি। এদেরই মধ্যে শান্তির সন্তোষ, পুষ্টির মহান্, ধৃতির ধৈর্য্য, তুষ্টির হর্ষ ও দর্প, ক্ষমার সহিষ্ণু, শ্রদ্ধার ধার্ম্মিক, মতির জ্ঞান ও স্মৃতির জাতিস্মর নামে সব পুত্র সব হয়। ধর্ম্মের আর এক স্ত্রী মূর্ত্তির গর্ভে হয় নর ও নারায়ণ নামে দুই ঋষি।

অষ্ট বসু

এই দেব বংশেই আটজন বসু হলেন—সাবিত্র, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধ্বজ, প্রত্যুষ, প্রভাস এদের পাপ আর শাপ মোচনের গল্পের মধ্যেই শান্তনু ও মহাভারতের সুরু।

হয়তো এ সবের মধ্যে খানিকটা কবিত্ব, খানিকটা কল্পনা বা বিভ্রম

আছে। তবে ইতিবৃত্তে এ কথা প্রমাণিত যে ভারতের বুকে মানব বংশ বিস্তার হয়, কশ্যপকে দিয়ে।

কশ্যপেরই গোত্র আমরা—তাই আজও আমাদের দেশে অনেক বড় বংশ দেখলে লোকে ঠাট্টা করে বলে 'কশ্যপের বংশ'। যাক্ কশ্যপ তো এলেন ভারতবর্ষে কিন্তু কেন এলেন, কি করে এলেন?

দেশ ছেড়ে যে অন্য দেশে হাঁটা দেয় তার কারণ কি? আর দেশ বলে দেশ—অমন দেশ স্বর্গ। তা ছেড়ে মাটীর পৃথিবীতে. ধুলার ধরণীতে আশ্রয় নিল ঐ "দেবতাদের সন্তান—'অমৃতস্য পুত্রাঃ' কেন?

এর একটি কারণ হল প্রকৃতির বিপর্য্যয়—'মহা-প্রলয়'। এ সংসারে কতবার যে মহাপ্রলয় হয়েছে তার তো ঠিক নেই। তেমনই এক মহা প্রলয়েই তাঁরা দেশ ছেড়েছিলেন। আর এক কারণ অসুর আর দেবতাদের যুদ্ধ। তার মধ্যে তিনটী লোকই, অমৃতের পুত্র এই দেবতাদের পৃথিবীর মৃত্যুশীল মানুষ করে পাঠাবার জন্য দায়ী। একজন ধ্রুব, একজন প্রহ্লাদ আর একজন ইন্দ্র। এদেরই সময়ে—তিনটী যুদ্ধে জ্ঞাতিরা দেশ ছাড়া হ'ল। তবু তাঁরা আমাদের প্রণম্য!

ধ্রুব—ভক্ত ও যোদ্ধা

প্রথমেই বলি ধ্রুবর গল্প। প্রিয়ব্রত রাজা হলেন, উত্তানপাদ হলেন না—ছোট যে তিনি। তবুও সুখেই ছিলেন প্রায় রাজার মতন হয়ে—সেই উত্তানপাদ।

তাঁর ছিল দুই রাণী সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতি বড়, তাঁর ছেলে ধ্রুব; সুরুচি ছোট কিন্তু আদরের, তাই তাঁর ছেলে কীর্ত্তিবৎ ও উত্তমকেই রাজা আদর করেন বেশী। একদিন রাজসভাতে সুরুচির ছেলেকে কোলে নিয়ে রাজা উত্তানপাদ বসে, এমন সময় ধ্রুব এলেন সেখানে। সখ হ'লো বাবার কোলে উঠবেন। বাপও হাত বাড়িয়েছেন—শত হ'লেও বাপ তো, তার উপর নিজ হ'তে ছেলে কোলে উঠতে চায়। কিন্তু গর্জ্জে উঠলেন পেছন থেকে ছোটরাণী সুরুচি। ভর্ৎসনা করে বল্লেন—"উঃ কত সখ! যার পেটে তোর জন্ম, তার ছেলে অমন উঁচু জায়গায় বসতে পারে না। জন্মাতিস্ আমার পেটে, তবে উঁচু জায়গায় বসবার সাহস করতে পারতিস্।'

ধ্রুবর মনে কত কষ্ট হ'লো—এলেন মার কাছে কাঁদতে কাঁদতে। মা বোঝাতে গিয়ে বল্লেন—"কাজ কি বাবা ঐ উঁচু সিংহাসনে। নিজে ভাল হও। নিজের গুণে সকলে তোমাকে উঁচু আসন দেবে। আমি আশীর্ব্বাদ করি নিজের শক্তিতে তুমি জগতে সব চেয়ে উঁচু আসন পাও।" মায়ের আশীর্ব্বাদ—সে কি মিথ্যা হ'তে পারে!

হ'লোও তাই ধ্রুব সেই কচি বয়সেই গেলেন বনে চ'লে—দীর্ঘদিন করলেন তপস্যা—সে কি কঠোর তপস্যা—কত বাঘ, কত ভাল্লুক ভয় দেখায়—আর আসে কত না সে প্রলোভন। বালক ধ্রুব কিশোর হলেন, যুবা হলেন, কিন্তু মন তাঁর অটল। শুধু নাম করেন ঠাকুরের—"কোথায় হরি, কোথায় বিষ্ণু, কোথায় ভগবান।" সে ডাক শুনে এলেন নারদ। শিশু ধ্রুবকে দিলেন দীক্ষা—তারপর সপ্তর্ষিও তাকে নানা শিক্ষা দিলেন সাধনার। সাধনায় বসলেন ধ্রুব আবার। সে সাধনা ঠাকুরকেও টলাল—পরম ব্রহ্মের দয়া হ'ল। ধ্রুব তাঁর দর্শন পেলেন, বর লাভ করলেন—মার কথা সার্থক হলো। তাই ধ্রুব মৃত্যুর পর যে লোকে গেলেন তা' সবার উচ্চে—তাই'ত **ধ্রুবলোক**।

আজও আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা বলি—ঐ ধ্রুব নক্ষত্র। স্থির সে তারাটি জ্বল্ জ্বল্ করে। ব্রহ্মলোক দেবলোকের সবাই তাকিয়ে দেখতে পান—ঐ ধ্রুব নক্ষত্র। ওকে ঠিক রেখেই চন্দ্র, সূর্য্য, তারার গতি ঠিক করেন জ্যোতিষীরা।

এইতো হ'ল ভক্ত ধ্রুবর রূপ। কিন্তু রাজার রক্ত তাঁর দেহে। তিনি ভাবলেন "আমাদের বঞ্চিত ক'রে একই পিতামহের সন্তান হয়েও, শুধু জ্যেষ্ঠত্বের দাবীতে যে প্রিয়ব্রত-পুত্র আগ্নীধ্র আজ মনু হয়েছেন, আমি তাঁর সে প্রতিষ্ঠা কেড়ে নেবো।" উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হ'ল—যুদ্ধে আগ্নীধ্রকে ধ্রুব হারিয়েও দিলেন।

আগ্নীধ্র পালালেন, নিজের সব লোক নিয়ে সুমেরু প্রদেশেরও নীচে হিমালয়ের মাথায় হিমবর্ষ বা হিমাচল প্রদেশে। সেখানে রাজ্য বসালেন। আর ধ্রুব রইলেন সেই মেরুদেশে বা স্বর্লোকে।

কিন্তু প্রকৃতির পরিশোধ। বেচারা আগ্নীধ্র কোন দোষ করেন নি। রাজা প্রিয়ব্রতের বড় ছেলে তিনি, তাই হয়েছিলেন রাজা। ধ্রুব তাঁকে

স্বেচ্ছায় তাড়ালেন। এ স্বেচ্ছাচারিতার ফলেই হয়তো ধ্রুবর তিনটী পুরুষ আর সে রাজ্যে রাজত্ব করতে পারলেন না।

সুমেরু-প্রদেশ—

ধ্রুব যখন সাধন-বলে ধ্রুবলোকে চলে গেলেন তখন তাঁর ছেলে শিষ্টি হ'ল রাজা। তারপর তাঁর ছেলে রিপু আর রিপুর ছেলে **চক্ষুস**। কিন্তু এই চক্ষুসের ছেলে **চাক্ষুসের** সময়ই প্রচণ্ড হিম-শিলাপাতে মেরু প্রদেশ লয় পেতে বসলো।

পাহাড়ের বরফ গলে তুষার প্রবাহ নেমে এল ইলাবৃতবর্ষের বুকে। জগতে এত বড় বরফ-ভাঙ্গা-তুফান আর হয়নি। সারা ইলাবৃতবর্ষ ভেসে গেল। বানের গ্রাস থেকে বাঁচবার জন্য রাজা চাক্ষুস দলবল, আত্মীয়-স্বজন, সব নিয়ে পালিয়ে এলেন সুমেরু পর্ব্বতের নীচে।

নতুন জায়গায় চাক্ষুস হলেন মনু—সঙ্গে আনা মনুষ্যদের হলেন রাজা। আবার চললো নতুন রাজ্য ও দেশ-গড়ার পালা। আগে যেমন ইলাবৃতবর্ষকে কেন্দ্র করে এশিয়াকে নয় ভাগে ভাগ করা হয়েছিল তেমনিই করে চাক্ষুস সেই নয় নামেই নতুন রাজ্যটা ভাগ করে নিলেন। এবার মাঝখানে রইল 'সুমেরু প্রদেশ'।

চাক্ষুস সে সুমেরু প্রদেশে রাজ্য বসালেন। আজ সে জায়গাটাকেই অনেকে বলে আলটাই পার্ব্বত্য প্রদেশ। সে সময় এখানে ছিল সীতা নদী, যা গিয়ে পড়েছে অরুণোদয়ে—আজ যার নাম বৈকাল হ্রদ, হয়তো নদীর নাম সীতা থেকে হয়েছে চিটা। তারপর অলকানন্দা, সরস্বতী আর সোমা। আজ যাকে বলা হয় 'উলুকেন', হয়তো সেদিন ছিল অলকানন্দা। হয়তো প্রাচীন নাম সরস্বতী থেকেই স্বরবুটি আর বর্ত্তমানে তাই বোধ হয় হয়েছে—জরজাটির্স্। তারপর সোমা—আজ হয়তো সেলেঙ্গী। আর অনেকে বলেন দক্ষিণে আসা এই দক্ষিণেশ্ব চাক্ষুস—গ্রীকদের মেগস্থানিস্ বর্ণিত ডাইওনিস।

আবেস্তায় বলে অহুর মজুদ্ এ প্রদেশ স্থাপন করেন—নাম হয় 'সুখধ'। নামটা কিন্তু 'সুখদ' রাজ্যের কথা মনে করায়। অহুর বা অসুর (দেবকুল) প্লাবনে "বর" বা গমনোপযোগী ভেলা নির্ম্মাণ করেই নতুন রাজ্যে এসেছিলেন।

যে ভাবেই হউক—চাক্ষুস সেদিন ষষ্ঠ মনু হয়ে রাজ্য শাসন সুরু করলেন। চাক্ষুস মারা যাবার পর তাঁর ছেলে উরু হলেন রাজা, তারপর অঙ্গ। এঁরা তিনজনই দেশকে সাজিয়ে গুছিয়ে মহাসুখে সুন্দরভাবে শাসন ক'রে গেলেন।

কিন্তু সুখ কি চিরদিন থাকে। 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ—ও সুখের চাকা ঘুরলেই, সুরু হয়ে গেল দুঃখের পালা। অঙ্গের ছেলে বেণ হয়ে উঠলেন দুর্দ্ধর্ষ, নাস্তিক, অহংকারী, পরাক্রমী ও পাপাশয়। অহংকারে মত্ত হয়ে প্রচার করলেন "আমিই নারায়ণ, আমিই পরম-ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর।" বেণের আদেশ—কেউ যজ্ঞ করতে পারবে না। অনাচার আর অত্যাচারে ভরে উঠলো সুমেরু প্রদেশ।

পৃথু ও পৃথিবী

তখন মুনি ঋষিরা আর প্রজার দল মিলে বেণকে হত্যা ক'রে, তাঁরই মহিষী দক্ষিণার গর্ভজাত পুত্র পৃথুকে রাজ-সিংহাসনে বসালেন। এই **পৃথু** রাজা হবার সময় পুরোহিত শুক্রাচার্য্য এবং ঋষিরা তাকে প্রজার মঙ্গল কামনার জন্য অভিষেক-মন্ত্র পাঠ করিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন—

"আমি প্রজার মঙ্গল করবো। আমি নিজের প্রিয়, অপ্রিয় এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মান ত্যাগ করে সর্ব্ব জীবের প্রতি সমদর্শী হব এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট মানুষকে দণ্ড দেবো।...প্রতিজ্ঞা করছি যে কায়মনোবাক্যে বেদ-নির্দ্দিষ্ট দণ্ড ও নীতি—সব ধর্ম্ম পালন করবো......।"

সেই দিন থেকে ভারতে এ অভিষেক-মন্ত্র রচিত হ'ল। সিংহাসন আরোহণে রাজাকে এ মন্ত্র পাঠ করতেই হবে। অভিষেকের এই নিয়ম করলেন ঋষিরা। আজও সেই শপথ করার নিয়ম চলে আসছে। বিদেশী রাজনীতিতেও রাজাকে বা শাসককে যে শপথ করান হয় তা এই প্রাচীন আর্য্য-নীতি থেকেই নেওয়া।

পৃথু ভাল লোক, তার উপর বাপের অবস্থাটাও তো সে দেখলো—খুবই ভাল হ'ল। নিজে চাষিদের সঙ্গে ভূমিকর্ষণের কার্য্য থেকে সুরু করে সব রকম শান্তির কার্য্যে, ধর্ম্মের কার্য্যে ও নানা সৎকর্ম্মে নিযুক্ত হ'য়ে সকলের প্রিয় হলেন। সবাই তাই বোধহয় ভূলোকের নাম দিলেন পৃথুর রাজ্য পৃথিবী। পৃথুর প্রশংসায় সকলে সেদিন পঞ্চমুখ।

সূত ও মাগধ—

এমন কি এই প্রশংসার গান গাইবার জন্য সূত ও মাগধের সৃষ্টি হ'ল রাজ্যে। এরা রাজার ও রাজত্বের গুণকীর্ত্তন ক'রেই বেড়ায় জায়গায় জায়গায়। পৃথুর এতে আরও উৎসাহ বেড়ে গেল। পৃথুর হাতে তৈরী পৃথিবী সে দিন থেকে হলেন অন্নপূর্ণা ধরণী!

প্রচেতা ও দক্ষ

পৃথু যশ নিয়েই মারা গেলেন। তাঁর ছেলে অন্তর্দ্ধান, তাঁর ছেলে হবির্দ্ধান, আর তাঁর ছেলে প্রাচীনবর্হি। সবাই ক্রমে ক্রমে রাজা হলেন। প্রাচীনবর্হির যে ছেলে হলেন তাঁর নাম প্রচেতা। ইনি, ব্যবস্থা করলেন যে—'প্রচেতা' নামটি সব সম্রাটের উপাধি হবে আর তাঁর স্ত্রী মারীষার নামেই হবে সব পাটরাণীদের পরিচয়।

এমন একটা স্থায়ী অভিনব ব্যবস্থার কারণ ছিল নিশ্চয়ই। আর কারণটাও বেশ একটু নতুন রকমের। প্রচেতা ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। রাজত্বে কণ্ডু মুনি সুরু করলেন কঠোর সাধনা। সে সাধনায় পাছে তিনি সুমেরুর রাজ্যই চেয়ে বসেন—এই ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গের অপ্সরী প্রম্লোচাকে পাঠালেন কণ্ডুর গুহায় তাঁর তপস্যা ভাঙতে। সংসারত্যাগী ঋষি নিজের আশ্রমে, গুহা-পার্শ্বে দেখলেন সুন্দরী নারী—মনে এলো কামনা, ভাবলেন তপস্যা থেকে একটা দিনের বিশ্রাম নিয়ে, প্রম্লোচার সঙ্গে একটু সুখে দিন কাটাবেন।

তাই হ'ল—আনন্দে বছরের পর বছর যায়—কণ্ডু বুঝতেই পারেন না। সহসা মুনির মনে হয়, সন্ধ্যা সমাগত উপাসনা করতে হ'বে—বিদায় দিতে চান প্রম্লোচাকে। বলেন—"পুরো দিনটাই গেল বৃথা কেটে।" প্রম্লোচা উত্তর দিল—"একদিন কোথায় কেটে গেছে—১২ বছর যে কেটে গেল।" মুনি চমকে উঠলেন।

এটাকেও অনেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বৎসর গণনাত্মক গল্পই বলেন।

যাই হোক—এদিকে এই মিলনে প্রম্লোচার গর্ভে এল এক কন্যা—ইনিই মারীষা। কণ্ডুও নিতে রাজী নন—সাধনায় ব্যাঘাত হবে। প্রম্লোচাই বা মারীষাকে স্বর্গে নেবে কেন? রইল বনে মেয়ে। সেখানে তাঁকে কুড়িয়ে পেলেন রাজা সোম। প্রতিপালন করলেন কুড়িয়ে

পাওয়া সে মেয়েটিকে। মেয়ে বড় হল আর স্বয়ম্বরে এই প্রচেতাই পেলেন তাকে। কিন্তু কণ্ডু মুনি নিজে এসে যখন প্রকাশ করলেন—কোন বংশের মেয়ে সে—তখন স্ত্রীর জন্মের গ্লানিকে গৌরবে ভরে দিতে, তিনি যেমন পুরুষদের উপাধি দিলেন প্রচেতা—নারীরা হলেন মারীষা।

সে ব্যবস্থা বজায় রইল দশ পুরুষ পর্য্যন্ত।

দশম প্রচেতার ছেলে দক্ষ। তবে দক্ষ নাম ছিল আবার অনেকের—নামটা সে যুগে খুব জোরাল লোকের সখের নাম—তাই ইনি **প্রাচেতস্ দক্ষ** বলে নিজের পরিচয় দিতে লাগলেন।

সুর ও অসুর

এই দক্ষ পর্য্যন্ত যে গল্প সেটা বেশ এক রকম চলছিল। সবাই তখন অসুর। মানে সম্মানে বংশে সবাই সমান। মুনি ঋষিরা বেদের মন্ত্রে তখন গাইতেন—"আমিও সেই দ্যুলোকের অসুরকে এবং তাহার অনুচর স্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল-বাসী মরুদগণকে স্তব করি।"—

সুর, দেব, দানব, দৈত্য এসব নামও ছিল না—ভেদাভেদও ছিল না। সবাই দেবলোক-বাসী, তাই দেবতা—সবাই মনুর সন্তান তাই মানব।

প্রথমে স্বর্গে সকলের নাম ছিল অসুর—তার পর হল কলহ। যাঁরা পৃথক দল গড়লেন অরি বিনাশের জন্য, তাঁরা সুরা খেয়ে হলেন সুর—অরি নাশ করে হলেন আর্য্য আর শেষে এলেন এই ভূলোকে—মাটির ধরণীতে—হলেন মানব। কিন্তু ভাববার কথা—যেখানে আগে ছিল শুধু ব্রহ্মার সৃষ্টি মনুর সন্তান সব, ছিল শুধু দেবতা—সেখানে দেবতা, দৈত্য আর দানব জাগলো কি করে?

দেবতা, দানব ও দৈত্য

প্রাচেতস দক্ষের তিন মেয়ে **দিতি, অদিতি** আর **দনু**। এ ছাড়া কদ্রু, বিনতা, সুরভি, খসা প্রভৃতি অন্য মেয়েও ছিল। ছেলে ছিলই না। দক্ষ বড় তিনটী মেয়েকে এমন একজনার হাতে তুলে দিলেন, যাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, আর যশে বিশ্ব তখন উদ্ভাসিত। সে বিখ্যাত পুরুষের নাম কশ্যপ – তিনি কর্দ্দমের সন্তান; থাকতেন মধ্য এশিয়ায়। মনে হয় তখন জায়গাটার নাম হয়েছিল "কশ্যপাগার"—যার থেকে হয়তো আজ 'কাশগর' নামের উৎপত্তি।

কশ্যপের তিন স্ত্রী হ'ল—দিতি, অদিতি ও দনু। দিতির গর্ভে হ'ল তিন ছেলে—**হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ**, এবং **মরুৎ**। দিতির সন্তান—তাই নাম হ'ল দৈত্য।

দ্বিতীয়া অদিতির গর্ভে হলেন **ইন্দ্র**, অর্য্যমা, দক্ষ, **ত্বষ্টা**, পুষা, **বিবস্বান**, সবিতা, মিত্র, **বরুণ**, অংশ, ভগ ও **বিষ্ণু**। ১২টী আদিত্য বা গ্রহের নামে ১২টী ছেলের নাম রাখা হ'ল। এই নাম রাখা দেখে মনে হয় পিতা কশ্যপ নিশ্চয় এদেরই ভালবাসতেন বেশী, কারণ দিতির ছেলের নামও জমকাল বটে, কিন্তু অদিতির ছেলের নাম কটাই সূর্য্যের নাম। আর তখন তো সূর্য্যই প্রত্যক্ষ দেবতা, তাই তার নামেই পরিচিত হ'ল অদিতির ছেলেরা—নাম হ'ল আদিত্য বা দেবতা। এদের মতন নাম বিভ্রাট তো এখনও হয়। বিশ্বনাথ, হলধর, ভীমনাগ—এসবই তো সাধারণ মানুষ, নামটাই না হয় ভারী। তবে এ নাম বিভ্রাট পুরাণে জট পাকিয়েছে কম নয়। এক বিষ্ণু নামটা নিয়ে—নানা গল্প তৈরী হয়ে গেছে। কারও মনই মানতে চায় না যে পরম-ব্রহ্ম বিষ্ণু, সূর্য্য বিষ্ণু, আর কশ্যপের ছেলে বিষ্ণু সব পৃথক পৃথক লোক।

তৃতীয়া কন্যা দনুর গর্ভে হলেন পুলোমা, স্বর্ভানু আর মৃকণ্ডু। দনুর ছেলে তাই নাম হল দানব। তাছাড়া সুরভির গর্ভে কশ্যপের ১১টী হ'ল ছেলে—নাম রাখা হ'ল একাদশ রুদ্রের। খসার গর্ভে হল কশ্যপের দুটী ছেলে—বিলোহিত আর বিকল। বিলোহিতকে দিয়ে যক্ষ বংশ আর বিকলকে দিয়ে হ'ল রক্ষ বংশের প্রতিষ্ঠা।

যক্ষ ও রক্ষ

এই যক্ষ ও রক্ষ নামের উৎপত্তি নিয়ে বেশ একটি গল্প আছে পুরাণে। একদিন কশ্যপ পুত্র বিলোহিতকে প্রশ্ন করলেন "তুমি পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে কি জান।" বিলোহিত বল্লেন "পৃথিবীর গতিকে যক্ষ অর্থাৎ কর্ষণ করাই আমার মত।" এখানে এই কর্ষণ মানে চাষ নয়—মানে হচ্ছে আকর্ষণ অর্থাৎ পৃথিবীকে সূর্য্যের চারিদিকে আকর্ষণ মানে প্রদক্ষিণ করান। কিন্তু অন্য পুত্র বিকলকে প্রশ্ন করায় তিনি বল্লেন—"না, আমি মাতাকে রক্ষা করতে চাই। অর্থাৎ তাঁর মতে পৃথ্বী রক্ষিত অবস্থায় স্থিরা—তারই চারদিকে গ্রহরা ঘুরছে"।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে নয়—সে যুগেই হল দুই দল—একদল বল্লেন পৃথিবী যক্ষ আর এক দল বল্লেন রক্ষ। এই দুই মত নিয়েই দুই দল হল যক্ষ ও রক্ষ। ভূত প্রেতের মতন তাঁরা অন্ত্যজ নয়।

সুর, অসুর ও আৰ্য্য

ঠিক এই রকম ভাবেই কলহের মধ্য দিয়ে একই দেবতা বা অসুর থেকে হলেন সুর, অসুর ও আৰ্য্য। আসলে এরা যে সবাই সমান। তার প্রমাণ—মহাত্মা ভৃগু, ঐ হিরণ্যকশিপুর কন্যা দিব্যাকে এবং দনুর পুত্র পুলোমার কন্যা পৌলোমীকে বিবাহ করেন। এমন কি এই পুলোমার অন্য মেয়ে দানব-নন্দিনী শচীই ইন্দ্রের স্ত্রী। অতএব এঁরা সবাই ছিলেন আৰ্য্য অর্থাৎ অরি নিপাতে একগোষ্ঠি ও বদ্ধপরিকর সবাই।

বংশের আদি পরিচয়

কশ্যপ, অত্রি, ভৃগু আর অঙ্গিরা থেকেই যত বংশ আর যত গোত্র। গোষ্ঠী-পনি থেকেই গোত্র কথাটির উৎপত্তি।

আদিত্য বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব মরুৎ, ভৃগু এবং অঙ্গিরা—এই আটটীই প্রথম দেবতা। এই আটজন দেব বা সুর বংশের গোড়ার লোক। তাদের মধ্যে আদিত্য, রুদ্র ও মরুৎ কশ্যপের সন্তান। সাধ্য, বসু ও বিশ্বদেব অত্রির সন্তান। ভৃগু থেকে ভার্গব এবং অঙ্গিরা থেকেই আঙ্গিরসগণ উৎপন্ন হ'ন।

এখন প্রশ্ন—এক গোত্র বা একই বংশের সন্তান—সমান তাদের মানসম্মান, তবু ঝগড়া কেন ? ঐ রাজ্যের লোভ, অর্থের লোভ, নারীর লোভ—এইগুলিই ভুবনে যত অনিষ্ট ঘটিয়াছে। সে এই মানুষের বেলায়ও যেমন, দেবতাদের বেলায়ও তেমনই। ধ্রুবর সময় কিন্তু সুর অসুর ভেদ হয়নি—প্রহ্লাদের সময় তাই হল। কিন্তু কেন হল ?

কশ্যপ ঋষির সন্তানদের মধ্যে হিরণ্যকশিপুই বড়। তাই অপুত্রক মাতামহ দক্ষর সিংহাসনে তিনিই বসলেন। হিরণ্যকশিপুর তখন প্রবল প্রতাপ। যেমন শক্তি—তেমনই বুদ্ধি, আবার অনাচার করতেও তেমনই ওস্তাদ। অথচ সবাই তাঁকে এমন ভয় করতো যে, তিনি যা বলতেন তাই শুনতে হ'ত সবাইকে। তাঁর মত আর পথই তখনকার আদর্শ ও অনুসরণীয়।—

"রাজা হিরণ্যকশিপুর্যাং যমাশাং নিষেবতে।
তস্মৈ তস্মৈ দিশে দেবা নমশ্চক্রুমহর্ষিভিঃ ॥"

—যেদিকে তিনি যেতেন সবাই সেই দিকে তাঁকে নমস্কার করতে করতে অনুসরণ করতেন।

হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ

কশ্যপ এক সময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন আর সেই যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য্য করান এই ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুকে দিয়েই।

সদাচারী হিরণ্যকশিপু—তবু দেবতা ঋষিদের উপরই যেন অসদ্ভাব অথচ দেবতা ঋষিদেরই পান তিনি নমস্কার—সহ্য হ'ল না অদিতির সন্তানদের। সবাই ইন্দ্রকে জ্যেষ্ঠের আসনে বসিয়ে ঠিক করলেন সিংহাসন নিতে হবে কেড়ে। ছোট ভাই বিষ্ণু তৈরী হ'য়ে গেলেন, পাঠালেন সব যোদ্ধা তাঁর বিরুদ্ধে—সুরু হ'ল যুদ্ধ।

যুদ্ধে প্রথম প্রথম তো দেবতাদের হয়ে যে সেনাপতি যান—সসৈন্যে তাঁরই হয় পতন। হিরণ্যকশিপু তো বটেই, তাঁর ছেলে প্রহ্লাদও সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ করলেন। দেবতারা হলেন পরাজিত।

এই সময়ে অসুররাই সিংহাসনে রইলেন—আর যাঁরা ইন্দ্র বিষ্ণুকে অগ্রণী করে অন্য দল গড়ে যুদ্ধে এগুলেন—নিলেন "সুর" উপাধি।

পুরাণেই সেই যুদ্ধ জয়ের শক্তি অর্জনের কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে আছে এই সুর দলের অমৃত খেয়ে অমর হবার কথা। হিরণ্যকশিপু তাঁদের ভাই, জ্ঞাতি, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ—তবু তাঁকে তাড়াতেই হবে—এমন স্বার্থের বিষেই, দেবতার দল ক্ষেপে উঠলেন সেদিন। সুযোগও হ'ল।

দুর্ব্বাসা ঋষি একদিন চলেছেন রাস্তা দিয়ে—হঠাৎ তাঁর গলায় পড়লো একগোছা পারিজাত ফুলের মালা। দুর্ব্বাসা মালাটি নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকেই দিলেন, আশীর্ব্বাদী উপহার রূপে। ইন্দ্র রাজার মতন রাজা—কিন্তু কি যে হল তাঁর, গলার মালাগাছা একদিন সখের হাতী ঐরাবতের গলায় দিলেন দুলিয়ে। জানোয়ারের বুদ্ধি—মালার জ্বালা সে যেন সইতে নারাজ—শুঁড় দিয়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেল্ল মালা মাটিতে আর তাই দেখে দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হ'য়ে অভিশাপ দিলেন—"এত অহঙ্কার রাজা হয়ে, রাজ্য তোমার ধ্বংস হয়ে যাবে অনতিকাল মধ্যে।"

সর্ব্বনাশ! দেবতারা ত ভয়ে মরে—বিষ্ণু বল্লেন "দেখ ও হবেই ঋষি বাক্য মিথ্যা হয়না, তোমরা ততক্ষণ রত্নাকর এই সমুদ্রকে মন্থন কর—উঠবে নানা রত্ন, আবার নূতন করে সাজাবে তোমাদের দেশ।"

এখন অভিশাপে যদি সারা দেশই যায় তবে অসুররাও ত শেষ হয়—তাই এ মন্থনে তারাও সাহায্য করতে তৈরী হল। দেব আর অসুর মিলে আয়োজন হল সমুদ্রমন্থনের। বিষ্ণু হয়তো সাধনার মন্থনে দুর্ভাগ্যের সাগর সেঁচে অমৃত তুলতেই বলেছিলেন। উঠলো সেই অমৃত যা সকলকে করে অমর। কিন্তু দেবতারা ফাঁকি দিয়ে নিজেরাই খেলেন সবটুকু অমৃত—হলেন অমর আর সোমরস বা সুরা পান করে হলেন সুর। অসুর যাঁরা, তাঁরা হলেন বঞ্চিত। স্বার্থের আঘাতে, একই বংশের বংশধর সুর আর অসুর দুই দল হয়ে গেলেন।

যাক্—হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে সুরগণের সেই যুদ্ধে প্রহ্লাদ দীর্ঘদিন দেবতা ও বিষ্ণুর সঙ্গে রোমহর্ষণ যুদ্ধ করেন। তবে কোন কোন পুরাণ বলেন, "প্রহ্লাদ ছিল পরম ভক্ত বৈষ্ণব, তাই 'হরি, হরি' ছিল তাঁর জপতপ। কিন্তু ছেলের মুখে নিরন্তর শত্রু দেবতার নাম শুনে হিরণ্যকশিপু খাপ্পা—শত্রু শ্রীহরির নাম করতে দেবেন না তিনি, ছেলেও তাই করবে,—শেষে রেগে বল্লেন পিতা 'কোথায় তোর হরি' প্রহ্লাদ বল্লেন—আমার হরি আছেন 'জলে অনলে পর্ব্বতে সর্ব্বত্র।" পরীক্ষার জন্য হিরণ্যকশিপু দিলেন প্রহ্লাদকে ফেলে জলে—হরি কোল পেতে বাঁচালেন, ফেল্লেন আগুনে—হরি আগুনে কোল পাতলেন, পাহাড় থেকে দিলেন ছুঁড়ে—ফুলের উপর পড়লেন প্রহ্লাদ—তখন পিতা বল্লেন "আছে এই দেওয়ালে তোর হরি?"—ভক্ত প্রহ্লাদ বল্লেন "নিশ্চয় আছেন"। মারলেন লাথি হিরণ্যকশিপু ঐ দেওয়ালে—অমনি দেওয়াল ভেঙ্গে বের হলেন "নৃসিংহ" বা নর-সিংহ"।

কেন অমন অদ্ভুত মূর্ত্তির অবতার, তাতো বলাই হয়নি। হিরণ্যকশিপু ছিলেন যথার্থ ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ ও সাধনায় বর পেয়েছিলেন যে দানব ও মানবের তিনি অবধ্য। তাই মানব বা দানবের অতীত ঐ নৃসিংহরূপী বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে বধ করলেন। ইন্দ্র রাজা হলেন। আর ভক্ত প্রহ্লাদ বিষ্ণুর করুণায় গেলেন ব্রহ্মালোকে বা বিষ্ণুলোকে।

এমন বিভিন্ন পুরাণে, বিভিন্ন কাহিনী হয়তো বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে বর্ণিত হয়েছে। অথবা বীর প্রহ্লাদ হয়তো যুদ্ধে শত্রুরূপে সমাগত ইন্দ্র-ভ্রাতা বিষ্ণুর মধ্যে দেখেছিলেন পরমব্রহ্ম বিষ্ণুকে। কখন যে জীবের ইষ্ট দর্শন হয়, কেমন করে—কোথায় হয় কে জানে ?

শেষ পর্য্যন্ত দেবতাদের চেষ্টায় আর শৌর্য্যে—ইন্দ্র দেবরাজ হলেন বটে, তবু তাঁকে কেউ মানতে চায়না। কেউ বলেন "হিরণ্যকশিপু ছিলেন ঋত্বিক শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক, কশ্যপ তো কই ইন্দ্রকে তাঁর যজ্ঞে ব্রাহ্মণের কাজ করতে দেননি—ও ইন্দ্রকে আমরা মানব না।" সে যুগে শক্তি ও অর্থের চেয়ে ধর্ম্মই বড় ছিল যে। তখন ইন্দ্র কি করেন। এলেন দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে, বল্লেন—"ঠাকুর আমাকে দ্বাদশাহ দ্বারা যাজন কর—আমাকে পবিত্র কর দীক্ষা দাও।" বৃহস্পতি ইন্দ্রের কথা রাখলেন, তাঁকে শুদ্ধও করলেন বটে কিন্তু প্রথমে তাতে রাজী হননি। কারণও ছিল তার। একবার এই ইন্দ্রই যে তাঁকে অপমান করেন। ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল । ইন্দ্র যখন রাজা হলেন তিনি চাইলেন তখন মৃগনক্ষত্র ধরে বৎসর শুরু হোক। বোধ হয় নিজের নামে অব্দ প্রচলন করার সখ তাঁরও হয়েছিল। বৃহস্পতি তাতে নারাজ। তিনি সৌর হিসাবে বৎসর গণনার জেদ ধরলেন। ইন্দ্র করলেন তাঁকে ত্যাগ।

নূতন গুরু হলেন বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ যজ্ঞ শুরু করলেন।

একদিন হঠাৎ ইন্দ্র দেখেন বিশ্বরূপ মাতামহ কুলেও যজ্ঞ ভাগ দিচ্ছেন। বিশ্বরূপের বাপ প্রজাপতি ত্বষ্টা দেবতা হলেও মা ছিলেন দৈত্য কন্যা রচনা। সেই মাতৃকুল যজ্ঞভাগ দেওয়ায় ইন্দ্র ক্রোধে ত্রি-শির বিশ্বরূপের তিনটি মাথাই কেটে ফেল্লেন। হ'ল গুরু হত্যা।

অনেকে বলেন দেবরাজ গুরু হত্যা করেননি। বিশ্বরূপের মতে ঐ যে মৃগ নক্ষত্র থেকে গণনা—তা ছেদন করলেন, মানে ত্যাগ করলেন। আবার অনেকে বলেন বিশ্বরূপের মাতৃকুলে যজ্ঞদান মানেই—তিনি যে বৎসর চালাতে চাইলেন তা ঐ মৃগনক্ষত্র বা কালপুরুষ থেকে। কিন্তু তাতে শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্র দেখলেন দেবতাদের কোনই লাভ নেই। উত্তরায়ণে দক্ষিণায়নে তো তা হ'লে একই হিসাবে দিনরাত চলবে—সব সমান হবে। এখানে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নটা বোঝা প্রয়োজন।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মতও বলে—বিষুবরেখার উত্তরে সূর্য্য গিয়ে মেরু প্রদেশের কাছে প্রায় ৬ মাস কাটায়। মেরুতে আনুমানিক ৭ই মাঘ থেকে ৬ই আষাঢ়—প্রায় ৬ মাস শুধু দিন। আমাদের ঋগ্বেদেও (২।১৬৪।১১) প্রায় এই কথা আছে। ৬ই আষাঢ়ের পর সে আসে দক্ষিণ মেরুর দিকে সেখানে কাটে ৬ই মাঘ পর্য্যন্ত।

সূর্য্যের উত্তর পথের যাত্রাই হ'ল উত্তরায়ণ বা দেবযান—দেবতাদের রাজ্যে তখন সূর্য্য, আর দক্ষিণে গেলে বলি দক্ষিণায়ন,—পিতৃযান সেটা।

ইন্দ্র রাজা, তিনি হয়তো চান তাদের গড়া শাস্ত্রে—শুধু দেবলোক, দেবযান, উত্তরায়ণ এই সব কথাই থাকবে—মানবলোক বা পিতৃলোকের কথা, দক্ষিণে সূর্য্যের কি কি গতি এসব কিছুই থাকবে না! গুরু বৃহস্পতিকে ত্যাগ করার পর বিশ্বরূপের ব্যবস্থাতেও তা হ'ল না দেখে দেবরাজ গেলেন রেগে। এই ঘটনাকেই মাতৃকুলে যজ্ঞ ভাগ দেওয়া, আর ঐ মত খণ্ডনকেই বিশ্বরূপের মস্তকচ্ছেদন বলে পুরাণে বর্ণিত হলেও বেদের পাতায় তা সৌর-গতির বর্ণনা মাত্র।

এই বিশ্বরূপ বধের পরিণামেই বৃত্রাসুর বধ। বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা পুত্রবধে ক্রুদ্ধ হ'য়ে বৃত্রাসুরের জন্ম দিলেন। প্রতিশোধের কামনা নিয়ে সৃষ্টি—মহা অসুর, মহা অত্যাচারী হ'ল সে। শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রের সিংহাসনই বুঝি যায়। ইন্দ্র বৃহস্পতির শরণ নিলেন। তখন বৃহস্পতি প্রভৃতি সকলে ধরলেন ত্বষ্টাকে। ত্বষ্টা দেখালেন "তাঁর ছেলে বিশ্বরূপের গণনা ভুল নয়। তবে কেন ইন্দ্র তাকে বধ করেছেন? তা ছাড়া দেবতারা অসুরদের অমৃত থেকে বঞ্চনা করলো কেন? কেন এসব অত্যাচার।" যাক্—শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্র অপরাধ স্বীকার করলেন। সিংহাসনের মায়া তো আছে! স্বীকার করলেন সব সর্ত্ত। তার মধ্যে প্রধান সর্ত্ত—দিনে বা রাতে, অস্ত্রে বা শস্ত্রে, বৃক্ষে বা প্রস্তরে, জলে কি স্থলে দেবতারা বৃত্রাসুরকে বধ করতে পারবে না।

সন্ধি তো হ'ল, কিন্তু দেবতারা পড়লেন ফাঁপড়ে,—তাই গোপনে চল্লো আবার অসুর নিধনের পরামর্শ। স্থির হ'ল—এমন অস্ত্র চাই যা না ধাতুর, না বৃক্ষের, না প্রস্তরের। কেউ বলেন, সমুদ্রের ফেনা নিলেন ইন্দ্র, কেউ বলেন বজ্র তৈরী করলেন তিনি, আর সে বজ্র

তৈরী করতে ব্রাহ্মণ দধীচি দিলেন নিজের দেহ। পরমত্যাগী ঋষির দেহ থেকে হাড় নিয়ে তৈরী হল বজ্র। সন্ধির সর্ত্তের বাইরে এ অস্ত্র,—না ধাতুর না প্রস্তরের। তারপর এক সন্ধ্যায়—যা দিনও নয় রাতও নয়—ইন্দ্র সদল-বলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, ঐ হাড়ে-গড়া বজ্র দিয়ে বধ করলেন বৃত্রকে। অস্থি-দানে হ'ল শত্রু বিজয়।

এই বৃত্র বধ, নরমেধ যজ্ঞ, সমুদ্র মন্থন, সবই মূল কাহিনী ধরে হয়তো কল্পনায় রঙীণ হয়েছে। তবু বলবো পুরাণের গল্প সবাই বুঝবে, মনে রাখবে, যুগের পর যুগ ধরে তা চলবে অনড় আর অচল হ'য়ে। মানুষের মন গল্প শুনতেই যে চায়।—ভাববার কথা বেশী বল্‌লে তারা ভয় পায়।

মহা-প্লাবন

যাক্ আমরা বেদের গল্প ধরেই বলি। হিরণ্যকশিপুর পর ইন্দ্র রাজা হলেন—কাশ্যপের বিবস্বান প্রভৃতি অন্য ছেলেরা হয়তো চলে যেতে চান অন্য দেশে, যেমন গিয়েছেন স্বয়ম্ভুবের পৌত্র আগ্নীধ্র। তাই বিবস্বানের দুই ছেলে বৈবস্বত ও সাবর্ণি মনু সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বের হ'বেন ঠিক করলেন অন্য দেশে। নেমে যেতে চাইলেন আরও দূরে।

কারণও ঘটলো—এর মধ্যেই স্বর্গে এলো আবার সেই বিপদ—মহা জলপ্লাবন। অসুরের ভয়তো দেবতাদের ছিলই, তার উপর এই বিপদ। চারিদিক জলে জলময়। এমন সময় একদিন বৈবস্বত মনু নদীজলে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে করতে জল-গণ্ডূষ হাতে নিতেই দেখলেন একটি মাছ তার মধ্যে। আশ্রয়ে নিপতিত জীব। বৈবস্বত তাকে নিয়ে রাখলেন এক কলসীতে; তারপর সে যখন আরও বড় হ'ল তখন তাকে ছেড়ে দিলেন সমুদ্রের জলে। মাছ ত্রাণ পাবার আনন্দে বলে গেল যাবার সময়—"আজ থেকে সাত দিন মধ্যে এ জগত সাগর জলে ডুববে, আসবে মহা-প্লাবন, সে সময় তুমি পাবে একখানি নৌকো, তাতে সব জীবের এক একটি মিথুন অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী নিয়ে তুমি যাত্রা করবে; কোন চিন্তা ক'রনা—আমি আসব, তুমি আমারই দেহে বেঁধে দিও সেই নৌকো—আমি নিয়ে যাবো তোমাদের পথ দেখিয়ে।"

তাই হ'ল, এল প্লাবন,—জল, জল আর জল। সব বুঝি যায়—সামনে বৈবস্বত দেখে নৌকো। সাগ্রহে উঠলেন সবাইকে নিয়ে। আগে

থেকে জোগাড় করে রাখা সব জাতের জীবের স্ত্রী-পুরুষ। নৌকো ভাসলো—যত এগোয়, তত জল। নেই হিমালয়, নেই উপত্যকা নেই কোন দেশ। নৌকায় চড়ে তাঁরা বেদ মন্ত্র গাইতে থাকেন—

"হে মরুরৎ! তুমি কর গো রক্ষা দিবস রাত্রি তরণী
নিরাপদে ত্রাণ কর আমাদের মঙ্গলময় শরণী"

এমন সময় দেখা গেল জলের মধ্যেই একটি উচ্চ শৃঙ্গ, তাতেই বৈবস্বত বাঁধলেন তাঁর নৌকো—নাম রাখলেন তার "নৌ বন্ধন"।

সেখানে নৌকা বাঁধবার পর সেই মৎস্যাবতার বলে গেলেন—"আমি বিধাতা—তোমাদের রক্ষা করলাম আর্য্য জাতিকে বাঁচাতে—রক্ষা করতে সৃষ্টি আর বুকে করে আগলে রাখতে এই বেদ।"

তাইত আমরা বলি :—"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্র-চরিত্রমখেদং
কেশব-ধৃত-মীন-শরীর জয় জগদীশ হরে।"

অজ্ঞান সাগর-জলে যখন সব ডুবে যায় তখন জ্ঞানকে ধারণ করে তো থাকেনই সেই পরব্রহ্ম! সেদিন ভারতের জ্ঞান রক্ষিত হ'ল।

কাশ্মীরে কারাকোরাম প্রদেশে কৌঁস নাগ বা কংস নাগ পর্ব্বতের এক চূড়ায় আজও আছে সেই মহাতীর্থ—"নৌ-বন্ধন" পর্ব্বত শৃঙ্গ, সেই অতীতে সারা ভারতীয় আর্য্যের পিতৃপুরুষদের আশ্রয়স্থল হয়েছিল।

আধুনিক মতবাদী অনেকে বলেন ও মাছ নয়—মাছের মতন দেখতে এক জাহাজ তৈরী করেই তাঁরা প্লাবন পার হয়েছিলেন।

প্রথম বহির্ভারতে যাত্রা

এখানে ভাববার কথা এই যে, বৈবস্বত মনু সুমেরুতে থাকতেই কি প্রলয় হয়েছিল? তবে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু ও বরুণ—দেবতা অসুর সবাই যে ডুবে যেত। মনে হয় অসুরের ভয়ে তাঁরা পালাতে গিয়ে পথে কোন দেশে এই বিপদ ঘটেছিল। বৈবস্বত মনুর দল তো এলেন ভারতের দিকে। কিন্তু কোথায় গেলেন তাঁর ভাই সাবর্ণি? নিশ্চয় তিনিও আর একখানা নৌকা করে অন্যদিকে পাড়ি দেন। অনেকে বলেন, তাকে তো আর মাছ সাহায্য করেনি—তাই জলের স্রোতে তিনি গেলেন পশ্চিমে, আর একটা পর্ব্বতে নিলেন আশ্রয়। বাইবেল বলে—নোয়া

নৌকো ক'রে ১৫০ দিন সাগরের বুকে ঘুরে আরারট পর্ব্বতে পৌছান। বাইবেলের এই "নোয়া" বা মুসলমানের "নু"—সেকি আমাদেরই সাবর্ণি ? কে জানে ? বেদে আমাদের এই পূর্ব্ব পুরুষ বৈবস্বত মনুকে বৈবস্বতয়ম্ বলেছেন—আর যম্ মানে আশ্রয়দাতা, পালক ও শাসক। মজা যে পারস্যের জিন্দাবেস্তায় প্রথম রাজার নাম ছিল "যিম"।

মহামেরু

প্লাবনের পর দেবসন্তানরা যেখানে প্রথম দাঁড়ালেন, তাকে ঋগ্বেদে বলেছে—তৃতীয় স্থান। প্রথম স্থান দেবতাদের স্বর্গ বা মেরু, দ্বিতীয় স্থান সুমেরু আর তৃতীয় স্থান এই মহামেরু। আজ সম্ভবতঃ সেই মহামেরুর নামই হয়েছে পামীর।

এই মহামেরুতে এসেই প্রথম আর্য্য বা দেব সন্তানরা নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। বেদে উদীচি বা উত্তর দিকের এই সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ আছে।

তা ছাড়া ব্যাসলিখিত মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়নের জীবনটাই এই মহামেরুর ঘটনায় জড়িত। মহাভারতেই আছে, যেদিন প্রথম ঋষিরা নতুন উপনিবেশ এই মহামেরুতে সমাজ গড়তে সুরু করলেন, সেইদিন ঘোষিত হ'ল যে—'অদ্য যিনি মহামেরুতে প্রতিষ্ঠিত এই সমাজে আসিবেন না—তিনি সাতদিনের পর ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইবেন"—অর্থাৎ পাপীরূপে একঘরে হবেন।

বৈশম্পায়নই মাত্র একজন যিনি ঐ সমাজে যোগ দিলেন না, সম্ভবতঃ ভারতের দিকে এগিয়ে আসবার বাসনায়, তিনি হয়তো সেই কাশ্মীরের পথেই এগিয়ে গেলেন।

এমনি ক'রে অসুরের ভয় আর প্রলয়ের বাধা এড়িয়ে আমাদের বাপ পিতামহের দল এসে দাঁড়ালেন এই ভারতবর্ষের বুকে।

তাঁদের সুখের কথা প্রচার হল মহামেরুতে, এলেন একদল নেমে—আবার সুমেরুতে সে কথা প্রচার হল—অন্য দল সেই সুমেরু থেকে যাত্রা করলেন ভারতের পথে। দিনের পর দিন, দলে দলে দেবসন্তানরা এসেছেন বৈবস্বত মনুর প্রতিষ্ঠিত এই মাটিতে—ভুবর্লোক থেকে ভূর্লোকে শান্তির কামনায়—পথে পথে গেয়েছেন বেদ গীতি—

"যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকং
তত্ত্বে আবর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে।
যত্তে দিবং যৎ পৃথিবী মনো জগাম দূরকং
তত্ত্বে আবর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে। (ঋক-১০ম)
—"সুদূর স্বর্গ তুল্য পৃথিবী, যেখানে গেছেন মনু
তথা যেতে চাই, যেন সেথা পাই ত্যজিতে মরণে তনু।"

এই মাটিতে বাস করার কী সে কামনা তাদের!

এই মাটিতে আসার আশায় বলে চলেছেন—স্বয়ং কশ্যপ মুনি—

যত্রজ্যোতিরজস্রং যস্মিল্লোঁকে স্বর্হিতং
তস্মিন্মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত ইংদ্রায়েংদো পরিস্রব।
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরিস্রব।
যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ
লোকাযত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরিস্রব।

"ওগো অমৃত-ক্ষরণ-শীল
যেথায় প্রচুর আলোক বর্ষে যে দেশ হিংসা শূন্য,
সে দেশে মোদের নিয়ে চল ত্বরা সে যে আমাদের পুণ্য,
চন্দ্র হে তুমি ক্ষরিত হইও ইন্দ্র দেহে।
যেথা আছে রাজা বৈবস্বত যেথা স্বর্গের দ্বার,
যেথা বয়ে যায় বহু নদ নদী সেথায় করগো পার,
—অমর করগো গেহে।
যে তৃতীয় লোক লীলা নিকেতন
কামীগণ যেথা করে বিচরণ
যে প্রদেশ সদা আলোক যুক্ত তথায় স্থাপহ মোরে,
মোর সন্তানসন্ততিগণে দীর্ঘ জীবন ক'রে॥"

* * * *

এমনই সব বেদ মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে দেবতারা এলেন মহান ভারতে।

'বিপুলা এ ধরণীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।

*   *   *

সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।

—রবীন্দ্রনাথ

মহান ভারতে এবার সুরু হবে ভূ সর্গ। এর আগে আমরা পেয়েছি মাটির মানুষের আগের কথা। ভূ নয়—স্ব-লোক ও ভুবলোকের কথা। পেয়েছি এক ব্রহ্মা, এক জ্যোতি—ভূ, ভুব, স্বর্লোকের প্রসবিতা শক্তি—যিনি ব্রহ্ম সৃষ্টি করলেন, যাঁকে আমরা জানলাম ব্রহ্মা ব'লে। তাঁরই লীলা—পরমাণু ও শক্তির মিলনে পঞ্চভূতের সংস্পর্শে হ'লো নবগ্রহ, নক্ষত্ররাজি, রাহু, কেতু প্রভৃতি, সৃষ্টির ক্রম-বিকাশ—কীট থেকে মানুষ।

প্রথমে স্বর্লোকে যাঁদের আমরা দেখা পাই, তাঁরা হলেন দেবতা, সৃষ্টির জনক ও জননী—ব্রহ্মা ও গায়ত্রী। তাঁদের সন্তান স্বায়ম্ভুব ও শতরূপা। এঁদের থেকেই নানা বংশের উদ্ভব হ'লো—আর ক্রমে ছড়িয়ে পড়লেন ভুবলোকে।

সেখানে এসেই তাঁরা দুদলে বিভক্ত হ'য়ে পড়লেন—দেব ও দানব। হিংসার ফলে হ'লো দ্বন্দ্ব—এল মহাপ্রলয়। দেবতারা এদিক-ওদিক পালালেন। একদল গেলেন সাগর পারে, আর একদল গেলেন ভারতে। ভারতে যাঁরা এলেন তাঁরাই আর্য্য। সিন্ধু দেশে এসে হলেন হিন্দু।

এই ভারতে আসা আর হিন্দু হ'য়ে হিন্দুস্থানে থাকার ইতিহাসই জুড়ে আছে এই ভূ-সর্গে।

ভারত-প্রবেশ
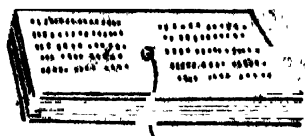
কশ্যপের সন্তানরা দ্যুলোক ছেড়ে এলেন ভূলোকে—মনুর সন্তান মাটির বুকে এসে হ'লেন মানব।

কিন্তু মানব তো শুধু ভারতের বুকেই বাসা বাঁধেনি আর আর্য্য বা হিন্দু হয়েই টিঁকে নেই। মানব আছে সারা বিশ্বে, নানা জাতে।

ভারতে যারা তারা হিন্দুস্থানের হিন্দু। তবে এই যে হিন্দু—এও আমাদের কোন বেদের কথা নয়; তবু আজ আর্য্য থেকে হিন্দু নামটাই চলে গেছে বেশী—সমাজ, কাল ও পরিবেশের প্রভাবে।

সিন্ধুনদীর তীরে যাঁরা এলেন প্রথম তাঁদের নাম সিন্ধু হলে কোন কথাই ছিল না, কিন্তু এমনই বিভ্রাট বাধে লোকের ভুল উচ্চারণে আর ভাষাগত সংস্কার নিয়ে যে অনেক উর্দ্দু, ইংরাজী কথা বেশ বাংলা হয়ে ঢুকে যায়। যেমন চীনে তৈরী হল আমাদের শর্করা, নাম হয়ে গেল চিনি। তেমনই কবে কে বা কারা 'স' কে 'হ' বলে "সিন্ধু" কে "হিন্দু" করে দিল, যার ফলে আর্য্য নামটার জায়গায় সিন্ধুর বদলে হিন্দু, ইণ্ডাস, ইণ্ডিয়া—সব হয়ে পড়ল। আজ ভারতের পরিচয় হিন্দুস্থান।

এখন হিন্দুই তো শুধু মানব নয়—আর আর্য্যরা শুধু ভারতেই এলেন না। তাঁরা গেলেন দিকে দিকে—সারা ভুবনময়। যেমন সাবর্ণি গেলেন ইজিপ্টে, তাঁর ছেলে ধৃতি ইজিপ্টে হয়ে বসলেন 'তেতা'। এমনই জার্ম্মানী, রাশিয়া, সুইজারল্যাণ্ড সর্ব্বত্র আমাদের ভারতীয় আর্য্যের শাখা আছে। হয়তো তাই হর্ম্মেহি থেকে বাইবেলের "হাম" যবস থেকে "যাফেৎ" প্রভৃতি নামের উৎপত্তি তবে তাঁরা যে প্রথম উপনিবেশ বসান ভারতে এতে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা পেলাম আমাদের দেশে নৌবন্ধন তীর্থে প্রথম বৈবস্বতকে। প্রথম শাসক হয়ে তিনিও হলেন মনু। আমরা সেই মনুর সন্তান—এই দেশের মানব। জল গেল সরে—কশ্যপ সন্তান প্রথম এসে ডাঙ্গায়

উঠলেন, ঘর বাঁধলেন, লীলা বা সংসারের খেলা সুরু করলেন যেখানে—সেই মেরুর নাম রাখলেন "কশ্যপমেরু"—কালে তাই হ'ল কাশ্মীর। চন্দ্রদেব লিখিত নীলমতপুরাণে কাশ্মীরের উৎপত্তির সর্ব্বপ্রথম যে ইতিহাস পাওয়া যায়, কাশ্মীরের নামকরণের কথা সেখানে এই রকম বলা হয়েছে—

কঃ প্রজাপতিরুদ্দিষ্টঃ কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ।
তেনাসৌ নির্ম্মিতো দেশঃ কাশ্মীরাখ্যো ভবিষ্যতি॥
কং বারি হরিণা যস্মাদ্দেশাদস্মাদপাকৃতম্।
কাশ্মীরাখ্যং ততো পশ্য নাম লোকে ভবিষ্যতি॥

কাশ্মীর হ'য়ে তারপর আর্য্যেরা নামলেন শতদ্রু নদীর তীরে, সিন্ধু নদের মোহানায়, পঞ্চনদীর সঙ্গমস্থলে পঞ্চ-অপ বা পঞ্জাবে।

তারপর ধীরে ধীরে তাঁরা একস্থান ছেড়ে অন্য দিকে এগিয়ে যান, নূতন জায়গায় "যজ্ঞ" কুণ্ড জ্বেলে সমাজ গড়েন, আশ্রম গড়েন, গোত্র ও বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর আবার দিনে দিনে সে বংশের হয় বিস্তার, বংশের এক এক ধারা যায় এক এক দিকে। জঙ্গল কেটে নগর বসান, নগরকে করেন রাজধানী, নূতন সমাজে নূতন শাসক আর নূতন মন্ত্র, নূতন গোত্র ও নূতন প্রবর পরিচিত হয়ে ওঠে। তাঁদের লেখা নূতন নূতন শাস্ত্র হয় লেখা—লেখা হয় বেদ নূতন নূতন ভাবে—নূতন নূতন উপনিষদ সংহিতা দর্শন।

এর মধ্যে আবার বাধা আসে আদিবাসী অনার্য্যের হাতে।

কিন্তু কে এই অনার্য্য, কবে এল তারা এই দেশে—এ ভাববার কথা। মনুর সন্তান যদি প্রলয়ের পর প্রথম চরণপাত করল এই ভারতে—কাশ্মীরের পথে হিমালয় ডিঙ্গিয়ে, তবে এরা এসে হাজির হল কবে, আর কারই বা সন্তান তাঁরা।

একটু ভাবলে এ জটিল সমস্যাটা কিন্তু সহজেই সরল হয়ে যায়।

সেই আগ্নীধ্রের যুগে যাঁরা এলেন সুমেরু ছেড়ে দক্ষিণে অথবা প্রিয়ব্রতর সাবর্ণি প্রভৃতি অন্য সন্তান সব যাঁরা গেলেন সাত সাগরের পারে, তাঁদের সবাই জাহাজে চড়ে বা নৌকায় করে ভেসে ভেসে সোজা যে পশ্চিমেই গেলেন, সাগরের ঢেউ যে তাদের কোন

সন্তানকেই দক্ষিণে এনে তখনকার ভারতবর্ষের বা জম্বুদ্বীপের দক্ষিণে বা তার পায়ের কাছে টেনে আনলো না তাই বা কে বলবে? তা যদি এসে থাকে তবে বৈবস্বত মনুর বংশধর বা কশ্যপের সন্তানের দলেরও বহু পূর্ব্বে পৌঁছে গেছেন তাঁরা জম্বুদ্বীপের দক্ষিণে, পশ্চিমে, পূর্ব্বে।

তাছাড়া আরও এক কথা মহাপ্রলয় বা মহাসৃষ্টিও তো কতবার হয়েছে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন কালে। যুগোৎপত্তি কি একবার হয়েছে? সত্য ত্রেতা দ্বাপরই কি একবারের? হয়তো একবারের মহাপ্রলয়ের ঢেউ কৃপা ক'রে কোন কোন দ্বীপের কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে। আর জম্বুদ্বীপ এই ভারতের দক্ষিণ দিকটা হয়তো তারই একটা টুকরো। তার মধ্যে রয়ে গেছে যারা, হয়তো তারা কালে ভারতের বুকে নানা শিক্ষা দীক্ষার পরিচয় দিয়েও ধীরে ধীরে দীক্ষার প্রসার না হওয়ায়—নৈতিক শুচিতা হারিয়ে হয়েছেন অনার্য্য। কিন্তু অনার্য্য হলেই অসভ্য হয় না। তার প্রমাণ আছে বেদে আর ঐ হারাপ্পা মহেঞ্জদাড়োর বুকে।

অনার্য্য ও অসভ্য

বেদের ঋক থেকে বোঝা যায় 'অনার্য্য' শব্দের অর্থ কোথাও কখনও 'অসভ্য' নয়। বেদের 'দাস' 'দস্যু'ই অনার্য্য। তারা অসভ্য বা মূর্খ ছিল না। শুধু ধর্ম্মহীনতা, কর্ত্তব্য-ভ্রষ্টের পাপে, অকর্ম্ম কুকর্ম্মে তাদের আর্য্য নামটা মুছে গেল—আর তাতেই হল অনার্য্য।

আর্য্য ও সভ্য, অনার্য্য ও অসভ্য এসব বুঝতে হলে এ কথাও জানতে হবে যে এই অনার্য্য আর আর্য্যের 'আর্য্য' শব্দটা আর অসভ্য আর সভ্যর 'সভ্য' শব্দটা এল কোথা থেকে। অভিধান অমরকোষে পাওয়া যায় "মহাকুল কুলীনার্য্য—সভ্য-সজ্জন সাধবঃ" মহাকুল, কুলীন, আর্য্য, সভ্য, সজ্জন ও সাধু, এ সবই এক কথা। তবে অনেকে বলেন অরি নিপাত করেছেন যাঁরা তাঁরাই আর্য্য। হয়তো তা ঠিক।—তবে বেদে আর্য্য কথাটা পাই আমরা একটু অন্য অর্থে। আর তাতে আর্য্য কথাটার মানে দাঁড়ায় "বিদ্বান স্তোতা"—অর্থাৎ যিনি আর্য্য তিনি আস্তিক, পরোপকারী, যাজ্ঞিক, সুতরাং সভ্য ও

সৎকর্ম্মাণি প্রকুর্ব্বীরন্নিতিধর্ম্মস্থনিশ্চয়ঃ।
"নিজধর্ম্মে ব্রতী রহি—না বিসর্জি আপন আচার
সৎকর্ম্মেতে যদি রহ স্থির নিজ নিজ ধর্ম্ম অনুসার
যাও—আর্য্য যত্রতত্র যাও।
আপনার নিবেশ বসাও॥"

তখন সারা ভারতে ধীরে ধীরে আর্য্য বংশ ছড়িয়ে পড়লো। অনার্য্যের সাথে হল যুদ্ধ। হল বহু রক্তপাত, বহু রাজ্যের পতন বহু রাজ্যের গঠন। কিন্তু সে সবই হল ধর্ম্মের কাঠামোর উপর। আর্য্যরা ধর্ম্মকে সবার উপরে ঠাঁই দিলেন।

এমন কি নিজ বাসভূমি এই ভারতবর্ষই যে স্বর্গ ও মুক্তি প্রাপ্তির একমাত্র উপযুক্ত স্থান, এই ভারতই যে জম্বুদ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তীর্থ, এইখানেই যে সত্য ত্রেতা দ্বাপরের সব লীলা, সব তপস্যা আর সব যজ্ঞ সাধন হয়েছে এর প্রমাণ দেখি পরাশরের উক্তিতেই। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপ মহাম্বয়ে
যতোহি কর্ম্ম ভূয়েষ ততোহন্য ভোগ ভূময়ঃ
অত্র জন্ম সহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম
কদা-চিন্নভবেৎ জন্তুমনুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ"।
"জম্বুদ্বীপের মাঝে, পারলৌকিক কাজে
হে ভারত—মহাগৌরবে ভরা ধর্ম্ম ক্ষেত্র তুমি,
অন্য ভূভাগ সদৃশ শুধুই নহেক ভোগের ভূমি,
হাজার হাজার জন্মের পর, বহুল পুণ্যে জন্মে সে নর
এ ভারত বুকে। তেমন দেশটি আর যে কোথায়ও নাই।
পুণ্যলাভের পরমতীর্থ—ধন্য এ পূত ঠাঁই॥"

এই ভারত-স্তুতি কণ্ঠে নিয়ে সেদিন আর্য্য সন্তানগণ বংশ বিস্তারে, রাজ্যশাসনে, ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে এই ভারতকে এমনই লোভনীয় করে তুলেছিলেন, যে স্বর্গের দেবতাগণ ছুটে আসতে চেয়েছিলেন এই মহান ভারতের বুকে, সেকি আমাদের কম গৌরবের কথা!

আর্য্য-বংশ-বিস্তার

স্বর্গের দেবতা ইলাবৃত বা স্বর্গপুরী ছেড়ে সুমেরু, মহামেরু পার হয়ে এলেন ভারতে। কশ্যপের বংশধর বৈবস্বতই প্রথম। সপ্তম মনুরূপে কশ্যপ মেরু বা কাশ্মীরে প্রথম উপনিবেশ বসালেন।

ক্রমে ক্রমে পুত্রের পর পৌত্র—তার নানা শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়লো ভারতে ও বহির্ভারতে। একটু একটু করে তাঁরা জঙ্গল কাটেন, উপনিবেশ বসান, অগ্নিস্থাপন করেন, যজ্ঞ করেন। যজ্ঞস্থলে এসে জড় হয় সবাই—তার মধ্যে উপযুক্ত লোককে 'যম' 'রাবণ' 'কাকুস্থ' প্রভৃতি উপাধি দিয়ে শাসনের ব্যবস্থা করে আবার এগিয়ে চলেন সামনে নতুন জঙ্গল কাটতে. নতুন উপনিবেশ বসাতে, নতুন রাজ্য আর রাজা প্রতিষ্ঠা করতে।

ধীরে ধীরে এমনি করেই হলো ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য—এমনি করেই হলো অযোধ্যা, বৈশালী, বিদেহ, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, আবার এমনি ক'রেই হ'লো নতুন নতুন বংশ—সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, যাদব, হৈহেয়, কৌরব, পৌরব, চেদী সব।

তবে সকলের আগেই ঐ বৈবস্বত মনু। অনেকে বলেন, ভারতে এসে তিনিই 'যম' উপাধি গ্রহণ করেন।

বৈবস্বতই যে যম এর প্রমাণ আছে কঠোপনিষদে—নচিকেতা নামক রাজার যমের নিকটে যাওয়া আর নানা উপদেশ গ্রহণ করার প্রসঙ্গে। তাছাড়া রামায়ণে আছে রাবণ একদা দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়ে যমের পুরীতে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সেখানে তিনি যম-পুরীতে অপরাধীদের নানা রকমের শাস্তি দেখেন।

এখন এ রাবণ লঙ্কেশ্বর না রাবণ উপাধি পাওয়া কোন রাজা কে জানে, তবে সম্ভবতঃ প্রায় এর ৩০০০ বৎসর পরে রামচন্দ্রের জন্ম। আর সে বিচারে মনে হয়, যমের মতন সে রাবণও উপাধি ছিল আর এই বর্ণনা থেকে যমের নরক বর্ণনা সুরু হয়েছে।

• সূর্য্য-বংশ •

বিবস্বান থেকে বৈবস্বত আর বিবস্বান সূর্য্যেরই এক নাম—তাই ধারণায় এই বংশটির সূর্য্য থেকেই উদ্ভব।

রাজা ইক্ষ্বাকু

যাই হোক, বৈবস্বত মনুর পর রাজা হলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র **প্রসন্ধি**। তারপর তাঁর পুত্র **ক্ষুপ**। এই ক্ষুপের পুত্র ইতিহাস-খ্যাত **ইক্ষ্বাকু**। এই **ইক্ষ্বাকু** সম্ভবতঃ হিমালয়ের ইক্ষামন গিরিপথ দিয়ে সিন্ধু প্রদেশের বাইরে গিয়ে সাযাক নদীর তীরে কাশ্মীরের পাশে এক রাজ্য গড়ে তোলেন। সম্ভবতঃ প্রাচীন অযোধ্যা সেই রাজ্য, আর সাযাক সরযূ নদীরই অপভ্রংশ।

শতপথ ব্রাহ্মণের মতে ও অন্যান্য পুরাণে বৈবস্বত মনুরই নয় পুত্র—**ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্যাতী, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভানেদিষ্ট, কারুষ, পৃষধ্র** আর একমাত্র কন্যা **ইলা** থেকেই চন্দ্রবংশের উদ্ভব।

ইক্ষ্বাকুর ছিল একশো ছেলে। তার মধ্যে কয়েকজন গিয়ে শাকদ্বীপে বসবাস করেন। অনেকে বলেন এই শাকদ্বীপই নাকি বর্ত্তমান রাশিয়া। আর—এক ছেলে **নিমি**। বিদেহ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। **মিথি** হলেন তাঁর পুত্র—তাঁরই নামানুসারে রাজধানীর নাম হ'লো মিথিলা। ইক্ষ্বাকুর অপর এক পুত্রের নাম **দণ্ড**। তিনি সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যে গিয়ে দণ্ডকারণ্যে রাজ্যস্থাপন করেন। আর কুক্ষী বা **বিকুক্ষী** নামক আর এক পুত্র হলেন সে দেশের রাজা। অনেকের মতে রাজা ইক্ষ্বাকু ৫৫০২ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

এর অনেক পরে আমরা দেখতে পাই পরঞ্জয়কে। তিনি যখন রাজা, দেবলোকে তখন দেবতাদের যুদ্ধ চলছে অসুরদের সঙ্গে। **এই পরঞ্জয়** ভারত থেকে সৈন্য পাঠালেন ইন্দ্রকে আর নিজে এসে দাঁড়ালেন হিমালয়ের এক 'ককুদে' অর্থাৎ শিখরে, অসুরদের গতিরোধে।

এই দেবাসুর যুদ্ধে তিনি সাহায্য করেছিলেন বলে, ইন্দ্র তাঁকে **'কাকুস্থ'** উপাধি দিয়েছিলেন। 'কাকুস্থ' মানে ককুদস্থ বীর।

রাজা পরঞ্জয়ের পরেই রাজা হলেন **কুবলাশ্ব**। ঐতিহাসিকেরা বলেন তিনি ৪৭৩৪ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

সেচ বিভাগ

এই সময় থেকেই ভারতে আর্য্যগণ অনেকরকম শিল্পের নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। সামাজিক উন্নতিও হয় এই সময়। সেচ বিভাগের কাজ এই সময় থেকেই হয় সুরু।

হিমালয়ের জল-প্রবাহ সর্ব্বত্র সমানভাবে বয়না—কোথাও প্রবল, কোথাও জলের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না। এই জলবিহীন স্থানগুলি মরুভূমির মতো শুষ্ক। এই জলকে সর্ব্বত্র সমানভাবে পেতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত সেচের।

প্রজারা গেলো রাজা কুবলাশ্বের কাছে। কুবলাশ্ব সেচের প্রবর্ত্তন করলেন। এই সেচের চরম উৎকর্ষ দেখি আমরা পরবর্ত্তী রাজা ভগীরথের সময়। রাজা কুবলাশ্ব কশ্যপমেরুর নীচে সাতটি নদী খনন করালেন। এই সাতটি নদী হ'লো—সিন্ধু, সুষোমা, বিতস্তা, অসিক্লী, রাভি (পরবর্ত্তী নাম বিপাসা) এবং শতদ্রু। একই ভূভাগের উপর দিয়ে তখন বয়ে চললো সাত নদী—নাম হ'লো সপ্তসিন্ধু। এই সপ্তসিন্ধুর দুটি নদী কোথাও কোথাও আবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে—সেখানে পঞ্চনদী, এই পঞ্চনদী থেকেই বোধ হয় পঞ্জাব নাম হয়েছে। সেচ-কার্য্যের পূর্ব্বে নদীবিহীন মেরু প্রদেশ ছিল, তা নিয়ে বেশ মজার গল্প আছে।

ধুন্ধুমার

মহর্ষি উতঙ্ক এই মেরুপ্রদেশে করছিলেন তপস্যা। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু বর দিতে চাইলেন। তিনি বর চাইলেন, প্রয়োজনে নিজ যোগ-শক্তির প্রভাব যেন অপরকে দিতে পারেন।

বিষ্ণুর কৃপায় সেই শক্তি তিনি লাভ করলেন।

ধুন্ধু ছিলো মধুকৈটভের পুত্র। সে এসে উপদ্রব করতো উতঙ্কের আশ্রমে। শেষে উত্যক্ত ঋষি রাজা কুবলাশ্বের শরণ নেন।

কুবলাশ্বের ছিল একুশ হাজার পুত্র। সেই একুশ হাজার পুত্র হানা দিল মরু প্রান্তরে। ধুন্ধু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো—সে ঝড়ের বেগে বালি উড়িয়ে সব অন্ধকার করে দিলে, সূর্য্যকেও দিলে ঢেকে। ধুন্ধুকে দেখা গেলো না। কোথায় ধুন্ধু ? সে তখন বালির নীচে

রয়েছে লুকিয়ে। একুশ হাজার সন্তান তখন বালি খুঁড়তে শুরু করলো। কিন্তু ধুন্ধুর মুখাগ্নিতে সেই একুশ হাজার সন্তান পুড়ে মরে গেলো। কিন্তু উতঙ্কের যোগ-শক্তি লাভ ক'রে কুবলাশ্ব অসাধ্য সাধন করলেন। ধুন্ধু নিহত হ'লো। এই ধুন্ধুকে বধ ক'রে কুবলাশ্ব 'ধুন্ধুমার' উপাধি পেলেন। এ হলো পৌরাণিক গল্প।

কিন্তু আধুনিক ব্যাখ্যা করলে আমরা পাই—একুশ হাজার পুত্র মানে প্রজা। সেকালে রাজারা প্রজাদের সন্তান ব'লেই জানতেন। এই একুশ হাজার শ্রমিকরাই সেদিন বালি খুঁড়ে 'ধুন্ধু'কে নাশ করেছিলো। ধুন্ধু অর্থে উত্তাপ—তা নষ্ট হয়েছিলো বালি খুঁড়ে জল আনার ফলে। উষর মেরু হ'লো সরস। ফলে-ফুলে-বৃক্ষলতা-দিতে ভরে উঠলো শুষ্ক মরুপ্রদেশ। ব্রহ্মাবর্ত্তের পাশে আর্য্যরা এই জল আর মাটি পেয়ে দক্ষিণে রাজপুতানা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করলেন।

এই ব্রহ্মাবর্ত্তের পূর্বদিকে ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ—আর ব্রহ্মর্ষি দেশের পূর্বভাগ অর্থাৎ প্রয়াগ পর্য্যন্ত হলো মধ্য দেশ।

এই ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি আর মধ্য দেশ নিয়ে আর্য্যরা গড়ে তুললেন আর্য্যাবর্ত্ত, যেখানে হলো মনুসংহিতা রচনা। মনুসংহিতার হিসাব ধরলে হয়তো আর্য্যাবর্ত্ত প্রতিষ্ঠার কাল ৪৮০০ বা ৪৯০০ খৃঃ পূর্ব্ব। মনুসংহিতায় খৃঃ পূঃ নেই—তবে সময়ের নির্দ্দেশটা আছে। আর লেখা আছে যে হিমালয়ের নীচে ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মাঝে ছিল সমুদ্র, আর্য্যরা আসবার পর অগস্ত্যদ্বারা সে সমুদ্র শোষণ করে, সেচ দ্বারা বালুকে সরস করা হয়। বায়ু পুরাণে আছে রাজা কুবলাশ্ব সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীকে সে ভূভাগে বইয়ে দেন। মনে হয় যমুনাও সেই সেচ বিভাগেরই দান। কুবলাশ্বের পর আরও তেরজন রাজা হলেন এবং শেষ রাজা হলেন উষদশ্ব। এই উষদশ্বের সঙ্গে বিয়ে হ'ল চন্দ্রবংশের রাজা যযাতির মেয়ের।

মান্ধাতা ও ত্রসদস্যু

সূর্য্যবংশীয় রাজা উষদশ্বের পৌত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের সঙ্গে বিয়ে হ'লো চন্দ্রবংশীয় রাজা রন্তিনারের কন্যা গৌরীর সঙ্গে। তাঁদের ছেলে হ'লো মান্ধাতা। তাঁর জন্মকথা অদ্ভুত।

চ্যবন মুনির অসাধারণ যোগ-শক্তির কথা তখন সকলেই জানে। নিঃসন্তান যুবনাশ্ব পুত্র-কামনায় এই মুনির আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুনি পূর্বাহ্নেই জানতে পেরে রাণীর জন্যে মন্ত্রপূত জল ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু পিপাসার্ত রাজা সকলের অজ্ঞাতসারেই সেই জল পান করেন। মুনির মন্ত্রপূত জল ব্যর্থ হবার নয়। সেই জলপান ক'রে রাজারই হ'লো গর্ভ। রাজার অঙ্গ থেকে মান্ধাতা জন্মগ্রহণ করলেন। কিন্তু শিশুর মাতৃ-দুগ্ধ জোগাবে কে? ইন্দ্র নিজের আঙ্গুল দিলেন ছেলের মুখে। বললেন 'মাংধাস্যতি'—আমাকে পান করো। এই 'মাংধাস্যতি' শব্দ থেকেই মান্ধাতা নামের উৎপত্তি।

চন্দ্রবংশীয় শশবিন্দুর কন্যাকে ইনি বিবাহ করেন।

মান্ধাতা হয়তো ৪৩২৬ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময় সম্ভবত তিনি শ্বশুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে পৌরব বংশ, দ্রহ্যুবংশ এবং তুর্বসু বংশের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নেন।

এর পরই আমরা ইতিহাসখ্যাত মহারাজা **পুরুকুৎস** ও তাঁর পুত্র ত্রসদস্যুর কথা জানতে পারি। বেদে আছে গিরিক্ষিৎ রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় পুরুকুৎসের। তখন বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে দুটি জাতের আমরা পরিচয় পাই। একটি 'নগ' অর্থাৎ পর্বতবাসী নাগ, দ্বিতীয় গন্ধর্ব বা বর্তমান দ্রাবিড়। এই নগবাসী নাগদের সঙ্গে বহুদিন দেব-মানব-গন্ধর্বের যুদ্ধ হয়। নাগ অর্থে সাপ—এ রূপক গল্প। কাশ্মীরে, মণিপুরে—যেখানে পর্বত বা 'নগ'—সেখানেই এই নাগজাতির জন্ম। উলুপী, বভ্রুবাহন তার পরিচয়।

আর্য্যদের আসবার আগেই এখানে গন্ধর্বদের সভ্যতা বিস্তার হয়—তাই নগবাসী নাগাদের সঙ্গে এদের ঝগড়া চিরন্তন।

ঋগ্বেদে আছে দুর্গহ নামে এক নাগের ছেলেকে দ্রাবিড়রা বন্দী করে—ত্রসদস্যু তাকে উদ্ধার করেন। (ঋগ্বেদ ৪।৪২।৮)।

ত্রসদস্যু পুরাণোক্ত বিখ্যাত রাজা। কিন্তু এই নামে আরও এক রাজার কথা আমরা জানতে পারি। জন্মেজয়ের এক ছেলের নামও ত্রসদস্যু। তাঁর সময় সুদাস কর্তৃক ভারত আক্রমণ হয়।

অগস্ত্যের সমুদ্র-শোষণ

কালীয় দস্যুর উৎপাতে ঋষিরা তখন সন্ত্রস্ত। ভরদ্বাজ এলেন প্রয়াগে, অগস্ত্য মুনির কাছে। তিনি এক গণ্ডূষে সাগর পান ক'রে কালীয় নিধন করলেন। সমুদ্র ছিলো তখন সমগ্র বিন্ধ্যাচল জুড়ে প্রয়াগ পর্য্যন্ত। এক গণ্ডূষে সাগর পান করার কাহিনী রূপক হ'লেও, এর আধুনিক ব্যাখ্যা এই করা যায়—অগস্ত্যও ছিলেন সেচ বিভাগের কারিগর। তিনি সমুদ্রের গতি অন্যপথে চালিত করলেন।

কালীয় হ'লো একপ্রকার জীবাণু। এই বিষ-বীজ সংক্রামিত হয়ে মহামারীরূপে ব্যাধি দেখা দিল—এতেই ঋষিরা বিপন্ন হয়েছিলেন। আবদ্ধ জলকে যিনি গতি দিলেন তিনিই অগস্ত্য। গতি স্ত্যায়িত মানেই হ'লো, রুদ্ধ গতিকে যিনি অন্যত্র চালনা করেন। আর কালের মতন ভয়ঙ্কর সেই জীবাণুকে বলা হ'তো কালীয় দস্যু।

এই অগস্ত্যমুনি সম্বন্ধে আরও একটি মজার গল্প আছে। ধ্যানযোগে তিনি একদিন দেখতে পেলেন, তাঁর পূর্ব্বপুরুষরা মুক্তি অভাবে শূন্যে অবস্থান করছেন। তাঁরা বললেন, তুমি বিবাহ কর—তোমার পুত্রের হাতের পিণ্ড না হলে আমাদের মুক্তি নাই।

অগস্ত্য বিপদে পড়লেন। তাঁর উপযুক্ত কন্যা কোথায়? বিদর্ভ রাজা ছিলেন নিঃসন্তান। সন্তান কামনায় তিনি যজ্ঞ করলেন—সেই যজ্ঞের হোতা হলেন অগস্ত্য। যজ্ঞ প্রভাবে রাণীর হ'লো এক সন্তান। এ কন্যা অগস্ত্যেরই মানসী কন্যা। অগস্ত্যই নাম দিলেন লোপামুদ্রা। লোপামুদ্রা যৌবনপ্রাপ্ত হ'লে মুনি বললেন, এ আমার মানসী—একে আমার হাতেই সম্প্রদান কর।

বল্কল পরিহিতা লোপামুদ্রা এলেন ঋষির ঘরে। কিন্তু ঋষি তাঁকে শয্যায় আহ্বান করতে পারলেন না। লোপামুদ্রা বললেন, বল্কল-পরিহিতা কামিনী কখনো শয্যা-সঙ্গিনী হ'তে পারে না।

ঋষি প্রমাদ গণলেন। কোথায় পাবেন তিনি বসন-ভূষণ। কার কাছে চাইবেন অর্থ? অর্থ তাঁর কাছেই চাইতে পারেন, যিনি অর্থ দিতে কুণ্ঠিত হবেন না, প্রজারা পাবে না অর্থ কষ্ট। এলেন ঘুরতে ঘুরতে ত্রসদস্যুর কাছে। জানালেন তাঁর আগমনের কারণ। কিন্তু

আয় ব্যয়ের হিসাব শুনে অগস্ত্য ফিরে গেলেন। এলেন প্রহ্লাদের বংশধর ইল্বল ও বাতাপির কাছে। বহু ধনৈশ্বর্য্য তাঁদের। অশক্ত রাজারাও সঙ্গে এলেন মজা দেখবার জন্যে। দৈত্য বংশধর ইল্বল মুনির জীবন-নাশের ষড়যন্ত্র করলেন। বাতাপিকে মেষ বানিয়ে সেই মাংস মুনিকে দিলেন খেতে। সর্ব্বজ্ঞ ঋষি সবই জানতে পারলেন। ইল্বলের মতলব, বাতাপি ঋষির পেট ফুঁড়ে বার হবে। ইল্বল চীৎকার ক'রে বাতাপির নাম ধ'রে ডাকতে লাগলেন। ঋষি হেসে বললেন, সে হজম হয়ে গিয়েছে। ইল্বল বাতাপির জীবন দানের জন্য ঋষিকে অনুরোধ করলেন—ঋষি বাতাপিকে বাঁচালেন। তখন ইল্বল বাতাপি, প্রত্যেকে ঋষিকে দশহাজার গরু ও দশহাজার স্বর্ণমুদ্রা দিলেন, আর দিলেন একটি স্বর্ণরথ ও দুটি ঘোড়া।

ঋষি অগস্ত্য এই ঐশ্বর্য্য নিয়ে ফিরে এলেন তাঁর আশ্রমে। লোপামুদ্রা হাসতে হাসতে তাঁর অঙ্কশায়িনী হলেন।

অগস্ত্যের হ'ল এক পুত্র। এই পুত্রই কালে একজন মহা কবি এবং তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ হয়েছিলেন।

অগস্ত্য সংসারধর্ম শেষ ক'রে যাত্রা করলেন দক্ষিণ ভারতে।

আর্য্যাবর্ত্তে তখন হিন্দু ধর্ম্ম বা আর্য্যধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দক্ষিণে তখনও অনার্য্যের দল। তাই গেলেন দক্ষিণে। এ নিয়েও এক গল্প আছে।

মহাদর্পী বিন্ধ্য তার পর্ব্বত-শৃঙ্গ এত উঁচু করেছিলেন যে সূর্য্য তাকে ডিঙ্গিয়ে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে পারেন না। ভারতের একার্দ্ধ অন্ধকার হয়ে থাকে। দেবতারা পেলেন ভয়। হয়তো ভারতের অপরার্দ্ধের অনার্য্যদের অজ্ঞানান্ধকার নিয়েই এ কল্পনা। এ কাহিনী জ্যোতিষ-বিদ্যার এক অপূর্ব কাহিনী। অগস্ত্য ছিলেন মহাজ্ঞানী। ৬০০০ হাজার বছর আগেও তিনি কর্কট ক্রান্তির প্রকৃত স্থান নির্দ্ধারণ করেন। সে সময়ে ছিল দুটী মত। একদল বলতেন যে কর্কট ক্রান্তি বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে অতএব সূর্য্য দক্ষিণে যেতে পারেন না। অন্যদল বলতেন, না কর্কট ক্রান্তি বিন্ধ্যের উত্তরে অতএব সূর্য্য বিন্ধ্য-পর্ব্বত পার হবেই।

মহাঋষি অগস্ত্য গণনা করে দেখলেন, কর্কট ক্রান্তি রেখা বিন্ধ্যের উত্তরে। অতএব সূর্য্য বিন্ধ্য পর্ব্বত পার হবেই। এটাই হয়তো রূপকে দাঁড়িয়েছে—বিন্ধ্যের দর্প-চূর্ণ।

সে রূপকের গল্প এই যে— দেবতারা বল্লেন, সূর্য্যদেবের গতি-রোধ যাতে না হয়, অগস্ত্যকেই তার উপায় করতে হবে। অগস্ত্য বল্লেন "তথাস্তু, সকলের যদি উপকার হয়— অন্ধকার যদি দূর হয় তবে নিশ্চয় তিনি তা করবেন।"

এই কামনা নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন। পথে বিন্ধ্য-পর্ব্বত মুনিকে প্রণাম করে বল্লেন 'কি চাই প্রভু? কি দেবো আপনার চরণে পাদ্যঅর্ঘ্য। অগস্ত্য হেসে বল্লেন—"দেবে যদি, তবে আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত অমনি মাথা নত করে থাকো। আমি তৃপ্ত হব"।

বিন্ধ্য তাই করলেন—অগস্ত্য চল্লেন দাক্ষিণাত্যে।

আর তিনি ফেরেননি আর্য্যাবর্ত্তে। পরের জন্য, জাতির জন্য, দেশের জন্য মহাঋষি সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন—দূরে দক্ষিণ ভারতে। সেই যাওয়াই হলো তাঁর শেষ যাওয়া। বিন্ধ্য মাথা নত করেই রইলো, আর উঠলো না। সে দিনটি ছিল ভাদ্র মাসের প্রথম দিন। তাই আজও মাসের পয়লাকে লোকে বলে অগস্ত্য-যাত্রা। বিন্ধ্য-পর্ব্বতের এই নীচু হওয়া মানে তার দর্প চূর্ণ। আজও সে বেচারা অগস্ত্যের আশায় মাথা নীচু করেই আছে। নইলে অতবড় দীর্ঘ পর্ব্বত বড় একটা দেখা যায় না কিন্তু মাথা তার কত নীচু।

ত্রসদস্যুর পর যাঁর কথা আমরা পাই তিনি হলেন কুরুশ্রবণ। তবে এঁর নাম পুরাণে নেই। শুধু ঋষিরূপে ঋগ্বেদে এঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনিই প্রথম সমতল গাঙ্গ প্রদেশে বসবাস সুরু করেন। ইক্ষুমতী নদীর তীরে তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। হয়তো সেই রাজ্যই কুরুজাঙ্গল বা কুরুক্ষেত্র।

তারপর রাজা ত্রয্যারুণের গল্প পাই মহাভারতে। ছেলে তাঁর সত্যব্রত, কিন্তু একদিন তিনি সদ্য বিবাহিতা এক কন্যাকে সপ্ত-পদী করণের আগেই হরণ করেন। রাজা রেগে আগুন। ছেলে বল্লে, "সপ্তপদী না হ'লে তো বিবাহ সিদ্ধ হয় না—তাই এই কাজ

করেছি।" রাজা বল্লেন "হরণ যে অন্যায়। তোমাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিলাম।" পুরোহিত বশিষ্ঠ তাতে বাধা দিলেন না কিন্তু বিশ্বামিত্র সত্যব্রতকে দক্ষিণ দিকে এক রাজ্য দান করলেন। ভাগবত আর শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় যে তাঁর সেই রাজ্যই আজকের দ্রাবিড়।

ভাগবতে আছে আবার এক বড় রকমের প্লাবন দেখা দেয় এই দ্রাবিড়ে। বিশ্বামিত্র তাকে উত্তরের পর্ব্বতে নিয়ে এসে নামান। বিশ্বামিত্র বিন্ধ্য-পর্ব্বতে থাকতেন—ঠিক দ্রাবিড়ের উত্তরে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে প্লাবন আর আর্য্যাবর্ত্তকে ভাসায়নি এই অনেকের মত। কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে বা বর্ত্তমান পণ্ডিতরাও সে কথা বলেন না। তাঁরা বলেন ঐ প্লাবন হিমালয়ের প্রান্তেই হয়েছিল।

সে যাই হোক, পার্ব্বত্য দেশে সত্যব্রত আশ্রয় নেন। এবং প্লাবনের পরে পিতা ত্রয্যারুণের মৃত্যুর পর তিনি পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করেন।

এই সত্যব্রতই মহাভারত-খ্যাত রাজা হরিশ্চন্দ্রের পিতা।

সত্যব্রতর পর রাজা হলেন মহারাজ হরিশ্চন্দ্র।

রাজা হরিশ্চন্দ্র

মহাভারতে আছে—হরিশ্চন্দ্র একদিন মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে রমণীর ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেয়ে রাজা সেখানে ছুটে গেলেন। দেখলেন, এক কাননাভ্যন্তর থেকে এই কান্নার শব্দ ভেসে আসছে।

এই কাননে গোপনে দেবকন্যারা আসতেন নিয়মিত ফুল তুলতে। এক দিন তাদের দেখে বিশ্বামিত্র ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে মন্ত্রবলে দেবকন্যাদের সেই ফুলবনে আটক করলেন। নিজেদের মুক্ত করবার কোনো উপায়ান্তর না দেখে তাঁরা চিৎকার ক'রে কাঁদতে লাগলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র সে কান্না শুনে তাঁদের মুক্ত করলেন। বিশ্বামিত্র ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হলেন। তপস্যা প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ ক'রেও ক্ষত্রিয়ের ক্রোধকে তিনি জয় করতে পারেন নি। রাজা অপরাধ স্বীকার করলেন কিন্তু বিশ্বামিত্রের ক্রোধ দমিত হ'লো না।

রাজা বললেন, দণ্ডস্বরূপ আপনি যা চাইবেন, আমি তাই দেবো।

বিশ্বামিত্র বললেন, দেবে যদি আমাকে ত্রিভুবন দাও।

দাতা হরিশ্চন্দ্র তাঁকে ত্রিভুবন দেবার অঙ্গীকার করলেন।

রাজা রাজ্য ছাড়লেন কিন্তু ত্রিভুবন ছেড়ে যাবেন কোথায়? একমাত্র কাশী হ'লো ত্রিভুবনের বাইরে—শিব-প্রতিষ্ঠিত কাশীধাম।

রাজা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পথে এসে দাঁড়ালেন।

বিশ্বামিত্র বললেন, কিন্তু আমার দক্ষিণা? দক্ষিণা না দিলে দান সম্পূর্ণ হবে না।

নিঃস্ব রাজা কোথায় পাবেন দক্ষিণা! শেষে নিরুপায় হ'য়ে কাশীধামে স্ত্রী-পুত্রকে এক ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রয় করলেন। এবং নিজে চণ্ডালের ঘরে চাকরি নিলেন। ভারত-রাজ হলেন চণ্ডালের দাস।

যারা শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করতে আসে, তাদের কাছ থেকে মাশুল আদায় করা হলো তাঁর কাজ।

এলো একদিন ভয়ঙ্কর পরীক্ষা। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার ভেদ ক'রে এলো প্রবল বৃষ্টি—দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব—ক্ষণে ক্ষণে মেঘ-গর্জ্জন, বজ্রপাত।

সেই সূচী-ভেদ্য অন্ধকার ভেদ ক'রে সহসা কে যেন কেঁদে উঠলো। চমকে উঠলো শ্মশান-চারীর পাষাণ-হৃদয়!

অন্ধকারের বুক চিরে সে মর্মন্তুদ কান্না আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুললো। সেই ঝড়-জল-বিদ্যুতের মাঝে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রাজা হরিশ্চন্দ্র। সহসা মনে পড়ে তাঁকে মৃতদেহের সৎকারের প্রাপ্য কড়ি আদায় করতে হবে।

এগিয়ে গেলেন রাজা। হঠাৎ মেঘ-গর্জন ক'রে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। সেই ক্ষণ-বিদ্যুতের আলোকে রাজা হরিশ্চন্দ্র যাকে দেখলেন তাতে আর্তস্বর বেরিয়ে এলো—কে, কে তুমি!

কিন্তু যাঁকে সম্বোধন ক'রে এই স্বর উচ্চারিত হ'লো—তিনি তখন তাঁর একমাত্র পুত্রকে বুক দিয়ে আগলে রয়েছেন। সে ক্রন্দন নয়—মর্মভাঙা চীৎকার!—'বাবা রোহিত রে!"

চমকে উঠলেন রাজা হরিশ্চন্দ্র! রোহিত!—কে রোহিত! চীৎকার ক'রে বললেন, "কে—কে তুমি! কি তোমার পরিচয়? কার ছেলে এ? কি ক'রে মরলো?"

উত্তর দিল নারী—"ও গো, আমি রাজার ঘরণী—রাজার ছেলে আজ সর্পাঘাতে ধূলায় লুটায় !"

আবার বিদ্যুৎ চম্‌কালো। রাজা চিনলেন তাঁর শৈব্যাকে, চিনলেন একমাত্র পুত্র রোহিতাশ্বকে। পাগলের মতো চীৎকার ক'রে তিনি ছেলের বুকে লুটিয়ে পড়লেন।

রাণীও চীৎকার ক'রে উঠলেন : "তুমি—তুমি—"

"আমি চণ্ডাল। ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। আমি ঘাটের মাশুল নি। মাশুল দাও—নইলে দাহ হবে না।"

—"কোথায় পাবো মাশুল। আমি যে ভিখারিণী।"

—"আমি চণ্ডাল, ক্রীতদাস চণ্ডাল। পিতা হ'য়ে পুত্রের শব-দাহের জন্যে মাশুল নিতে হচ্ছে আমাকে !—এ কি নিয়তি !"

রাত্রি প্রভাত হ'লো। প্রভাত এলো রাজা হরিশ্চন্দ্রের জীবনেও।

ঋষি বিশ্বামিত্র এসে মুক্তি দিলেন তাঁকে সকল অভিশাপ থেকে। সত্যবাদী হরিশ্চন্দ্র ফিরে পেলেন তাঁর রাজ্য তাঁর বৈভব সবকিছু।

বেদেই পাওয়া যায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিররণ। পুরাণে আমরা তারই নানা রূপ দেখতে পাই। তবে পুরাণের একটি কথায় খটকা আসে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের অনেক পবে ভগীরথ। ভগীরথই আনেন গঙ্গা। আর সেই গঙ্গাতীরেই তো কাশী। তবে কি করে হরিশ্চন্দ্র আগেই গঙ্গাতীবে কাশীতে গেলেন। গঙ্গা তো ভগীরথ এনেছেন অনেক পরে। এর উত্তরও বিভিন্ন। অনেকে বলেন কেদারনাথ পাহাড়ে এক কাশী আছে। গঙ্গা ধারা তারই পাশে। হয়তো হরিশ্চন্দ্র সেই কাশীতেই গিয়েছিলেন আবাব সিন্ধুনদের উত্তর পশ্চিমে এক কাশী ও বরুণার উল্লেখ দেখা যায়। হয়তো ভারতের সীমানার বাইরে এই কাশীতেই গিয়েছিলেন তিনি বরুণা ও অসির তীরে।

বিশ্বামিত্রকে সব দিয়ে তবে কি রাজা হরিশ্চন্দ্র ভুবন বা ভারত ছেড়ে তার বাইরের এরই কোন কাশীতে গিয়েছিলেন ?

যাক্ রাজা হরিশ্চন্দ্রের ছেলে রোহিত হলেন ভারতের রাজা আর তারই কয়েক পুরুষ পর রাজা বাহু সূর্য্যবংশের সিংহাসনে বসলেন। হয়তো পরে বীর-বিজয়ে, ধর্ম্মাচরণে, ভক্তসমাগমে বর্ত্তমান কাশীর সৃষ্টি।

রাজা সগর

রাজা বাহু যদুবংশীয় তালজঙ্ঘা এবং শক যবনাদি কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়ে আসেন অরণ্যে—ভৃগুবংশীয় ঔর্ব্বঋষির আশ্রমে। এইখানেই কিছু দিন পরে রাজা সগরের জন্ম হয়।

ঔর্ব্বঋষির এই আশ্রমটি ছিল মর্ভে প্রদেশের কাছে। আর্য্যাবর্ত্তের একটু দূরে। আর তারই কিছু দূরে বর্ত্তমান ব্যাবিলন। এখন রাজার ছেলে হলেও সগর রাজ্যহারা—তাই তিনি ধর্ম্মে কর্ম্মে মন না দিয়ে শক্তি-সাধনায় মত্ত হলেন। এবং কালক্রমে ঐ শক যবন-দের ব্যতিব্যস্ত করে তুল্লেন। এক এক জায়গায় যান আর সেখান-কার রাজাদের পরাজিত করে পরাজয়ের কলঙ্ক দেগে দেন। শকদের দিলেন মাথার অর্দ্ধেক মুড়িয়ে। যবন বা কাম্বোজগণের পুরো মাথাটা দিলেন মুড়িয়ে। পারদগণের চুল কাটতেই দিলেন না। আর পল্লবগণের উপর হুকুম হ'ল শুধু দাড়ি রাখার ; বায়ুপুরাণে এমনই লেখা আছে। হয়তো সগর রাজা ব্যাবিলনও জয় করে থাকবেন। কারণ বর্ত্তমান ব্যাবিলনের ইতিহাসে পাই, ৩৮ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে সারগণ নামে অর্কভিস বংশীয় এক রাজা সেখানে রাজা হলেন। "অর্ক" বা সূর্য্য বংশের রাজা সগরই হয়তো এই সরগণ। দসরত্ত, মতিস্সূয়জ প্রভৃতি নামান্তর দেখে এটাও সম্ভব বলে মনে হয়।

পুরাণেও আছে রাজা সগর অযোধ্যায় রাজত্ব স্থাপন করেন। মহাভারতে আছে যুধিষ্ঠিরের কাছে লোমশমুনি এই সগর রাজার গল্প বলেন। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা সগর কৈলাস পর্ব্বতে গিয়ে পুত্র-কামনায় সাধনা করেন। এবং রাণী শৈব্যার গর্ভে অসমঞ্জ নামে এক পুত্র হয়। অসমঞ্জের সব গুণ ছিল বটে কিন্তু এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল, সে ছোট শিশু দেখলেই সমুদ্রে ফেলে দিত। তাই পিতা তাকে নির্ব্বাসিত করেন। কিন্তু অসমঞ্জের পুত্র অংশুমানই যজ্ঞাশ্ব আনয়ন করেন। হয়তো রাজা সগর নাতিটিকে কাছেই রেখে দেন। সগরের দ্বিতীয়া রাণীর গর্ভস্থ মাংসপিণ্ডে হয় ৬০ হাজার ছেলে।

এইবার রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন বলে স্থির করলেন। নিয়মমত যজ্ঞাশ্ব ছাড়া হল—সঙ্গে গেলেন ঐ ৬০ হাজার ছেলে।

পথে সেই অশ্ব হ'ল চুরি—ছেলেরদল ঘোড়া খুঁজতে খুঁজতে দেখেন, সমুদ্র তীরে মহামুনি কপিল ধ্যানমগ্ন। পাশে ঐ অশ্ব। সগর পুত্রেরা কপিল মুনিকে চোর মনে করে অপমান করলেন। কপিল মুনির ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ঐ ৬০ হাজার ছেলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কোন কোন পুরাণে আছে সগরের তেজ ও অহংকার ভাঙ্গবার জন্যই নারায়ণ বৃদ্ধ বেশে ঐ অশ্ব অপহরণ করেন এবং কপিলের পাশে বেঁধে রাখেন।

যাই হোক, ছেলেরা ছাই হয়ে গেছে শুনে সগর নাতি অংশুমানকে পাঠালেন সেখানে। তিনি গিয়ে ঋষি কপিলের স্তব-স্তুতি করে তাঁকে তৃপ্ত করলেন। ঋষির মন ভিজে গেল, বল্লেন "কি চাই?" অংশুমান বল্লেন, "চাই তো অশ্ব, কিন্তু তার আগে চাই আমার পিতৃব্যদের তর্পণের জল, দয়া ক'রে দিন সে জল—যাতে দেবলোক পিতৃলোক তৃপ্ত হয়।" ঋষি বর দিলেন "তোমারই বংশের একজন দেবলোকের মন্দাকিনী ধারা—ঐ গঙ্গাকে বইয়ে নিয়ে আসবে এখানে, যেখানে আছে তোমার পিতৃব্যদের ভস্মস্তূপ—তারা উদ্ধার হবে।" মুনি কপিল অংশুমানকে অশ্বও দিলেন ফিরিয়ে। অংশুমান এলেন অশ্ব নিয়ে ঘরে। যজ্ঞ হ'ল শেষ। সমুদ্র তার পুত্রদের ভস্মাবশেষ স্পর্শ না করে রেখে দিয়েছিলেন বলেই, আশ্রয়দাতা সমুদ্রকে রাজা সগর পুত্ররূপে কল্পনা করে নাম দিলেন সাগর।

দিলীপ ও ভগীরথ

সগরের পুত্র হলেন **দিলীপ**। আর দিলীপের পুত্র ঐ **ভগীরথ**। যিনি, রাজা হয়ে মন্ত্রীদের উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন। ঘোর তপস্যায় তিনি গঙ্গাকে আরাধনা করে, মর্ত্তে আসতে রাজী করালেন। গঙ্গা তো রাজী। অংশুমানের অনুরোধে সেই ভস্মরাশীকে তিনি পবিত্র করে তাঁদের আত্মাকে স্বর্গে পাঠাবেন। কিন্তু ভারতে অবতরণ করার সময় তার বেগ ধারণ করবে কে? তাই গঙ্গা বল্লেন শিবের আরাধনা কর—ভগীরথ আবার তপস্যায় বসলেন। শিবও তুষ্ট হয়ে গঙ্গাধারা মস্তকে ধারণ করতে রাজী হলেন। তাই তাঁর আর এক নাম গঙ্গাধর। গঙ্গা

নামলেন, ভগীরথ শঙ্খ বাজিয়ে গঙ্গাকে বইয়ে নিয়ে চল্লেন সাগরের কোলে—সেই ভস্মরাশির উপর। ভগীরথ প্রবাহিতা ধারা ভাগীরথী হয়ে দেখা দিলেন।

পবিত্র সগর বংশের মহিমায়, ভগীরথের চেষ্টায়—গঙ্গা গঙ্গাধরের জটায় নিপতিত হয়ে ভারতের বুকে প্রবাহিত হলেন,—ষাট সহস্র আত্মাকে স্বর্গগামী করে সাগরের বুকে মিশে গেলেন।

গঙ্গাবতরণ

এই হল পৌরাণিক গল্প। কিন্তু ঐ ৬০ হাজার ছেলে - গঙ্গার সাধনা—ষাট হাজার ছেলের আত্মার স্বর্গলাভ এই সব কাহিনী থেকে একটু রং চং বাদ দিলে যুগ-স্বীকৃত ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় বই কি।

আধুনিক বিচারের ধারায় যদি কাহিনীটি এই ভাবে লেখা হয় যে প্রথমে রাজা বাহু পরাজিত হয়ে গেলেন মার্ভ প্রদেশে। তারপর সেই বংশের ছেলে সগর ব্যাবিলন জয় করলেন এবং সেখানে স্ত্রী শৈব্যার গর্ভে যে ছেলে হল, সেই অসমঞ্জার কোন অপরাধে বা যবনসদৃশ কোন ব্যবহারে তাকে ঐ ব্যাবিলনেই ছেড়ে রেখে নাতি অংশুমানকে নিয়ে চলে এলেন আবার ভারতের দিকে। অসমঞ্জ অর্থাৎ যে সমঞ্জ নয়—ভারতীয়দের সঙ্গে আচার, ব্যবহার যার সমান নয়—সে আর ভারতে এল না।

তারপর অযোধ্যা। সে তখন কোথায়? প্রয়াগ পর্য্যন্ত আগে সমুদ্র ছিল। অগস্ত্য সে জল শুষে নেওয়ায় সমুদ্র শুকিয়ে হয়েছিল মরুভূমি। এখন সগর সেখানেই হয়তো রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বলেই জলপ্রবাহে, কৃষি-কার্য্যে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি মাটীর ছেলেকেই ছেলে করলেন। তাঁর ৬০ হাজার প্রজাকে সন্তান বলে সম্মান দিয়ে বললেন 'সেচ বিভাগের কাজ করে মরুভূমিকে সরস কর'। সগর অশ্ব ছাড়লেন। অশ্ব ছাড়া মানে—অশ্ ধাতুর ব্যাপ্তি অর্থে জল—জলপ্রবাহ ছাড়লেন—নদী খনন সুরু করলেন।

এর আগেই ধুন্ধু অর্থাৎ মরু উত্তাপকে নষ্ট করে রাজা ধুন্ধুমার ব্রহ্মাবর্ত্তে যমুনা ও সরস্বতীকে প্রবাহিত করেছিলেন। হয়তো সেই দক্ষিণ-মুখী প্রবাহকে সগর-বংশ পূর্ব্বাভিমুখী করে নিয়ে চল্লেন।

প্রয়াগের পর সমুদ্র শোষণ করে অগস্ত্য যে মরুভূমি রচনা করেছিলনে, আজ তাইতো বিহার ও বাংলা। এখন যেখানে রাজমহল তখন তাই ছিল বাংলার স্থলভাগের সীমা। সেইখানেই হয়তো কপিলমুনি বসেছিলেন। কপিল মানে অতি রুদ্রের প্রতীক। অর্থাৎ সেখানে এত বালি যে নদী ধারা চোরা বালি বা মাটীতে এগুতে পারতো না। অশ্ব অর্থাৎ জলপ্রবাহ আটকে গেল। যে ৬০ হাজার শ্রমিক এল খনন করতে তারা ঐ উত্তাপে বা রোগেই মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল।

প্রথম এলেন পৌত্র অংশুমান। তিনি অশ্বকে ফিরে পেলেন অর্থাৎ কোন রকমে নদীধারাকে অব্যাহত রাখলেন। পরে তাঁর ছেলে দিলীপও কাজ চালিয়ে গেলেন। কিন্তু সেচ বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে ঐ ধারাকে সাগর পর্য্যন্ত নিয়ে চল্লেন দিলীপ-পুত্র ভগীরথ। নাম হল সে ধারার ভাগীরথী। গঙ্গার সবটুকু ধারাই ভগীরথের দ্বারা হয়নি তাই সবটাই ভাগীরথী নাম পায়নি।

যাক হিমালয় থেকে নদী ধারা এসে মিশল সাগরে, সমস্ত মরুদেশ সুজলা সুফলা হয়ে উঠলো সগরের যজ্ঞে, অর্থাৎ সেচ বিভাগের এই মহান যজ্ঞে—নদী-প্রবাহের সেই অনুষ্ঠান শেষ হল। ভগীরথ প্রবাহিত ভাগীরথী বাংলার বুকে প্রবাহিত হল—আর ৬০ হাজার শ্রমিক উদ্ধার হ'ল মানে চাষে, আবাদে, ভারতের সন্তানরা আবার সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো।

গল্প কিন্তু বজায়ই থাকলো। প্রশ্ন জাগে তবে কি ভগীরথ হিমালয় যাননি? যাবেন না কেন। নদীধারাকে প্রবাহিত করতে হলে পর্ব্বতস্থ নির্ঝরিণী বা জলভাণ্ডারের অনুসন্ধান তো করতেই হবে। হয়তো তেমনই কোন জলধারার সন্ধান করতে করতে ভগীরথ হিমালয় পর্ব্ব-তের উপর বিষ্ণুপদ পর্ব্বত নামে একটা জায়গায় পৌঁছে বড় একটা সরোবর দেখতে পান। ঐ সরোবরই হয়তো ব্রহ্ম-কমণ্ডলু। নিশ্চয়ই সরোবরটি ছিল তখন বরফে ঢাকা। সেই বরফ ভেদ করে জল বার করতে হল তাঁকে। তাই বরফ ঘেরা পাহাড় কেটে তিনি মুখ তৈরী করলেন। অনেকটা গরুর মুখের মতনই হবে মুখটা—

নাম হ'ল "গোমুখী"। এটা যে গো-মুখেরই মতন তা সেদিন সম্রাট আকবরও লোক পাঠিয়ে জেনেছিলেন। আমরা ঐ সরোবরকে বলি বিষ্ণু-পদ-সরোবর। আর ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গকে বলি বিষ্ণুপদ শৃঙ্গ।

বিষ্ণুপদ আর সরোবরের তুষাররাশি যখন গলিত হয়ে সবেগে পাহাড় ভেঙ্গে বন-বাদাড় কাটিয়ে ছোট-বড় শিলাখণ্ড বুকে নিয়ে পর্ব্বত থেকে পর্ব্বতের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তার সে গতিপথে পর্ব্বত রাশির শ্যামলবনাচ্ছাদিত প্রস্তর-কৃষ্ণ অংশ ঠিক মহাদেবের জটাজাল বলেই মনে হয়। জাহ্নবীর বেগবতী সে ফেনায়িত ধারা-প্রবাহে ফেন-লেখাচ্ছাদিত শিব-জটাজালে গঙ্গাবতরণের অপূর্ব্ব দৃশ্যই মনে জাগে।

আনুমানিক ১০৩০০০ ফুট উচ্চের বিষ্ণুপদ বা গোমুখী থেকে জল নামছে নীচে। প্রতি ক্রোশে ৭০০০ ফুট নেমে পড়ছেন গঙ্গা। সেই স্থানটিরই পরিচয় গঙ্গোত্রী। পবিত্র গঙ্গোত্রীর ৩॥০ ক্রোশ দূরে ভৈরব ঘাঁটি। এর ১৫ ক্রোশ দূরে যে স্থানটি, অনেকে বলেন ঐ স্থানেই ছিল জহ্নু মুনির আশ্রম।

সেই আশ্রমের কাছে সবেগে তুমুল ধ্বনিতে জলধারা আসামাত্র তপোবিঘ্নকারী মনে করে জহ্নু ঐ ধারা পান করলেন। তার পর ভগীরথের স্তবে আবার তুষ্ট হয়ে আবার জানুদেশ থেকে বের করে দিলেন। নাম হ'ল তাই জাহ্নবী। পৌরাণিক এ কাহিনীও রূপক নয়। সত্যের ইঙ্গিত আছে এতে। ঐ যে বেঁকা মোড়ের জায়গাটা—সেখানেই গঙ্গোত্রীর গঙ্গা গতিপথ বা মুখ-পরিবর্ত্তন করে—দক্ষিণ থেকে নূতন দিকে পূর্ব্বাভিমুখী হয়ে নতুন তেজে ছুটলো। জানু থেকে নতুন প্রবাহ সুরু। ২৭ ফুট প্রশস্ত থেকে সুরু করে এখানে গঙ্গা জাহ্নবী হ'য়ে ১০০ ফুট প্রশস্ত হয়েছে।

অনেকে বলেন আসল গঙ্গা দেব প্রয়াগ থেকে ভৈরবঘাঁটী হয়ে এখানে এসেছে, আর ভগীরথ প্রবাহিতা ধারা এইখানে তার সঙ্গে মিশেছে। তাঁদের মতে দুই যেখানে মিশেছে সেখানে ভগীরথ নামটা ডুবে গিয়ে হয়েছে জাহ্নবী গঙ্গা।

পরবর্ত্তীকালে হয়তো অনেকে রাজমহলের কাছেই জহ্নু মুনির

আশ্রম বলেন, উপরের অংশ গঙ্গা। ভাগীরথী বা পদ্মাকে তাই তাঁরা এখান থেকে জাহ্নবী নাম দিয়েছিলেন। কেউ কেউ সাগর দ্বীপ-টাকেই জহ্নুমুনির আশ্রম বলেন।

তবে মোটমাট যাই হোক, ভগীরথ প্রয়াগের পর অগস্ত্য দ্বারা শুষ্ক করা বালুরাশির বুকে সে ধারা বইয়ে দেন তাই ভাগীরথী। আর তাই বিহার-বাংলার শস্য-দায়িনী সুজলা সুফলা মাটীর মূল রসের যোগান দিয়ে হাজার হাজার সন্তানের প্রাণ দিয়েছে ও দিচ্ছে।

ভগীরথের কয়েক পুরুষ পরে অম্বরীষ। এই অম্বরীষের সময় আবার রাজসূয় যজ্ঞ এবং সেই যজ্ঞে আবার শুনঃশেফের উপাখ্যান! অর্থাৎ এখনও চলছে দীর্ঘতমা-প্রচলিত জ্যোতিষ-মতের বিরোধ।

রাজা অম্বরীষের কয়েকপুরুষ পরে রাজা ঋতুপর্ণ অযোধ্যার সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময়ের একটি বিশেষ ঘটনা হ'লো, নিষদ রাজা নলকে আশ্রয়দান। এই নল-দময়ন্তীর কাহিনী আমরা পরে বলব, কারণ রাজা নল সূর্য্যবংশের নন।

রাজা ঋতুপর্ণের সময় আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা হ'লো, ব্যোমযান বা বিমানের প্রচলন। রাজা নলের কন্যা ইন্দ্রসেনা বিমান পরিচালনা করছেন এও আমরা দেখতে পাই। অবশ্য তারও আগে সুমেরু প্রদেশে বিমান প্রস্তুতের কারখানা ছিল—ঋগ্বেদের পৃষ্ঠায় যেন এর ইঙ্গিত আছে।

যাই হোক, ঋতুপর্ণের কয়েক পুরুষ পরে রাজা হন অনরণ্য। কোন এক রাবণ উপাধিধারী লোকের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। এরও এক পুরুষ পরে রাজা হলেন সুদাস। যাঁর ছেলে সৌদাসই কল্মাষপাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এই কল্মাষপাদের গল্প পুরাণের এক বিস্ময়।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কল্মাষপাদ একদিন মৃগয়ায় গিয়েছেন। পথশ্রমে ক্লান্ত-শ্রান্ত-ক্ষুধার্ত্ত রাজা যখন অরণ্যের পথ ধরে চলেছেন তখন বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তি্‌কে সেই পথে আসতে দেখে রাজা বললেন, আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও! শক্তি্‌ বললেন, ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম। রাজা ক্রুদ্ধ হ'য়ে

ব্রাহ্মণকে কশাঘাত করলেন। শক্তি অভিসম্পাত দিলেন, তুমি নরমাংসভোজী রাক্ষস হও।

এই কল্মাষপাদ রাজাকে যজমানরূপে পাবার জন্যে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে তখন প্রতিযোগিতা চলছিল। অভিশপ্ত কল্মাষপাদের এই দুর্ভাগ্যের সুযোগে বিশ্বামিত্র কিংকর নামে এক রাক্ষসকে রাজার শরীরে প্রবিষ্ট হ'তে আদেশ করলেন।

এরই পর একদা এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ বনমধ্যে রাজাকে দেখে সমাংস অন্ন চাইলেন। রাজা বাড়ী এসে পাচককে আদেশ করলেন—"ব্রাহ্মণকে পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করাও।"

"পাচক জানালো, কিন্তু এত রাত্রে মাংস কোথায় পাব?"

রাক্ষসাবিষ্ট রাজা বললেন, "বধ্যভূমি থেকে নরমাংস নিয়ে এস।" যথাসময়ে নরমাংস সহ অন্ন ব্রাহ্মণকে দেওয়া হ'লো। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ জানতে পেরে অভিশাপ দিলেন, "তুমি নরমাংসভোজী হও।"

এই দুজনের শাপের ফলে কল্মাষপাদ কর্ত্তব্যজ্ঞান শূন্য হয়ে রাক্ষসানুরূপ বৃত্তিতে শক্তিকেই বিনাশ করলেন এবং বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় এই কল্মাষপাদ বশিষ্ঠের শতপুত্রকেই খেয়ে ফেললেন।

এর অনেক পরে পুত্রশোকাতুর বশিষ্ঠ একদিন আশ্রমে ফিরছেন, কিন্তু পশ্চাতে বেদ-পাঠের ধ্বনি শুনতে পেয়ে থম্‌কে দাঁড়ালেন। বললেন,—"কে আমার অনুসরণ করছো?"

শক্তির বিধবা পত্নী অদৃশ্যন্তী উত্তর দিলেন,—"আমি আপনার পুত্রবধূ। আমার গর্ভে যে পুত্র আছে তার বার বৎসর বয়স হয়েছে—সেই বেদপাঠ করছে।"

তাঁর বংশের সন্তান জীবিত আছে শুনে বশিষ্ঠ আনন্দিত হলেন।

কল্মাষপাদ এসে পথরোধ করলেন। পুত্রবধূকে ভীতা হ'তে দেখে বশিষ্ঠ তাঁর মন্ত্রপুত জল কল্মাষপাদের অঙ্গে ছিটিয়ে বললেন,—"তুমি শাপমুক্ত হও—আর কখনো ব্রাহ্মণের অপমান ক'রো না।"

এই কল্মাষপাদের কোন পুত্র ছিল না। রাজার ইচ্ছানুসারে বশিষ্ঠের ঔরসে তাঁর স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র-সন্তান জন্মলাভ করে। এই পুত্রের নাম অশ্মক, ইনি পৌদন্য নগর স্থাপন করেছিলেন।

পুরাণ কাহিনীতে বহু রূপকের অংশ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির সংঘর্ষের এ এক রূপক অভিব্যক্তি।

আর কল্মাষপাদের রাক্ষস-রূপ প্রাপ্তি তামসিকতারই চরম নিদর্শন। এই তামসিকতাকেই ক্ষমা করলেন ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ—যাঁর ধর্ম্ম হ'লো ক্ষমা। তিনি শুধু ক্ষমাই করলেন না, রাজাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন—তাঁর বংশ রক্ষা করলেন। বিশ্বামিত্রের ক্রোধে অসূয়া ও হিংসা ছিল। রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তির সঙ্গে ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের সাত্ত্বিক ক্ষমতার তুলনাই এ কাহিনীতে ব্যক্ত।

তখনকার সামাজিক রীতি-নীতিরও একটা ধারা আমরা দেখতে পাই এই কাহিনীর মধ্যে। রাজা কল্মাষপাদের স্ত্রীর গর্ভে বশিষ্ঠের পুত্র। বিস্ময়ের কিছু নাই। হয়তো তখনকার সামাজিক ব্যবস্থা এই-রকমই ছিল। বংশ বৃদ্ধির জন্যে তখন নানা উপায় অবলম্বন করা হ'তো। অশক্ত স্বামীও স্ত্রীকে অনুমতি দিচ্ছেন অন্য পুরুষ-সংসর্গে গর্ভ ধারণ করতে—এও আমরা দেখতে পাই।

যাই হোক, রাজা অশ্মকের কয়েক পুরুষ পরে আমরা পাই রাজা দিলীপকে।

ভগীরথের পিতা দিলীপ ছিলেন প্রথম—তার বহু পুরুষ পরে এই দিলীপ দ্বিতীয়—এবং তার আবার কয়েক পুরুষ পর যে তৃতীয় দিলীপ নামটি পাই তিনিই রঘুর পূর্ব্ববর্ত্তী দিলীপ। এই দিলীপের জন্ম বা রাজত্বকাল হিসাব করে বর্ত্তমান অনেক পণ্ডিত ৩১০১—৩০৯৩ খৃঃ পূঃ সময় নির্দ্দেশ করেন।

তৃতীয় দিলীপের পর রঘু। দিলীপ, রঘু ও তৎপরবর্ত্তী অজকে নিয়ে কালিদাসের যে অপূর্ব্ব রঘুবংশ—তারই মধ্যে পাই রামচন্দ্রের বংশ-কথা। দশরথ নামটিও বহু রাজার ছিল। এমন কি ভারতের বাইরে ব্যাবিলনেও এক দশরত্ত ছিলেন। কিন্তু দশরথ বলতেই রাঘব-কুলতিলক রামচন্দ্রের জনককে সাধারণে চেনে।

দশরথের ছেলে রামচন্দ্র। ভারতে দেব-দেবী সব থাকা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে যিনি সর্ব্ব প্রথম অবতার রূপে পূজিত হন—ভগবান রূপে কল্পিত হন—তিনিই এই রামচন্দ্র।

কিন্তু কি অদৃষ্ট! দেবতা হয়েও দশরথের পর রাজবংশের তালিকায় তার নাম পড়লো না, পড়লো ভরতের। সেই গল্পই রামায়ণ। রামায়ণের গল্প আমরা বলবো যথাস্থানে মহাকাব্যের পালা বলবার সময়। এখানে শুধু বংশধারায় দেখতে পাওয়া যায় যে দশরথের পর ভরত রাজা হলেও শেষে রামচন্দ্র রাজ্য লাভ করেন। রামচন্দ্রের পর রাজ্য পান কুশ। এই কুশ সূর্য্যবংশের, সম্ভবতঃ ১২ জন রাজার পর রাজত্ব করেন।

কুশের দ্বাদশ পুরুষ পর রাজা শলের নাম পাই। বর্ত্তমানে মধ্য প্রদেশে বেলপাহাড় ষ্টেশনের কাছে গ্রিনডোঙ্গের সন্নিকটে জোগড়ষ্টেটে বিক্রমখোল নামক স্থানে গণ্ডশৈল গাত্রে একটা শিলালিপি পাওয়া যায়। তাতে রাজা শল কর্ত্তৃক ইলগুল নামক এক রাজাকে পরাজয় করার বিবরণ লেখা আছে—ব্রাহ্মী, খরোষ্টী ও মহেঞ্জোদারোর অক্ষরে। কে জানে ইহার কতটুকু সত্য।

রাজা শলের ৩৩ জন রাজার পর পাই রাজা বৃহদ্বলের বিবরণ।

সকলে অনুমান করেন—সেটা আনুমানিক ৪৮৪০ খৃষ্টাব্দ বা ১৯৩৭ খৃঃ পূর্ব্বের কথা। অর্থাৎ তাহলে সূর্য্যবংশের রাজা বৃহদ্বল ছিলেন প্রায় ৩৮৯৮ বৎসর আগে।

সূর্য্যবংশের ধারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত এই ভাবে বয়ে এসেছে।

বৃহদ্বল মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধে মারা যান। সেই সঙ্গে সূর্য্যবংশের আধিপত্যও যেন কমে আসে। অবশ্য সূর্য্যবংশীয় সন্তান বলে আজও অনেকে গৌরব করেন। কিন্তু ভারত-ইতিহাসের পৌরাণিক অধ্যায়ে সূর্য্য বংশ বিস্তারের কাহিনী আমরা বৃহদ্বলেই শেষ করলাম।

চন্দ্রবংশ

সূর্য্যবংশের পরে আসে চন্দ্রবংশের কথা। সূর্য্যবংশের সঙ্গে এই চন্দ্রবংশ এমনভাবে জড়িয়ে আছে যার জন্যে চন্দ্রবংশের কথা এই সময় ব'লে নেওয়া দরকার। চন্দ্র মানে আকাশের চাঁদ নয়। যদিও পুরাণের এই কথাই সবাই ভাবে গল্প শুনে। আসলে অত্রি মুনির ছেলে চন্দ্র—এই থেকেই চন্দ্রবংশের উদ্ভব।

তবে অত্রি মুনির ছেলে চন্দ্রকে পৃথিবীর ছেলে চন্দ্র বলে যে বর্ণনা করা হল—এর মূলেও একটি ধাঁধাঁ আছে বই কি। 'অত্রি' কথাটির মানে এক রকম পৃথিবী বলাও চলে। অ অর্থ সতত আর ত্রি অর্থ গমন। সতত চলছে যে, সে পৃথিবী—ধারণা হয়ে গেল অত্রি মানে পৃথিবী আর চন্দ্র পৃথিবীর ছেলে—আর সে চন্দ্র থাকে আকাশে, অতএব আকাশের চন্দ্রই চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ হয়ে গেল—যেমন শুধু সূর্য্যের এক নাম বিবস্বান বলে বৈবস্বত বংশটাও সূর্য্যবংশ হয়ে গিয়েছিল। হয় তো বংশের গৌরব বাড়াতেই এই সব কল্পনা আর কাহিনী। আবার মজা—অত্রির ছেলে যে চন্দ্র তাঁর ছেলের নাম বুধ। তাই গ্রহ জগতে বুধ গ্রহটিও চন্দ্রের ছেলে হয়ে পড়লো। এই অত্রি বংশের বুধের সঙ্গে হ'লো অযোধ্যার রাজা ইক্ষ্বাকুর কন্যা ইলার বিয়ে। সে যুগের এই ইলা এক অপরূপ সৃষ্টি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কন্যা ইলা ধীরে ধীরে পুরুষরূপে রূপান্তরিত হন। আজ এই পুরাণোক্ত কাহিনীকে আর অসম্ভব বলবার উপায় নাই। আধুনিক যুগেও এই রূপান্তর হচ্ছে।

ইলা ও বুধের সন্তানের নাম পুরুরবা। কিন্তু ইলার ঐ পুরুষত্ব প্রাপ্তির জন্যে পুরুরবা রাজ্য পাননি। বুধ পুরুষরূপী ইলাকে একখণ্ড জমি দিলেন থাকবার জন্যে। ভারতের ঠিক পাশেই তার স্থান—তার নাম বাহ্লীক বা ব্যেকট্রিয়া। কিন্তু ইলা সুদ্যুম্ন নাম নিয়ে পিতা ইক্ষ্বাকু প্রদত্ত ভারতেরই এক দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। নাম দিলেন তিনি প্রতিষ্ঠানপুর। পুরুরবা বড় হ'লে সুদ্যুম্ন তাঁকে এই রাজ্য দিলেন। প্রয়াগের পাশে 'পীঠান' দেশটাই নাকি সেই দেশ।

যাই হোক, এই পুরুরবা হ'লেন চন্দ্রবংশের সন্তান আর ইলা সূর্য্যবংশের। পুরুরবা পরে যোদ্ধা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ভারতের প্রথম নাটক

কথিত আছে, পুরুরবার এই বিজয়োৎসবে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ থেকে উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতিকে পাঠিয়েছিলেন

অভিনয়ের জন্যে। পালা হয়েছিল 'লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর।' ভারতের এই প্রথম নাটক। এই নাটকে উর্ব্বশী স্বয়ং 'লক্ষ্মী'র অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই অভিনয় দেখে, উর্ব্বশীর প্রতি পুরুরবা মুগ্ধ হলেন। উর্ব্বশীও পুরুরবার রূপে আকৃষ্টা। দুজনের বিয়ে হ'লো। তাঁদের পুত্রের নাম আয়ু, রজি প্রভৃতি। পুরুরবার পর এই আয়ুই রাজা হয়েছিলেন। রজি সিংহাসন পাননি বটে, কিন্তু তিনি প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। ইন্দ্র যখন প্রহ্লাদের সময় অসুরদের হাতে নির্য্যাতিত হচ্ছিলেন সেই সময় এই রজি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। এই সাহায্য না পেলে ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত হতে হ'ত। ইন্দ্র প্রতিশ্রুত ছিলেন যুদ্ধে জয়লাভ করলে রজিকে স্বর্গের সিংহাসন দেবেন। ইন্দ্র সে প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন। অবশ্য রজির মৃত্যুর পর ইন্দ্র তাঁর রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন। পুরাণের গল্পের ঢেউ আবার উল্টো দিকে বয়ে গেছে অথবা অন্য মন্বন্তরের কথা বলতে হবে।

পুরুরবার পুত্র আয়ুর রাজত্বকাল সম্ভবতঃ ৫৫২৬ খৃঃ পূঃ। ভারতে অভিনয়-শিল্প দেখা দিয়েছে তারও আগে।

এই আয়ু আর রজি ছাড়াও পুরুরবার আর এক পুত্রের নাম দেখতে পাই পুরাণে—অমাবসু। এই অমাবসু কান্যকুব্জের নিকট এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন।

কথিত আছে আয়ু এক অসুর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ভারতের মাটিতে এরূপ বিবাহ কিন্তু এই প্রথম।

আয়ুর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ নহুষ, কনিষ্ঠ ক্ষাত্রবৃদ্ধ। নহুষ পিতৃ-রাজ্য পেলেন, ক্ষাত্রবৃদ্ধ গেলেন কাশীর দিকে নিজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে।

নহুষ কিন্তু বড় অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তিনি মানুষ দিয়ে শিবিকা বহন করাতেন এরূপ জনশ্রুতিও আছে। ঋষি অগস্ত্যকেও তিনি এই শিবিকা বহনের কাজে লাগিয়েছিলেন। এমন কি, অতি-দর্পী এই রাজা অগস্ত্যের মাথায় পা রেখে শিবিকারোহণ করেছিলেন। এই অহঙ্কারই তাঁর কাল হ'লো। ঋষি শাপ দিলেন। প্রজারাও করলো বিদ্রোহ। নহুষ রাজ্যচ্যুত হয়ে কারারুদ্ধ হলেন।

রাজা নহুষের পুত্র যযাতি। এই যযাতির কথা পুরাণে অনেক-

খানি অংশ জুড়ে আছে। ইনি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী এবং দৈত্য বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন।

এই বিবাহ নিয়েও পুরাণে একটি অপূর্ব্ব কাহিনী আছে।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য জানতেন মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র—যা দেবগুরু বৃহস্পতি জানতেন না। দেবতাদের অমর হতে হলে চাই ঐ মন্ত্র। বৃহস্পতি-পুত্র কচ এলেন পিতার নির্দ্দেশক্রমে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কাছে সেই বিদ্যা আয়ত্ত করতে। বিদ্যার্থী বৃহস্পতি-পুত্র—সুতরাং শুক্রাচার্য্য কি ক'রে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন? কচকে গ্রহণ করলেন।

বিদ্যাধ্যয়নকালে তরুণ তাপস নিত্য দেখে পুষ্পচয়নরতা শুক্রাচার্য্য-কন্যা দেবযানীকে। দেবযানীও মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকেন কচের মুখের দিকে। এমনি করেই উভয়ের মধ্যে একদিন অনুরাগ জন্মে।

আশ্রমে থেকে শিষ্যদের সেকালে গুরুর পরিচর্য্যা করতে হ'তো। গো-সেবা, গো-চারণও ছিল তাদের নিত্য কার্য্য। এমনি এক গো-চারণকালে দৈত্যরা কচকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে ফেললে। কচের ওপর ছিল তাদের রাগ।

কচকে যথাসময়ে ফিরতে না দেখে শুক্রাচার্য্য চিন্তিত হলেন। দেবযানীও কেঁদে-কেটে অস্থির। ঋষি শুক্রাচার্য্য জ্ঞানচক্ষে সব কিছুই অবগত হলেন। কিন্তু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মৃতের প্রাণ-দান করতে পারেন। কচও তাঁর কৃপায় পুনর্জ্জীবিত হলো।

দৈত্যেরা তাকে বার বার আক্রমণ করে—গুরুর কৃপায় প্রাণ পায়। কিন্তু দৈত্যরা এবার চরম প্রতিশোধ নিলে। কচকে মেরে তার মাংস পিষে সুরার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে এবং সেই সুরা তাদের গুরু আচার্য্যকে পান করতে দিলে। কচের জীবন দান করা এবার অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। দেবযানী চীৎকার ক'রে কাঁদেন আর বলেন, তিনিও আর প্রাণ রাখবেন না। শুক্রাচার্য্য বললেন, "কচের জীবন দানের বিনিময়ে আমাকে প্রাণ হারাতে হবে।" কিন্তু দেবযানী পিতাকেও হারাতে চান না। শেষে শুক্রাচার্য্য নিরুপায় হ'য়ে তাঁর সঞ্জীবনী মন্ত্র জোরে জোরে উচ্চারণ করতে লাগলেন—বললেন,

"কচ, আমার দেহে যে-অবস্থায়ই তুমি থাক, এই মন্ত্র তুমি কণ্ঠস্থ করে নিয়ে আমার শরীর থেকে বিনির্গত হও। পরে এই মন্ত্র দিয়েই তুমি আমাকে পুনর্জ্জীবিত করবে।"

যে-মন্ত্র শুক্রাচার্য্য কচের কাছ থেকে এতদিন গোপন রেখেছিলেন, আজ নিরুপায় হ'য়ে সেই মন্ত্র তাকে দান করলেন। কচের আশা সফল হ'লো। অধীত বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে কচ এবার ফিরে যাবেন স্বর্গে। কিন্তু পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালেন দেবযানী—সে যে তার প্রতি অনুরক্তা। কিন্তু কচ এসেছিলেন সঞ্জীবনী মন্ত্র আয়ত্ত করতে, সেখানে প্রেমের স্থান কোথায়? কচ দেবযানীকে প্রত্যাখ্যান করলেন। দেবযানী অভিসম্পাত দিলেন—তুমি এই মন্ত্র শিখাতে পারবে, কিন্তু প্রয়োগ করতে পারবে না।

কচ সেই অভিশাপ নিয়েই চলে গেলেন দেবতাদের কাছে। নিজের প্রেম, সুখ, সঙ্গিনী সব রইল পড়ে জাতির স্বার্থের জন্য পরিত্যক্ত হয়ে।

এর পর একদিন বনবিহার কালে সামান্য কারণে হল কলহ—দেবতা শুক্রাচার্য্য-কন্যা দেবযানী ও দৈত্য বৃষপর্ব্বা-কন্যা শর্মিষ্ঠার মধ্যে। সামান্য কারণ—স্নানান্তে ভুলে কাপড় গিয়েছিল বদলে। শর্মিষ্ঠা সেই রাজারই মেয়ে—যাঁর পুরোহিত শুক্রাচার্য্য। তবু দেবযানীর ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার।

ঝগড়ার ফলে হঠাৎ শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে দিল এক কুয়ায় ফেলে।

ভীত দেবযানীর চিৎকার শুনতে পেলেন রাজা যযাতি মৃগয়ায় এসে। উদ্ধার করলেন হাত ধরে—সে হাত ধরা তার পাণি-পীড়নে অর্থাৎ বিবাহে শেষ হ'ল।

কিন্তু এদিকে আর এক ব্যাপার—কুয়া থেকে উদ্ধার পেয়ে দেবযানী সব বল্লেন পিতা শুক্রাচার্য্যকে।

ক্রুদ্ধ শুক্রাচার্য্য—দৈত্য-রাজ্য ত্যাগ করতে চান। শেষে স্থির হল—শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসীত্ব স্বীকার করলে শুক্রাচার্য্য দৈত্যদের ত্যাগ করবেন না।

এতো আর যে সে দৈত্য নয়—দেবকুলেরই জাতি—উচ্চ মন,

দৃঢ় পণ। কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা জাতি ও দেশের জন্য পিতৃআজ্ঞায় দেবযানীর দাসিত্ব গ্রহণ করলেন।

দেবযানী আর **যযাতি** বিবাহান্তে গেলেন দেশে ফিরে, শর্ম্মিষ্ঠাও এলেন যযাতি-গৃহে দাসী রূপে।

শর্ম্মিষ্ঠার উদারতা শালীনতা ও সৌন্দর্য্যে যযাতি মুগ্ধ। তাঁকেও তিনি পত্নীত্বের অধিকার দিলেন।

দেবযানীর গর্ভে হল যযাতির দুই ছেলে—**যদু ও তুর্ব্বসু**। এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে হল তিন সন্তান—**পুরু, দ্রুহ্যু ও অনু**।

সপত্নীর হিংসা ও শর্ম্মিষ্ঠার সহিত এই গোপন বিবাহ বা মিলনের ব্যাপারে দেবযানী ক্ষুব্ধ। আদরিণী কন্যার শোকে শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হলেন জামাতার উপর। অভিশাপ দিলেন—"অসংযত চিত্ত তোমার—তুমি পঙ্গু হও—জরাগ্রস্ত হও।"

ঋষি-অভিশাপ! যযাতি হলেন জরাগ্রস্ত।

এখানে আবার এক অপূর্ব্ব পিতৃ-ভক্তির আদর্শ।

পঙ্গু যযাতি রোগের যন্ত্রণায় অস্থির। পাঁচ ছেলেকেই বল্লেন তাঁকে নিরাময় করতে—চাইলেন জরা থেকে মুক্তি।

কেউ কিছু করলেন না—কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ সন্তান পুরু স্বেচ্ছায় নিলেন সেই ব্যাধি নিজ দেহে—পিতাকে রোগমুক্ত করতে।

পুরু পিতার জরা নিজের দেহে টেনেই নিন অথবা সন্তানের যোগ্য সেবায় ও পরিচর্য্যায় তাঁকে সুস্থই করুন, যযাতি জরা-হীন হলেন এবং যৌবন ফিরে পেলেন।

রাজা যযাতি পুরস্কার স্বরূপ পুরুকেই বসালেন সিংহাসনে।

পুরাণে যযাতির এই পাঁচ ছেলের উল্লেখ থাকলেও রামায়ণে এবং মহাভারতেও যযাতির দুই ছেলের উল্লেখ পাই—যদু ও পুরু।

আবার ঋগ্বেদে আছে আরভ পর্ব্বতের পাশে সাবর্ণি মনুর কাছে নাভানেদ্দিষ্ট ঋষি দেখেছিলেন পুরু ছাড়া আরও দুই কুমারকে, যদু ও তুর্ব্বসু।

তা হলেও দেখা যায়—তিন ছেলে। তবে এ পাঁচ ছেলের বিবরণের অর্থ কি?

এইখানেই বিচারে আসে—নহুষ ও যযাতি দুজন করে ছিলেন।

প্রথম নহুষ ও প্রথম যযাতি ছিলেন স্বর্লোকে ও ভুবলোকে। কিন্তু তার পর—প্রায় হাজার বছর বাদে মনু-সন্তানের ভারতপ্রবেশের পর সূর্য্যবংশে হয় দ্বিতীয় নহুষ ও দ্বিতীয় যযাতি। সখ করে হয়তো ভারতের যযাতি—নিজের পাঁচছেলের মধ্যে তিন ছেলের নাম প্রথম যযাতির ছেলে তিনটির নামেই রেখেছিলেন। স্বর্লোক বা ভুবলোকের নহুষ যযাতির সঙ্গে ভূলোকের যযাতি তাই মিশে গেছে। তবে পৌরাণিক যযাতি সম্ভবতঃ ভারতের এই দ্বিতীয় যযাতি। পুরু রাজা হলেও যযাতির পাঁচ ছেলেই ভারতে পাঁচটি রাজ্য স্থাপন করেন। অসিক্লী নদী তীরে পুরু, পরুষ্ণী নদী-তীরে অনু, আর তাদের দুই রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে দ্রহ্যু এবং ঝিলান ও সিন্ধুর পাশে যদু ও তুর্ব্বসু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে থাকবেন।

হয়তো এই পাঁচটি ভূখণ্ডই আজ পঞ্জাব। ঋগ্বেদেও এই ভূ-খণ্ডের উল্লেখে পঞ্চজন, পঞ্চকৃষ্টি, পঞ্চশ্রেণীর নাম দেখতে পাওয়া যায়।

চন্দ্রবংশের রাজা যযাতি যখন রাজত্ব করছেন, সূর্য্যবংশের রাজা তখন উষদস্ব। সে আজ ৭০০০ বছর আগের কথা।

এবার মোটামুটি আমরা সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের ধারা পেলাম। এই উভয় বংশের মধ্যে তখন বিবাহের আদান-প্রদান চলতো।

প্রধান এই দুটি বংশই ভারতের মূল রাজবংশ। এই দুই বংশ ধ'রেই ভারতের দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত রচিত।

রাজা যযাতির ছিল চারটি মেয়ে। তাদের বিয়ে হলো চার জায়গায়। প্রথমটির সূর্য্যবংশীয় রাজা উষদাস্বের সঙ্গে—তাঁদের ছেলে বসুমনা। দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হ'লো রাজা উশীনরের সঙ্গে—তাঁদের পুত্র শিবি। তৃতীয়ার রাজা দিবোদাসের সঙ্গে—তাঁদের সন্তান প্রতদন। আর চতুর্থটির স্বামী হ'লেন বিশ্বামিত্র। এঁর পুত্র অষ্টক। এই চারজনই সূর্য্যবংশের দৌহিত্র। এঁরা প্রত্যেকেই এক একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন।

যযাতির পুত্র যদু থেকেই যাদব বংশের প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমান গুজরাট ও কাথিওয়াড়ার কাছে সে বংশের ধারা দেখতে পাওয়া যায়।

তুর্ব্বসু তাঁর বংশ বিস্তার করলেন ঝিলামের নিকটবর্ত্তী স্থানে। অনু করলেন অসিক্লী নদীর পরপারে আনববংশের প্রতিষ্ঠা, দ্রহ্যু করলেন গান্ধারে নিজনামে এক রাজ্য আর পুরু পিতার সিংহাসনে বসে পৌরব-বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন।

যদু ছিলেন শ্রেষ্ঠ বীর। বহু অনার্য্যদের তিনি জয় করেছিলেন।

যদুর ছেলেদের মধ্যে ক্রোষ্টী ও সহস্রজিৎ প্রধান। এদের দুই ধারা ক্রমে বিস্তারের দিকে এগিয়ে চললো।

এই সময় চন্দ্রবংশে আর এক রাজার নাম আমরা দেখতে পাই, রাজা পরীক্ষিৎ ও তাঁর পুত্র জন্মেজয়। এ পরীক্ষিৎ কিন্তু অভিমন্যুর পুত্র নয়। ইনি প্রথম পরীক্ষিৎ, তাঁর পুত্রও প্রথম জন্মেজয়। এঁদের গুরু ছিলেন তুরকাবষেয়। ইনি রাজাকে ঐন্দ্র অভিষেক ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

এদের পরেও আবার দেখতে পাই দ্বিতীয় পরীক্ষিৎ, দ্বিতীয় জন্মেজয়ের নাম। এঁদের গুরু ছিলেন ইন্দ্রোত। দৈবাপি, শৌনিক এঁরাও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তৃতীয় পরীক্ষিৎ ও জন্মেজয় হলেন মহাভারত-খ্যাত পাণ্ডব বংশের অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর সন্তান। এঁদের গুরু ধৌম্য।

এই প্রথম জন্মেজয়ের কয়েকপুরুষ পরে রাজা হলেন ঐনিল। প্রবাদ আছে এই ঐনিল যম রাজার কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য 'যম' হলো উপাধি। এই 'যম' উপাধি বহু জায়গাতেই আমরা দেখতে পাই। আবেস্তার 'যিম' কথাটা এই যম থেকেই এসেছে মনে হয়।

এই ঐনিলের পুত্র হলেন মহাভারতখ্যাত রাজা দুষ্মন্ত। যাঁকে নিয়ে কবি কালিদাসের অমর কাব্য 'শকুন্তলা'।

এর পরেই পাই আমরা ভরতের কথা। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সন্তান এই ভরত। ভরতের কোন পুত্র-সন্তান না থাকায় বৃহস্পতি পুত্র ভরদ্বাজকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

এই ভরদ্বাজের জন্মবৃত্তান্তও অদ্ভুত। বৃহস্পতির ভ্রাতৃবধূর গর্ভে এই সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই ভরদ্বাজের পুত্র ভূমন্যু, ভূমন্যুর পুত্র সুহোত্র,

এবং সুহোত্রের পুত্র হস্তী। হয়তো এঁরই নামানুসারে হস্তিনাপুর নগরের প্রতিষ্ঠা। অনেকে বলেন, এ **হস্তী** অপর এক রাজা।

যাই হোক, রাজা হস্তীর পর আমরা পাই রাজা **অজমীঢ়ের** কাহিনী। নামটা আজমীঢ়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেকে বলেন, **এই** অজমীঢ় হস্তীর ছেলে। অজমীঢ়ের পুত্র হলেন **সম্বরণ**। তাঁর পুত্র নীল, এবং নীলের পুত্র সুশান্তি। এই সুশান্তির পুত্র পুরুজানু এবং তাঁর পুত্র ঋক্ষ। ঋক্ষের পাঁচটি ছেলেই পাঞ্চাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

অনেকে বলেন ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ। সম্বরণ ঋক্ষের ছেলে, কি অজমীঢ়ের ছেলে বলা কঠিন। রাজা সম্বরণ সূর্য্যকন্যা তপতিকে বিবাহ করেন। এই সম্বরণকে নিয়ে পুরাণে অনেক গল্প আছে।

অনেকে বলেন এই পাঞ্চাল থেকে সম্বরণকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সম্বরণ সিন্ধুনদীর তীরে পালিয়ে যান এবং পরে বশিষ্ঠকে গুরু ক'রে হস্তিনাপুর জয় করেন। তাঁরই পুত্র **কুরু**। তিনি কুরু-জাঙ্গল প্রদেশের প্রতিষ্ঠাতা—এবং সম্ভবতঃ তিনিই কৌরব বংশের আদি-পুরুষ।

এই কুরুর ছেলেই আবার পরীক্ষিৎ এবং তাঁর ছেলে জন্মেজয়। এঁরা কিন্তু দ্বিতীয় পরীক্ষিৎ জন্মেজয়, তারপর তৃতীয় **পরীক্ষিৎ** ও তৃতীয় **জন্মেজয়** অর্জুনের পৌত্র ও প্রপৌত্র।

জর্জ্জ, জার, উইলিয়াম প্রচেতার মতন হয়তো একই নাম বারম্বার ব্যবহার করা হয়েছে। এই দ্বিতীয় জন্মেজয়েরই গুরু ঐন্দ্রোৎ শৌনিক।

কোন কোন পৌরাণিক আখ্যানে বংশধারা বেশী না টেনে জন্মেজয়ের ছেলে ধৃতরাষ্ট্র আর তাঁর দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক এই তিন ছেলের বর্ণনা করেছেন। এ ধৃতরাষ্ট্রও কিন্তু খ্যাত কৌরব-রাজ ধৃতরাষ্ট্র নয়। দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীকের মধ্যে জ্যেষ্ঠ্যপুত্র দেবাপি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন বলেই রাজা **শান্তনু** রাজ্য পেলেন।

এই **শান্তনু** থেকেই আমাদের অতি পরিচিত মহাভারতের বিচিত্র কাহিনী সুরু।

শতপথ ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে আছে যে, ঐন্দ্রোৎ শৌনিক-পুত্র ও উদ্দালক আরুণি প্রভৃতি শিষ্যের দল জনক ঋষির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে কেকয় রাজ অশ্বপতির সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এই অশ্বপতিই রামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের মাতামহ।

যাক্ এই রাজা জন্মেজয় থেকে অনেক প্রসিদ্ধ রাজার পর—রাজা **প্রতীপ** সিংহাসনে বসেন। প্রতীপের পর রাজা হ'ন শান্তনু।

পাঞ্চাল বংশ

ভারতের ইতিহাসে প্রাচীন বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র-বংশের পরই যে বংশটি প্রসিদ্ধ সেটি হচ্ছে পাঞ্চাল বংশ। পাঞ্চালের মধ্যে 'পঞ্চ' শব্দটি আছে। তাতে হয়ত মনে হবে পাঁচজন। পাঁচজন মানে সাধারণতন্ত্রে গঠিত রাজ-বংশ। কিন্তু পুরাণ বলে যে চন্দ্রবংশের রাজা অজমীরের ছেলে নীল, তার পুত্র সুশান্তি এবং তাঁর সন্তান পুরুজানু আর এই পুরুজানুর ছেলে হলেন ঋক্ষ। সেই ঋক্ষের পাঁচ পুত্র **—মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীয়ান ও কাম্পিল্য।** এই পাঁচপুত্রকে দিয়ে রাজা ঋক্ষ পাঞ্চাল রাজ্যের সূচনা করেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র মুদ্গল—তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রসেনা। নল-দয়মন্তীর মেয়ে তিনি। পুরাণে আছে এই ইন্দ্রসেনা রথ চালনা করতেন। রথাশ্ব বর্ণনায় আছে, তারা ঘাস বা জল খেত না। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে সে রথ বায়ু-যান। পুরাণেও সেই রকমই বর্ণনা আছে।

রথ চালনায় দক্ষা নারী—আরও একজনের নাম আমরা দেখতে পাই রামায়ণে। তিনি দশরথ-পত্নী কৈকেয়ী।

সে যুদ্ধে তিনিই রথ চালনা করেন যে যুদ্ধে দশরথ আহত হন। স্বামীর সেবা ক'রে তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন বলে দশরথ সেই সময় কৈকেয়ীকে তিনটি বর দিতে চেয়েছিলেন। সে কাহিনী পরে হবে।

যাক, এই ইন্দ্রসেনার স্বামী মুদ্গল পাঞ্চাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তবে পাঞ্চালের পাঁচটি রাজ্য পাঁচ ভায়ের অধিকারে থাকে।

তবে মুদ্গল প্রভৃতির বাপের নাম আমরা বায়ু পুরাণে পাই ঋক্ষ, কিন্তু হরিবংশে নাম তাঁর বাহ্যশ্ব, বিষ্ণু পুরাণে হর্যশ্ব, আর ভাগবতে হলেন ভর্ম্যাশ্ব। একই লোকের কত নাম। তাই নাম বিভ্রাট সর্বত্রই। পাঞ্চাল রাজ্যে এই বাহ্যশ্ব বা হর্যশ্ব বংশে এক দিবো-দাসের নাম পাই—যাঁর পিতার নাম বিষ্ণু পুরাণে বৃদ্ধাশ্ব। কিন্তু ঋগ্বেদে আছে, চন্দ্রবংশজাত বধ্র্যশ্ব রাজার পুত্র দিবোদাস এবং তিনিই

প্রাচীন। সুতরাং তাঁকেই বলবো আমরা প্রথম দিবোদাস আর পাঞ্চাল দিবোদাসকে দ্বিতীয়। দিবোদাসের সবচেয়ে বড় কীর্ত্তি হ'লো উদব্রজ পর্ব্বতের রাজা সম্বরাসুর-বিজয়।

সে যুগেও সম্বরাসুরের রাজ্যে বড় বড় পাথরের প্রাসাদে ভাস্কর্য্য-শিল্পের পরিচয় ছিল, যেমন দেখতে পাই আমরা ভাগবতে হিরণ্যকশিপুর রাজসভা বর্ণনায়। মহাভারতেও আছে ময়দানবের কীর্ত্তি। আজ মহেঞ্জদারোয় সে প্রাচীন নিদর্শন তো আছেই।

এই দিবোদাসের সঙ্গে আছে কাশীর ইতিহাস জড়িয়ে। দিবো-দাসের পুত্র দেববান এবং তার পুত্র পিজবন। এই পিজবনের সন্তান ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুদাস। অবশ্য দেববানের নামও সে তুলনায় কম নয়। এই দেববান 'উর' প্রদেশ জয় করেন। এই 'উর' প্রদেশ হয়তো আজ মেসোপটমিয়ার অন্তর্গত। ব্যাবিলন ও লগস্‌বাসীদের সঙ্গে দেববানের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তিনি জয়ী হন। সেই সময় দেববান আরমাক্ বা ইরাক পর্য্যন্ত অধিকার করেন।

দিবোদাসের পর পাঞ্চাল বংশে যাঁর নাম খ্যাত ছিল তিনি পৃষত রাজার ছেলে দ্রুপদ। এঁরই মেয়ে দ্রৌপদী। এই দ্রুপদ রাজার বাল্যবন্ধু ছিলেন দ্রোণ। একদিন ঋষি ভরদ্বাজ কাননচারিণী অপ্সরী ঘৃতাচীকে দেখে কাম-মোহিত হন। তাতে হয় তার রেতঃ-স্খলন। ভরদ্বাজ সেই বীর্য্য তুলে রাখলেন এক দ্রোণী বা কলসীর মধ্যে। সেই দ্রোণী মধ্যেই জন্ম নেন পুত্র দ্রোণ। প্রথম জীবনে করলেন তপস্যা— পরের দিকে সংসার করতে গিয়ে কৃপাচার্য্যের ভগ্নীকে বিবাহ ক'রে তিনি হয়ে পড়লেন নিঃস্ব। দুঃখ নিজেরা হয়ত সহ্য করতেন, কিন্তু শিশু পুত্র অশ্বত্থামার জন্য তাঁকে যেতে হল তাঁর বাল্যবন্ধু দ্রুপদের কাছে। কিন্তু দ্রুপদ তাঁকে চিনতে পারলেন না।

বললেন, "রাজার বন্ধু হবে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ—এ অসম্ভব কথা।"

দ্রোণ ক্ষোভে, দুঃখে ফিরে এলেন।

এইখান থেকেই বোধহয় কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের বীজ বপন! পাঞ্চালী দ্রৌপদীকে নিয়ে সে যুদ্ধ-কাহিনী আছে মহাভারতে। দ্রুপদ অস্বীকার করলেও দ্রোণ কিন্তু ভোলেননি বন্ধুকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে

দ্রোণ—পরাজিত দ্রুপদকে বধ করতে পারেন নি, দিয়েছেন মুক্তি।

দ্রুপদের ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন। ইনি পাণ্ডবের সেনাপতি ছিলেন। জয়ীও হয়েছিলেন সব যুদ্ধে। কিন্তু অশ্বত্থামা গোপনে একরাত্রে নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাণ্ডবজ্ঞানে হত্যা করেন। তারপর আর পাঞ্চাল-বংশ-খ্যাত কোন কাহিনী পুরাণের পাতায় পাওয়া যায় না।

অনুবংশ

চন্দ্রবংশের রাজা যযাতির পুত্র **অনু কর্তৃক** এই বংশ প্রতিষ্ঠিত। এই অনুর বংশধরগণই সম্ভবতঃ পরুষ্ণী বা রাবী নদীর তীরে হরি-যুপীয়া বা বর্ত্তমান হরপ্পার প্রতিষ্ঠাতা।

প্রথম এ রাজ্যের উপর আক্রমণের ইতিবৃত্ত পাই **বরশিখ** নামে এক রাজার কাহিনীতে। চয়মানের ছেলে **অভ্যবর্ত্তী** বরশিখ-বংশধরদের হত্যা করে রাজ্য কেড়ে নেন। এই **চয়মান** সম্ভবতঃ পার্থিয়াবাসী ছিলেন। তবে এঁরাও যে আর্য্য ছিলেন এর প্রমাণ পাই ঋগ্বেদে—চয়মান পুত্র অভ্যবর্ত্তীর দান-প্রসঙ্গে। ভরদ্বাজ প্রভৃতিকে ইনি বহু গো-ধন দান করেন। আর্য্য দাতা না হলে, সে যুগে ঋষিরা দান নিতেন না।

যাই হোক, এই হরিয়ুপা বা বর্ত্তমান হরপ্পা শেষ পর্য্যন্ত রাজা সুদাস ত্রসদস্যুর সাহায্যে অধিকার করেন।

অনুবংশীয় রাজা বলির সঙ্গে দীর্ঘতমার কাহিনী যে জড়িত সে আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। দীর্ঘতমার ঔরসে রাজা বলির স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে যে পাঁচ পুত্র হয় তাদের নাম **অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্ম**। এঁরাই আপন আপন নামে রাজ্য বিস্তার করেন। আজও সে নামের যে অস্তিত্বটুকু আমরা দেখতে পাই, হয়ত তার কিছু কিছু বদল হয়েছে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় নি। যেমন মগধের উত্তর দক্ষিণ ভাগ হলো অঙ্গদেশ, বঙ্গ—আমাদের বাংলা দেশ। কলিঙ্গ মানে উড়িষ্যা—কিন্তু আজ কলিঙ্গ মাত্র একটি গ্রাম। পৌণ্ড্র রাজ্য বা পৌণ্ড্রিয়া—যাকে পূর্ণিয়া বলা হয়। আর আসুহ্ম বা আসামই হলো সুহ্ম দেশ। সমগ্র উত্তর-পূর্ব্ব ভারতই হলো এই পঞ্চদেশের সমষ্টি।

পাঞ্চালের পর আবার এই অনুবংশীয় সন্তানের পঞ্চ দেশ।

'পঞ্চ' যেন সেযুগের পরিণতি—যেন সবই সাধারণের পাঁচজনার।

যদুবংশ

চন্দ্রবংশীয় রাজা দ্বিতীয় যযাতির পুত্র হ'লো যদু। তাঁর দুই পুত্র—সহস্রজিৎ ও ক্রোষ্টা। যদুবংশ-তিলক **শ্রীকৃষ্ণ** বা কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুনের মতো দু'চারজন রাজা ছাড়া বড় বেশী রাজার পরিচয় আজ আর জানা যায় না। তবে এক রাজা ছিলেন **ভদ্রশ্রেণ্য**। **কাশী**রাজ প্রথম দিবোদাসের কাছ থেকে এই ভদ্রশ্রেণ্য **কাশী** অধিকার করেন। পরে অবশ্য দিবোদাসের পুত্র দুর্দ্দমের কাছে তিনি পরাজিত হন। যদুবংশীয় আর এক রাজা **মহিষ্মান** নর্ম্মদা তীরে মাহিষ্মতী পুরী নির্ম্মাণ করেন ব'লে জনশ্রুতি আছে। এর কয়েকপুরুষ পরে যদুবংশীয় রাজা কৃতবীর্য্যের পুত্র সহস্রবাহুর সন্তান অর্জ্জুন পিতামহের নামের সঙ্গে তাঁর নামটা জুড়ে দেন এবং পিতার সহস্রবাহু নাম বিশেষণরূপে ব্যবহার করেন। যাঁর ফলে তাঁকে সবাই বলতো সহস্রবাহু **কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন**। সত্যিই হয়তো সহস্রবাহু তাঁর ছিল না। সহস্রবাহুর শক্তি তিনি ধরতেন—তাই সহস্রবাহু। এই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনই জমদগ্নি ঋষিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলেন। যদুবংশের এ এক কলঙ্ক। এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন জমদগ্নি-পুত্র **পরশুরাম** পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় ক'রে।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হৈহয়বংশীয় অনেকে বলেন। কিন্তু হৈহয় যদুবংশেরই এক রাজার নাম। হৈহয়দের অত্যাচারে অযোধ্যার রাজা **বাহু** রাজ্য ত্যাগ ক'রে পালিয়ে যান ঊর্ব্বঋষির আশ্রমে। সেখানেই বাহুর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে—নাম **সগর**। বিদর্ভ রাজার মেয়ের সঙ্গে এই সগরের বিয়ে হয়। বিদর্ভের অধস্তন ভীমের কন্যা দময়ন্তীর সঙ্গে **নলের** বিবাহ হয়। এই বংশের চেদি রাজা তাঁর নিজের নামে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই চেদি বংশেই শিশুপালের জন্ম। সেযুগে চেদিবংশের খুব খ্যাতি ছিল। এই বংশেরই সন্তান হলেন **বসুদেব**—যিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা।

আবার ক্রোষ্টারই এক পুত্র বৃজিনীবানের বংশে **উগ্রসেনের** জন্ম। দেবকী তাঁরই কন্যা—**কংস** হ'লো তাঁর পুত্র।

যদুবংশের খ্যাতি এই বসুদেব, দেবকী, কংস ও কৃষ্ণকে নিয়ে। জরাসন্ধ ছিলেন তখনকার দিনে মস্তবড় বীর। কিন্তু বড় অত্যাচারী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সে অত্যাচার দমন করেন। কংসও ছিলেন অত্যাচারী—তাঁকে তিনি হত্যা করেন। উগ্রসেনকে সেই সিংহাসনে বসিয়ে নিজে মথুরা ত্যাগ ক'রে দ্বারকায় যান। সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ রাজা হননি কোনদিন।

রাজা হবার সুযোগও কারো হয়নি। পরস্পর আত্মকলহে এবং অসংযমের ফলে নিজেরাই ধ্বংস হ'য়ে যান।

শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী পাই আমরা মহাভারতে, ভাগবতে ও অসংখ্য পুরাণাদিতে। শ্রীকৃষ্ণ হলেন যদুবংশের মধ্যমণি। শুধু যদুবংশ কেন—ভারতের দেবতা তিনি। যাঁর মুখনিঃসৃত গীতা, শ্রেষ্ঠ দর্শন রূপে চিরদিন সর্বত্র পূজা পেয়ে আসছে।

বৈশালী বংশ

বৈবস্বত মনুর এক পুত্র **নাভাগ**। তাঁর খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত। এঁরই বংশের **মরুত্ত** রাজা এক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ রাজ্যের নাম উশীর-বীজ। কে জানে এই উশীর বীজ থেকেই উজীর-বীজ বা ওজির-বিজান হয়েছে কিনা। মরুত্ত রাজা যজ্ঞ করেন। বৃহস্পতিকে সেই যজ্ঞ সম্পাদন করতে বললেন, কিন্তু তিনি ইন্দ্রের যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন তাই তাঁর ভাই সংবর্ত্তকে পাঠালেন সেই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করতে। কিন্তু যজ্ঞ সম্পূর্ণ হ'লো না, রাবণ সে রাজ্য আক্রমণ করলেন। সংবর্ত্ত মরুত্তকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করলেন। যুদ্ধ না ক'রেও সে আক্রমণ তিনি প্রতিহত করেন। এ গল্প পাই আমরা রামায়ণে। এই মরুত্তের অধস্তন একাদশ পুরুষ হলেন রাজা **বিশাল**। তাঁর রাজ্য বৈশালী। পশ্চিমে গণ্ডক, পূর্বে সদানীরা—এরই মধ্যে তাঁর রাজ্যের সীমানা।

মিথিলা রাজ-বংশ

সূর্য্যবংশের রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি এই বংশের আদিপুরুষ। কোথায় তিনি রাজত্ব করেছিলেন তা জানা যায় না। শুধু দেখতে পাই, সতীর অপমানে মহাদেব যখন বিশ্ব ধ্বংস করতে উদ্যত তখন

দেবতাদের অনুরোধে তিনি তাঁর উদ্যত ধনু শান্ত করে মিথিলার রাজা দেবরাতের কাছে সেই ধনু গচ্ছিত রাখেন। এই গচ্ছিত হর-ধনু সেই থেকেই মিথিলার সম্পত্তি। যে হরধনুর কাহিনী আমরা রামায়ণে দেখতে পাই। যে হরধনু ভঙ্গ করেই দশরথ-পুত্র রামচন্দ্র জনক-নন্দিনী সীতাকে বিবাহ করেন। রামায়ণে অবশ্য বাইশ জন জনকের সন্ধান পাই। তাই মনে হয়, জনক ব্যক্তির নাম নয়—উপাধি বিশেষ। নইলে সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ আর জনক—স্বর্গ-মর্ত্ত্য একাকার মতন এক বিভ্রাট মাত্র।

এই বংশে এক রাজার নাম দেখি বিদেহ-মাধব। এই বিদেহের পুরোহিত ছিলেন গোতম রহুগণ। সেকালে রাজধর্ম্মের রীতি ছিল, রাজাকে অগ্নিহোত্র হ'য়ে অগ্নি স্থাপনের জন্যে স্থান অন্বেষণ করতে হ'তো। এখনকার দিনে যেমন হয় ভিত্তি স্থাপন, তখন হ'ত অগ্নি স্থাপন। যাই হোক, এই অগ্নি ও রাজাকে সঙ্গে নিয়ে গোতম হাঁটতে হাঁটতে এলেন সদানীরার পূর্ব্বতীরে।

গণ্ডকও ছিল সেই দিকে। দেখলেন, পশ্চিম তীরে আর্য্যগণ অগ্নি-স্থাপন করেছেন। পূর্ব্বতীরে রাজা অগ্নিস্থাপন করলেন। বিদেহ-মাধব থেকেই হ'লো সেই স্থানের নাম বিদেহ বা মিথিলা।

রামায়ণের সময় যে **জনক** এখানে রাজত্ব করতেন তাঁর নাম ছিল **শীলধ্বজ**। উপনিষদে বেদে জনক রাজাকে ঋষি বলা হয়েছে। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ মুক্তপুরুষ। তাঁর কাছে বড় বড় ঋষিরাও উপদেশ নিতে আসতেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, সত্যযজ্ঞ পৌলুসী, প্রাচীন শাল, ঔপমন্যব বুড়িল আশ্বতরাশী, উদ্দালক, আরুণি, উপমন্যু এবং গার্গী, অরুন্ধতী সকলেই আসতেন এই রাজসভায় শাস্ত্রালোচনা করতে।

আজ মিথিলা রাজ্যের নাম ত্রিহুত হলেও জনকপুরী বা মৈথিলীরা সেই প্রাচীন মিথিলা-বংশ এবং জনককে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিশ্বামিত্র বংশ

অত্রির পুত্র চন্দ্র এবং তাঁর সন্তান পুরুরবা এ আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। পুরুরবার পুত্র অমাবসু এও বলা হয়েছে। এই অমাবসুর কয়েক পুরুষ পরে আমরা পাই **জহ্নু** রাজার নাম। যাঁর সঙ্গে সূর্য্য-

বংশীয় যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীর বিয়ে হয়। এই যুবনাশ্ব মান্ধাতার পিতা নন—ইনি তারও আগে, জম্বুর কয়েক পুরুষ পরে রাজা **কুশিক**। কুশিকরা ছিলেন চার ভাই। তার মধ্যে **কুশনাভ** দ্বারা মহোদয়-নগর, **কুশাম্ব** দ্বারা কৌশাম্বী, **অমূর্ত্তরজ** দ্বারা ধর্ম্মারণ্য, আর **বসুগিরি** দ্বারা ব্রজনগর স্থাপিত হয়। এই মহোদয়ই কান্যকুব্জ।

কুশিকের পরবর্ত্তী রাজার নাম **গাধী**। গাধী-নন্দন **বিশ্বরথ** ক্ষত্রিয় হয়েও ব্রাহ্মণত্বের জন্যে তপস্যা করেছিলেন। এ সম্বন্ধেও একটি মজার গল্প আছে।

ঋষি বশিষ্ঠের আশ্রমে একটি কামধেনু ছিল। সেই ধেনুটির প্রতি লোভ হওয়ায় বিশ্বরথ একদা সেই গাভীটি চেয়ে বসলেন বশিষ্ঠের কাছে। বললেন আপনি ঋষি, আপনার আবার কামনা কি—অতএব গাভীটি আমাকে দান করুন। বশিষ্ঠ রাজি না হওয়ায় বিশ্বরথ বলপূর্ব্বক সেই গাভীটি হরণ করলেন। এই ধেনুর একটি গুণ ছিল—তার কাছে যখন যা চাওয়া যেতো তাই পাওয়া যেতো। বিশ্বরথের ধেনু অপহরণের এই হ'ল কারণ।

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বরথকে ক্ষমা করলেন। ব্রাহ্মণের এই ক্ষমা দেখে বিশ্বরথের চৈতন্য হ'লো। তিনি তখন এই ব্রাহ্মণ হবার জন্যে তপস্যা সুরু করলেন। তপস্যার দ্বারা ক্ষত্রিয় বিশ্বরথ ব্রাহ্মণ হলেন। তখন তাঁর নাম হ'লো **বিশ্বামিত্র**।

অনেকে বলেন প্রকৃত পক্ষে এই কামধেনু কোন গরু বা ধেনু নয়। ব্রাহ্মণ ইচ্ছামাত্র কার্য সফল করতে পারেন, তাদের শব্দকেই সেই অর্থ বা বস্তু অনুসরণ করে—এই ক্ষমতাটাই কামধেনু, বিশ্বামিত্র এই ক্ষমতা অর্জ্জন করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হতে চেয়েছিলেন।

এই ব্রাহ্মণত্ব লাভ মানে, বশিষ্ঠ তাঁকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করলেন। এ গল্প থেকে আমরা এইটুকুই দেখতে পাই, ব্রাহ্মণের ক্ষমাই হ'লো শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই বিশ্বামিত্র বা তাঁর পুত্রগণ রাজা সুদাসকে ভারত-অভিযানে বাধা দেন।

বিশ্বামিত্রের বোনের বিয়ে হয় চ্যবন বংশের ঋষি ঋচিকের সঙ্গে। এই ঋচিক-পুত্র জমদগ্নি ; জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম। **পরশুরাম**

একদা পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃহত্যা করেছিলেন। পুরাণে আছে, ব্রহ্মপুত্র নদী-প্রবাহ পরশুরামেরই কৃতিত্ব। পরশুরামের কাহিনীতে পুরাণ পূর্ণ।

কাশীরাজ বংশ

পুরাণ বলে চন্দ্র বংশের রাজা আয়ুর পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধের ছিল সুহোত্র নামে এক পুত্র। সুহোত্রের ছেলের নাম কাশ। এই কাশই কাশী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

কিন্তু এই কাশী তীর্থটি হিন্দুর ধর্ম্মে, কর্ম্মে, শিক্ষায় ও কৃষ্টিতে এতখানি গৌরব লাভ করেছিল যে—এই কাশী কি বা কোথায় এ নিয়ে গবেষণার আর অন্ত নেই। কেউ বলেন এই দেহই কাশী। বরুণা ও অসি এই ইড়া ও পিঙ্গলা। তার মধ্যে এই বারাণসী হচ্ছে দেহমধ্যস্থ মূলাধার। কিন্তু এতো দেহতত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্বের কথা।

ঐতিহাসিক দিক দিয়েও বর্ত্তমান কাশীই যদি ঐ কাশরাজার সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তো ভারতের ঐ ভূ-ভাগ তখন জলমগ্ন ছিল না। ভূ-বৃত্তান্ত তা' বলেনা। রাজা কাশের বহু পরেও ঐ ভূমি ছিল সাগর-গর্ভে, অগস্ত্যের জলপানে এই জমির উদ্ভব। আবার ভগীরথ দ্বারা নদীপ্রবাহে উর্ব্বরতা হয়। তবে এ কাশী বা কাশীরাজ প্রতিষ্ঠিত সে রাজ্য কোথায়? ভবিষ্য পুরাণে ব্রহ্মখণ্ড নামক অংশে আছে যে, একদা কাশীপতি ছিলেন বরণার। কাশীতে আজও এ প্রবাদ প্রচলিত কিন্তু আবার পুরাণেই আছে কাশী পৃথিবীর বাইরে—তাই যখন হরিশ্চন্দ্রকে সর্ব্বস্ব ও পৃথিবী দানের পর অন্যত্র যেতে হয় তখন তাঁকে পৃথিবীর বাইরে সেই কাশীতেই যেতে হল, যে কাশী ছিল এই জগতের বাইরে মহাদেবের ত্রিশূলের উপর স্থাপিত। তখন ভারতকেই বলা হয়েছে পৃথিবী। তাহলে' ত কাশী ভারতের বাইরে অর্থাৎ পৃথিবীর বাইরে এই ভাবেই হয়তো বর্ণিত কিন্তু সে কাশীই বা ভারতের বাইরে কোথায়?

হয়তো তবে সে কাশী সিন্ধু নদীর ওদিকে বা পশ্চিমে ছিল।

প্রাচীনকালে সমুদ্র গর্ভথেকে সিন্ধুর পশ্চিমা দিকের জমি যখন ওঠে তখন বর্ণ বা বরাণস্ নামে এক রাজ্য গড়ে ওঠে। তা থেকেই হয়তো নাম এই বান্নু বা বারাণসী।

আবার 'অন্থরমজদ' স্থাপিত চতুর্দ্দশ প্রদেশ এই "বরেণা।" বরণ নামটি পাণিনিতেও আছে। বরণা থেকে বারাণসী হওয়া খুব সম্ভব। হয়তো এই বরণা বা বরণস্ প্রদেশেরই রাজা ছিলেন এই বরণার। মোট কথা কাশ থেকে কাশী আর বরণার থেকে বারাণসী নাম দুটীর জন্ম। তবে আজও কাশীর দুইদিকে বরুণা ও অসি আছে। আর তার মধ্যবর্ত্তী ভূ-ভাগের নাম বারাণসী।

যদুবংশীয় রাজা ভদ্রশ্রেণ্য বারাণসী অধিকার করেছিলেন। তাঁর ছেলে ছিল দুর্দ্দম। হয়তো খৃঃ পূঃ ৪৪ শতাব্দীতে ক্ষেমক নামক কোন অত্যাচারীর অত্যাচারে বারাণসী ধ্বংস হয়। পৌরাণিক মতে হাজার দুই বৎসর বারাণসী এই ধ্বংসরূপে ছিল।

তারপর সেই সিংহাসনে বসেন রাজা **দিবোদাস**। ইনি অবশ্য দ্বিতীয় দিবোদাস। দিবোদাস ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। তাই যখন নিকুম্ভ নামক একজন শৈব কাশীতে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন তখন দিবোদাস সে মূর্তি উপড়ে ফেলেন। রাজার এ আচরণে বহু ভক্ত প্রজা ব্যথিত হয়ে কাশী ত্যাগ করে। রাজা চিন্তিত—এই সময় যদুবংশীয় **বীতহব্য** সসৈন্যে কাশী আক্রমণ করেন কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। দিবোদাস পুত্র প্রতর্দ্দন তখন তাকে অনুসরণ করে আসেন ভৃগু ঋষির আশ্রমে। বীতহব্য বিপন্ন হয়ে ঋষির আশ্রয় নেন। ঋষি ভবিষ্যতের কথা ভেবে বীতহব্যকে ব্রাহ্মণত্বে দীক্ষা দেন। প্রতর্দ্দন উপস্থিত হয়ে, কোন ক্ষত্রিয় বা অন্যজাতি এ আশ্রমে আছে কি না প্রশ্ন করায় ঋষি অকপটে বলেন আশ্রমে যাঁরা থাকেন তাঁরা সব ব্রাহ্মণ। ঋষি জীব-হত্যা নিবারণের জন্য বীতহব্যকে ব্রাহ্মণত্ব দিয়ে মিথ্যাকে সত্য করলেন—দিবোদাস দেখলেন প্রজারা রুষ্ট হলে অমঙ্গল অনিবার্য্য। তাই তিনি এক ব্রাহ্মণেরই উপদেশে কাশীতে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তার পর থেকেই ধীরে ধীরে কাশীর সমৃদ্ধি বেড়ে উঠে।

এই দিবোদাসের বোনের নামই অহল্যা। ইন্দ্রের অনুগ্রহ ও ভালবাসা পাওয়ার অপরাধে অহল্যার স্বামী গৌতম অহল্যাকে 'পাষাণী' হবার অভিশাপ দেন।

এইখানেও এক মজা দেখি শব্দের অর্থ করলে। হল্ দিয়ে যা কর্ষণ করা যায় তাই হ'ল "হল্য"—যা কর্ষণ করা যায় না তাই হলো "অহল্যা"। অহল্যা সে ভূ-ভাগ তখন আর গো-তম অর্থাৎ—শ্রেষ্ঠ গরুতেও তা কর্ষণ করা যেত না। অহল্যা চাইলেন সহস্র চক্ষু ইন্দ্রের করুণা। ইন্দ্র অর্থে আকাশ, আকাশ ভরা সহস্র তারা। সেই আকাশে মেঘ-সঞ্চারই তাঁর করুণা। রামচন্দ্র হয়তো এই জল সেচের ব্যবস্থা করে হল-কর্ষণের অযোগ্য জমির উদ্ধার করেন।

অনেকে হয়তো বলবেন এটা ব্যর্থ কল্পনা বা অবিশ্বাসীর পাণ্ডিত্য। আমাদের কাছে গল্পটিই মিষ্টি।

তবে বেশ বোঝা যায় সে যুগে এক পতির আরাধনাই সতীর কর্ত্তব্য বলে গণ্য হলেও বহু ভর্ত্তা বা একাধিক প্রেম বর্ত্তমান ছিল।

কাশীখণ্ডে আছে আর এক রিপুঞ্জয় রাজার কাহিনী কিন্তু অনেকে মনে করেন এই রিপুঞ্জয় ও দিবোদাস একই ব্যক্তি।

পাশ্চাত্য ইতিহাসের পাতায় আবার কাশীর ইতিহাসের যে উল্লেখ আছে তাতে পাওয়া যায় যে, কাশীয় জাতি বাবিরুষ নামক স্থান অধিকার করে নূতন এক রাজ্য স্থাপন করে। সেই কাশীয় অধিবাসীগণ ছিলেন আর্য্য-জাতি-সম্ভূত। সর্ব্বপ্রধান দেবতার নাম ছিল সূর্য্যস্—পবন দেবতা মরুত্তস্। তাঁরা তাঁদের স্থাপিত শিলালিপিতেও এই আর্য্য পরিচয়ই লিখে রেখে গেছেন। কাশীয় জাতি কর্ত্তৃক স্থাপিত সেই দেশই নাকি কাশী।

কাশী রাজ্য যেদিনেরই হোক বর্ত্তমান কাশীরও প্রাচীনত্ব কম নয়। এই কাশীর বুকে ছিল সর্ব্ব যুগে শিক্ষা ও দীক্ষা এবং ধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার। কাশীক্ষেত্রের স্বীকৃতিতেই তা সাধারণের গ্রাহ্য হ'ত এবং আজও হয়। তাই শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রচারকগণ কাশীতে প্রথম নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রচার করেছেন।

পতঞ্জলি কৃত মহাভাগে কাশীর শেষ সাধনার কথা লেখা আছে।

পরবর্ত্তী যুগে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এই কাশীতেই ৩০০০ বৌদ্ধ দেখেন এবং কাশীর শত হস্ত দীর্ঘ এক শিবলিঙ্গের উল্লেখ করেন।

তা' ছাড়া পরবর্ত্তী যুগে রাজা মানসিংহ, অহল্যাবাঈ প্রভৃতি রাজা, রাণী, ধনীর কীর্ত্তিতে এবং বহু নরনারীর দানে ও অবদানে কাশী চির-ভাস্বর।

চেদি-বংশ

যযাতি-পুত্র যদুর ছিল দুই ছেলে। তন্মধ্যে ছোট ছেলে ক্রোষ্টার বংশে রাজা বিদর্ভের জন্ম। তিনিই নর্মদা নদীর তীরে বিদর্ভ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদর্ভ-রাজবংশের **চেদি** নামক রাজা বর্ত্তমান এলাহাবাদ বা প্রয়াগের কাছে চেদি রাজ্য স্থাপন করেন।

মহাভারতে পাওয়া যায় যে—চেদিপতি **বীরবাহুর** সঙ্গে বিবাহ হয় নল-পত্নী দময়ন্তীর মাসীর। এই বীরবাহুর ছেলের নাম **সুবাহু**।

বীরবাহু বা সুবাহু নল বা ঋতুপর্ণের সময় যদি রাজত্ব করে থাকেন তবে সম্ভবতঃ সেটা ৩৪০০ খৃঃ পূর্ব্বের কথা। অর্থাৎ প্রায় ৫০০০ বছরেরও আগে ছিলেন তিনি।

তারপর সে রাজ্য জয় করেন রাজা **উপরিচর**, যিনি পুরুবংশের লোক—বা কুরুবংশের পূর্ব্বতন পুরুষ। কিন্তু উপরিচরের চেদি-বিজয়ের পর থেকে শ্রীকৃষ্ণ বা মহাভারতের যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় না—শুধু পাই বিখ্যাত শিশুপালকে। চেদিবংশের দমঘোষেরই ছেলে ছিলেন এই **শিশুপাল**। শিশুপালের মা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিসি। কিন্তু শিশুপাল এমন অত্যাচারী হয়ে উঠলেন যে শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে হত্যা করলেন।

পিসির অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে আত্মীয়ের মর্য্যাদা রাখতে তিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করবেন। করেওছিলেন তাই। তারপর শত অপরাধের পরও সে যখন পাপে নিবৃত্ত হলনা, তখন তাকে বধ করে শিশুপালের ছেলেকেই চেদি-রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মহাভারতের পরবর্ত্তী রাজবংশ

আলোচিত বংশ ও রাজ্য বিস্তৃতি ছাড়াও আরও বহু রাজ্য বা জনপদ বংশ বা ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—ইতিহাস, কাব্য, মহাকাব্য বা পুরাণাদিতে। তবে সাধারণতঃ মহাভারতের যুদ্ধের

পরবর্ত্তী ইতিহাসই তদানীন্তন সুপ্রাচীন শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা বা স্তম্ভাদি নানা উপকরণ দ্বারা যেমন সঠিক জানা যায়, মহাভারতের যুদ্ধের পূর্ব্বেকার ইতিহাস অর্থাৎ ১৯৩৭ খৃঃ পূর্ব্ব সময়ের ধারাবাহিক যথাযথ ইতিহাস তেমন পাওয়া যায় না।

সেকারণ আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগ, আর্য্য বৈদিক যুগ এবং মহাকাব্য বা রামায়ণ মহাভারতীয় যুগের আনুমানিক ইতিহাসের পর প্রাচীন ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস পাই যা ১৯৩৭ খৃঃ পূর্ব্ব হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়টা জুড়ে আছে।

প্রাগৈতিহাসিক ও আর্য্য বৈদিক যুগের যে বিক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায় বেদ, পুরাণ বা প্রবাদ বাক্যের মধ্যে, তাতে দেখা যায় যে প্রাচীন আর্য্যগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতে এসে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে কাবুল থেকে থানেশ্বর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন।

ঋগ্বেদে উল্লিখিত—কুভা (কাবুল) সুবাস্তু (সোয়াট) ক্রমু (কব্রাম) গোমতী (গোমল) সিন্ধু (সিন্ধুনদ) সুষমা (সোহান) বিতস্তা (ঝিলাম) অসীকিনী (চেনাব) মরুবৃদ্ধ (মরুবর্দ্ধন) পরুষ্ণি (রাভি) বিপাসা (বিয়াস) শতদ্রু (সাতলেজ) সরস্বতী, দৃষদ্বতী (চিতাং) প্রভৃতি নদী ও জনপদের নাম আজও আমরা পাই।

তারপর আর্য্যরা ধীরে ধীরে মধ্য ভারতেও উপনিবেশ বসায়। "ব্রাহ্মণ" সমূহে তার যে বিবরণ পাই তাতে কুরুক্ষেত্র (দিল্লী অঞ্চল) কোশল (অযোধ্যা) বিদেহ (উত্তর বিহার) মগধ (দক্ষিণ বিহার) প্রভৃতি দেশের উল্লেখ পাই।

তারপর যখন বংশ ও রাজ্যসীমানা বাড়লো আরও—তখন তারা সে সব রাজ্যের সীমানা করে রাজাও পৃথক পৃথক করে নিলেন।

এইভাবে নানা রাজ্য প্রতিষ্ঠা হল। আজ তা চিনতে হলে বলতে হবে যে বর্ত্তমান থানেশ্বর ও দোয়াবের মাঝখানে কুরুরাজ্য, রোহিলাখণ্ড ও মধ্য দোয়াবে পাঞ্চালরাজ্য, জয়পুরে মৎস্যরাজ্য, মথুরায় শূরসেনদের রাজ্য, অযোধ্যায় কোশলরাজ্য, বারাণসীতে কাশীর রাজ্য এবং উত্তর বিহারে ছিল বিদেহগণের রাজ্য।

এই ভাবে ঠিক মধ্যযুগের পূর্ব্বে—মহাভারতীয় যুগের শেষে

আমরা ভারতবর্ষে পাই প্রাচীন ষোড়শ জনপদ। হিন্দু পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ থেকেই এসব ইতিবৃত্ত সংগ্রহ হয়। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ষষ্ঠশতকে আমরা যে ষোলটি রাজ্যের খোঁজ পাই তার নাম হচ্ছে—অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বৰ্জ্জি বা বৃজি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শৌরসেন, অশ্মক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ।

এসব রাজ্যগুলির মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই ছিল রাজতন্ত্র, তবে বৃজি ও মল্ল প্রভৃতি দু একটি রাজ্যে ছিল গণতন্ত্রের প্রভাব। কপিলাবস্তুর শাক্য, সুমসুমার ভর্গ, পিপ্পলীবনের ময়ূরগণ ক্ষুদ্র জনপদ হলেও গণ-তন্ত্রের অধীনই ছিল। এই গণতন্ত্রের মধ্যে লিচ্ছবিকুলই বিখ্যাত ছিল।

ক্রমে ছোট ছোট সব জনপদ মিলে মিশে গিয়ে, বিজিত ও লুণ্ঠিত হয়ে পাঁচটি শক্তিশালী রাজ্যে পর্য্যবসিত হ'ল। সে চারটি রাষ্ট্র হ'ল—(১) অবন্তী—রাজধানী উজ্জয়িনী (২) বৎস—রাজধানী কৌশাম্বী (৩) কোশল—রাজধানী অযোধ্যা (৪) মগধ—রাজধানী রাজগৃহ।

কিন্তু এ চারটি রাজ্যের মধ্যেও যুদ্ধ ও বিবাদের শেষ ছিল না। বৎস ও অবন্তী নিজ নিজ স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতেই ব্যস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু কোশল ও মগধ আপন আপন প্রাধান্য অর্জন করতে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন। শেষ পর্য্যন্ত মগধই স্বকীয় গৌরবে কীর্ত্তিমান হয়ে ভারত ইতিহাসের মধ্য-মণি রূপে দীপ্ত হয়ে উঠলো। এখানে উল্লিখিত চারটি রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আলোচ্য।

অবন্তী—ইতিহাসের সূত্র ধ'রে আমরা অবন্তী রাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনীর সিংহাসনে দেখি রাজা চণ্ড প্রদ্যোত মহাসেনকে। কিন্তু উজ্জয়িনী আমাদের কাব্য জুড়ে আছে প্রেমরাজ্যের অকুস্থল হয়ে। ভাস তাঁর অপূর্ব্ব স্বপ্ন—বাসবদত্তায় অবন্তী-রাজকুমারী বাসবদত্তার বর্ণনা করেছেন। অবন্তীরাজ বৎস-রাজ উদয়নকে বন্দী করলেও কন্যা বাসবদত্তা যখন বন্দীকেই তার কুমারী জীবন অর্পণ ক'রে বসলেন তখন অবন্তী-পতি সসম্মানেই বরণ করে নিলেন বৎসরাজ উদয়নকে। অবন্তী ও বৎসের বিবাদ গেল ঘুচে। কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রেমে মুগ্ধ। তাই মেঘদূতের মেঘকে উজ্জয়িনীর গল্পও বলেছেন।

বৎস—রাজা উদয়ন ছিলেন বৎস রাজ্যের রাজা—কৌশাম্বী ছিল

তার রাজধানী। আজও এলাহাবাদের নিকটে বহু প্রাচীন কীর্ত্তি ও ভগ্নস্তূপ বুকে নিয়ে কৌশাম্বী জেগে আছে, তার অতীতের দিকে চেয়ে। উদয়ন প্রতিবেশী ভর্গদের রাজ্য নিজ অধিকারে নিয়ে নেন।

কোশল—কোশলই হল বিখ্যাত অযোধ্যা। অবশ্য সরযূ নদীর তীরবর্ত্তী এই নগর ছিল কোশলের রাজধানী মাত্র, তবু শ্রীরামচন্দ্রের অভ্যুদয়ে—মহাকাব্যের বর্ণনায় রাজধানী রাজ্য থেকে খ্যাত হয়ে উঠেছে। প্রাচীন কোশল নামটী হয় তার প্রতিষ্ঠাতা মহাকোশল থেকে। বিখ্যাত সে প্রতিষ্ঠাতার পুত্র ছিলেন প্রসেনজিৎ। ইক্ষ্বাকু সগর, ভগীরথ সব পৌরাণিক শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলি এই কোশল বা অযোধ্যা রাজ্যের সঙ্গে চিরদিনের জন্য জড়িয়ে আছেন। রামায়ণ বলে সেদিন এই কোশল এবং অযোধ্যা যুদ্ধশাস্ত্র ও শিল্প কলায় মহাপথে ও রাজমার্গে তোরণ ও বিপণিতে ছিল অপূর্ব্ব। শতস্তুত ও মগধ ছিল তার গৌরবগানে মুখর। এই কোশলরাজ্য থেকেই গিয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণ ভারতে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে।

এই কোশলই সুপ্রাচীন যুগে বৃহত্তর ভারতের সূচনা করেন লঙ্কা-বিজয়ে। তথাপি চিরদিন একরকম যায় না। প্রাচীন যুগে রামায়ণের গৌরব অর্জ্জন করেও, পরবর্ত্তীযুগে শ্রাবস্তী প্রভৃতি দেশ জয় করেও, সুদূর নেপাল পদপ্রান্তে অবস্থিত শাক্যভূমি বা কাশী অধিকার করেও একদিন কোশল মগধের আক্রমণে স্বীয় স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেয়।

মগধ—মাগধ কথাটির মানে এক রকম যুদ্ধ বিবরণ বা রাজ্যস্তুতি বা জাতীয় সঙ্গীত বিশারদ। হয়তো এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সেই অর্থটিকে রূপায়িত করতেই এর নাম দেন মগধ। প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আমরা প্রাচীন নাম পাই রাজা বৃহদ্রথ।

যদিও তখন মগধ ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী, তবুও সম্ভবত মগধ-রাজ জরাসন্ধের পাপে আর্যরা এ রাজ্যটাকে পতিত করে রাখেন। এ রাজ্যে প্রবেশ করলে যাত্রী ব্রাত্য দোষে দুষ্ট হতেন। বোধ হয় এই পাপকে মহাপুণ্যে পরিণত করতেই বুদ্ধদেবের করুণা হল মগধের উপর। তাইতো দেখি, একদিন এই রাজ্যেই বুদ্ধদেবের করুণাধারা, দেখি মগধ সিংহাসনে বিম্বিসার, অজাতশত্রু, অশোক।

মহাভারতের যুদ্ধে ভীম মগধ রাজ বৃহদ্রথ পুত্র জরাসন্ধকে বধ করে তার ছেলে সহদেবকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও মহাভারত যুদ্ধে হত হ'লে তাঁর ছেলে সোমাধি হলেন রাজা। বৃহদ্রথের সেই বার্হদ্রথ বংশের শেষ রাজা রিপুঞ্জয়কে হত্যা করে মুনিক নামক তারই এক কর্ম্মচারী রাজা হন এবং নিজের ছেলে প্রদ্যোৎকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রদ্যোৎবংশ স্থাপন করেন। প্রদ্যোৎ বংশের পাঁচজন রাজার মধ্যে প্রথম প্রদ্যোৎ এবং শেষ কীর্ত্তিবর্দ্ধন।

১৪৮ বৎসর রাজত্ব করে এই বংশ ৭৬৯খৃঃ পূর্ব্বে শেষ হয়।

শিশুনাগ বংশ—রাজা শিশুনাগ এই বংশ স্থাপিত করলেন। শিশুনাগ বংশের ৪র্থ পুরুষ ক্ষত্রৌজার সময় বস্তী জেলায় কপিলাবস্তু নামক গণ-তান্ত্রিক রাজ্যে শাক্যকুলে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন।

বুদ্ধাবির্ভাব ইতিহাসের একটা যুগ পরিবর্ত্তন করে দেয়। কি ধর্ম্মে, কি শিক্ষায়, কি কৃষ্টি সাধনায়—সে এক স্বর্ণযুগ! সে ধর্ম্মে আর্য্যধর্ম্মের হয়তো কিছু পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু তাঁর সত্য, ধর্ম্ম, অহিংসা ও মহামানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখে দেশের উদার হিন্দু তাঁকে আর্য্যধর্ম্মের একজন অবতার বলে কল্পনা ক'রে পূজা করেছে।

বৌদ্ধযুগ আমাদের মহান ভারতের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

প্রাচীন আর্য্যগণ বিভিন্ন সময়ে ভারতে এসে নিজেদের যে প্রতিভার বিকাশ দেখান, দিকে দিকে যে উপনিবেশ, যে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা, নগর নির্ম্মাণ, সেচ বিভাগের উন্নতি সাধন, শিক্ষা ও কীর্ত্তির প্রসার করেন, যজ্ঞ ও ব্রত, আচার ও সংস্কারে যে দৃঢ়তার ভিত্তি স্থাপন করেন—তা থেকে যখন বৈদিক যুগের লোক ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছিল, ক্রমে আচার ও অনুষ্ঠানের নামে যখন স্বেচ্ছাচারিতার প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছিল, যখন আত্মবলি জীব-বলিতে পরিণত হতে চলেছিল, যখন ভোগ ও আরতি—রতি ও সম্ভোগের পর্য্যায়ে এসে পড়েছিল, যখন সত্য অসত্যের চাপে, দয়া হিংসার জ্বালায়, সংযম ভোগের তাড়নায় ঘুচে যাচ্ছিল—তখন এলেন রাজবংশের আভিজাত্য নিয়ে, ভিক্ষুর দারিদ্র্য নিয়ে, বোধি-সত্ত্বের জ্ঞান নিয়ে ও অহিংসার ব্রত নিয়ে মহান অবতার বুদ্ধদেব।

সেদিন শুধু ভারত নয়, প্রায় সমগ্র জগত স্বীকার করলো—শুধু বৌদ্ধ নয়, হিন্দুও গাইল—

নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহশ্রুতি জাতম্
সদয়-হৃদয়-দর্শিত পশু ঘাতম্
কেশবধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে ॥"

শিশুনাগবংশের সময় কপিলাবস্তুতে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। মগধরাজ বিম্বিসারের সময় তাঁর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হয় এবং রাজা অজাতশত্রুর সময় তাঁর নির্ব্বাণ লাভ হয়।

শিশুনাগবংশ শেষ হয় ৪২৭ খৃঃ পূর্ব্বে। ১৪ জন রাজা রাজত্ব করেন। শেষ রাজা মহানন্দ। মগধরাজ বিম্বিসার বা অজাতশত্রু শিশুনাগবংশীয়গণের পরবর্ত্তী হর্য্যঙ্ক বংশীয় রাজা, কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থের মতে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু শিশুনাগ বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। অনেকে বলেন, শিশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠাতা শিশুনাগ ও বিম্বিসার একই লোক।

অনেকে বলে—শিশুনাগ বংশ থেকেই হর্য্যঙ্ক বংশীয় বিম্বিসার ও তৎপুত্র অজাতশত্রুর প্রতিষ্ঠা। সেই প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত মগধ আপন প্রাধান্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। পূর্ব্বোক্ত প্রধান চারটি জনপদের আপনাপন শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মগধ এ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করে। এমন কি পররাষ্ট্রগ্রাস নীতিরও এই সূচনা। বিম্বিসারের কোশল জয়ে, রাজগৃহ নামক নতুন রাজধানীর প্রতিষ্ঠায় যে সাম্রাজ্যবাদের প্রারম্ভ—অজাতশত্রুর বৃজি মল্ল প্রভৃতি গণ-তান্ত্রিক রাজ্যজয়ে, পাটলিপুত্রের প্রতিষ্ঠায় তা সম্পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে।

হর্য্যঙ্ক বংশ—মতান্তর থাকলেও বৌদ্ধ ইতিহাস বা আধুনিক অনুসন্ধানের পর স্থিরীকৃত হয়েছে যে প্রদ্যোৎবংশের পর মহারাজ বিম্বিসার এই হর্য্যঙ্কবংশ স্থাপিত করেন। বিম্বিসার শ্রেণিক নামে পরিচিত ছিলেন। মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে বসেন বটে, কিন্তু তাঁর সময় থেকেই আধুনিক ইতিহাসের পাতা তাঁর কীর্ত্তিতে মগধকে সাজিয়ে রেখেছে। মগধ এই সময় থেকেই সার্ব্বভৌম নৃপতি হবার আশায় পাগল হয়ে ওঠে। মগধের প্রাকৃতিক

অবস্থানের সুযোগ বিম্বিসার বুঝেছিলেন তাই নিজ পরাক্রমে অঙ্গ বা পূর্ব্ব বিহার জয় করা থেকেই তিনি তাঁর সাম্রাজ্যবাদ জীবনের সুরু করেন। কোশল ও বৈশালীর রাজকন্যাকে ঘরে এনে নিজ রাজ্য আরও বিস্তৃত করেন এবং কোশল রাজকুমারীর সঙ্গে যৌতুক স্বরূপ পান বিখ্যাত কাশীরাজ্য। বৈশালী রাজকুমারীর বিবাহ-যৌতুক বিম্বিসারের রাজ্যসীমানাকে নেপালের তরাই পর্য্যন্ত ছড়িয়ে দেয়। লিচ্ছবির গণতন্ত্রের একটা অংশ এল সাম্রাজ্যবাদীর আওতায়।

বিম্বিসারের সময় জৈন ও বৌদ্ধ দুই ধর্ম্মেরই বিশেষ প্রসার হয়।

নন্দবংশ—পুরাণ মতে বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রুর ছেলে ছিলেন উদয়ী। উদয়ীর পর নন্দীবর্দ্ধন ও মহানন্দী। মহানন্দীর শূদ্রানী পত্নীর গর্ভে জন্মান মহাপদ্ম নন্দ। তিনিই নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

এই সময়ই দেখি ভারতের বুকে গ্রীক রাজ আলেকজাণ্ডার ও পারসীক রাজ দারিয়াসের অভিযান। গ্রীকরা এই নন্দবংশ-জাত ধননন্দকে "এ্যাগ্রার্ম্মিস" বা উগ্রসেন বলে উল্লেখ করেছেন।

৪১৩ খৃঃ পূর্ব্বে এই নন্দবংশ স্থাপিত হয়ে ৮৬ বছর ধরে রাজ্য শাসন করেন। বংশের শেষ হয় ৩২৭ খৃঃ পূর্ব্বে ধননন্দের সময়ে।

ধননন্দের স্বেচ্ছাচারিতায় বিপ্লব আসে এবং সেই সুযোগেই হয়তো চন্দ্রগুপ্ত তাকে পরাজিত ক'রে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

মৌর্য্যবংশ—এই নন্দবংশ থেকেই হয় মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা। গ্রীকদেশীয় বীর আলেকজান্দার এলেন ভারতে—ভারতের শৌর্য্য দেখে মুগ্ধ হলেন—চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করলেন। প্রবাদ নন্দবংশেরই এক রাজার শূদ্রাণী পত্নীর গর্ভে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম। তাঁর মাতার নাম মুরা সেই থেকে মৌর্য্য বংশ নাম। দেবলোকের আদিত্য, দানব প্রভৃতির ন্যায় ভারতের বুকে মাতৃ নামে এই বংশ পরিচয়। এই সময়েই চাণক্য বা কৌটিল্য এক প্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্র রচনা করেন।

পৌরাণিক ইতিবৃত্তের অতীতে যে প্রামাণিক নিদর্শন ও কাহিনী ইতিহাসকে সমৃদ্ধ ক'রে রাখে, তা সবচেয়ে মহীয়ান রূপে ফুটে উঠেছে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময়।

হয়তো প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু এই নশ্বর জগতে নিজেদের কীর্ত্তি

স্থাপনে উদাসীন থাকতেন, চাইতেন না নিদর্শনে জাগতিক মায়ায় বদ্ধ হতে—কিন্তু ঐ সময় অহিন্দু, অভারতীয় বৈদেশিক বিজেতা ও পর্য্যটকগণের চাক্ষুষ ও সংগৃহীত প্রামাণ্য বিবরণে ভারত ইতিহাসের অনেকটা অংশই সমুজ্জ্বল। আর তার প্রথম প্রকাশ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে।

রাজমন্ত্রী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বা রাজকবি বিশাখ দত্ত রচিত নাটক মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি গ্রন্থে, অশোকের লিপি বা অনুশাসনে, বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশ বা দীপবংশ বা জৈন সাহিত্যে এই স্বর্ণযুগের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন দিগ্বিজয়ী। সর্বপ্রথম তিনিই বিদেশাগত শত্রুকে পরাজিত করেন। ছয়লক্ষ সৈন্যে তাঁর সেই অভূতপূর্ব বিক্রম পরম বিস্ময়ের বিষয়। একপ্রান্তে হিমালয় অন্যপ্রান্তে মহীশূর, অপরদিকে পাঞ্জাব অন্যদিকে মহাস্থান গড় বা বাংলা পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়ে মালয়ের পদস্পর্শ করেছিল।

পর্যটকের বিবরণী বলে সে সময়ে ভারত সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবেশে সপ্তবর্ণে বিভক্ত ছিল—(১) ব্রাহ্মণ (২) শ্রাবণ (৩) কৃষক (৪) আটবিক অর্থাৎ পশুপালন বা শিকার (৫) শিল্পী (৬) ব্যবসায়ী এবং (৭) যোদ্ধা বা ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়।

আজ যে সব রাজকীয় নীতির প্রচলন দেখি বীর চন্দ্রগুপ্ত তার অনেক অংশ নিজরাজ্যে প্রচলিত করেন। বিদেশাগত রাজদূতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন, অমাত্য ও মন্ত্রীসহ রাজার বিচার—পরামর্শ, গুপ্তচর, দূত, মহামাত্য নিয়োগ—নানা অনুশাসন লিপির প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্মমত প্রচার, রাজস্ব ও আয়ব্যয়ের বিধি, সামরিক শাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতির অপূর্ব্ব নীতিতে তিনি এক আদর্শরাজ্য গঠন ক'রে যান।

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে বিন্দুসার মগধের রাজা হ'ন। তিনিও উপাধি পেয়েছিলেন "অমিত্রঘাত"—অর্থাৎ শত্রুজয়ী। তাঁর সময়েই বিদেশাগত দূত ও পর্য্যটকের আগমন হয় ভারতে। তাদের বিবরণীতেও আছে সে সময়কার নানা কাহিনী।

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর ২৭৩ খৃঃ পূঃ রাজা অশোক মগধের সিংহাসনে আরূঢ় হ'ন। ভারত ইতিহাসে অশোক এক পরম গৌরব।

প্রবাদ—অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ে যে লক্ষ লক্ষ বক্ষ-রক্ত প্রবাহিত হয় তা অশোকের আত্মপাপের কলঙ্ককেও ধুয়ে নিয়ে যায়। চণ্ডাশোক এই যুদ্ধের বিভীষিকা দেখেই হয়তো শিউরে ওঠেন। আর সে জ্বালা তাঁর শান্ত হয় করুণাময় বুদ্ধদেবের অমৃতময় অহিংস ধর্ম্মবাণীতে।

অশোকের সেই চণ্ডনীতি ও রুদ্ররূপে তাঁর এমন কলঙ্কই রচিত হয়েছে যে ভ্রাতৃ-বিরোধ ও হত্যা দ্বারাই অশোক সিংহাসন লাভ করেন। তবে এ সত্য কি মিথ্যা অতীত ইতিহাস তা নিয়ে ব্যস্ত নয়—ইতিহাস তার কীর্ত্তি গাথাতেই মুগ্ধ। তাঁর সে সব কীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়—চতুর্দ্দশ গিরি লেখমালা, শৈলমালা, সপ্তস্তম্ভ লেখমালা প্রভৃতি অসংখ্য স্তম্ভ, গুহা-লেখ ও শিলা-লেখ।

অশোকের রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল কাশ্মীর ও কাথিয়াবাড় থেকে মহীশূর ও কর্ণসুবর্ণপুর। তাছাড়া উজ্জয়িনী তক্ষশীলা, কৌশাম্বী সম্বোধি (বোধগয়া) পাটলিপুত্র, রাজগৃহ সব ছিল তার রাজ্য সীমানার মধ্যে কিন্তু এ দিগ্বিজয় বা সমৃদ্ধি অশোককে মহান করেনি—অশোক মহান ভারতের গৌরব হয়ে রয়েছেন তাঁর পঞ্চশীল বা ধার্ম্মিক অবদানে। নানা স্তূপ ও লেখ্যমালা লিখিত তাঁর নীতি দেখলে মনে হয় তাঁর প্রচারিত প্রধান সে মহান নীতি ছিল—দয়া, দান, সত্য, শৌচ, মার্দ্দব (মৃদুতা) এবং অপ-আসিনব (পাপ থেকে নিবৃত্তি)।

পাঁচটি নীতি শীল বা কাজের ধারাও তিনি প্রবর্ত্তন করেছিলেন প্রজাদের জন্য। সে পঞ্চশীল হচ্ছে— (১) শুশ্রূষা বা আজ্ঞানুবর্ত্তিতা (২) অপচিতি বা শ্রদ্ধা (৩) সংপটিপটি বা উপযুক্ত ব্যবহার (৪) দান (ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, মিত্র, পরিচিতজন, জ্ঞানী ও বয়োবৃদ্ধ হচ্ছে দানের পাত্র) (৫) অনারংভ বা অহিংসা।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পঞ্চপাপ থেকেও নিবৃত্ত হতে বলেছেন—চণ্ডভাব, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, মান ও ঈর্ষা এই হ'লো পঞ্চপাপ।

এই যে পঞ্চশীল, এই যে অনুশাসন বা পাপ-নির্দ্দেশ একি ভারতের শুধু—ভারতের কেন, জগতের যে কোন ধর্ম্মকে আঘাত করে। অথচ এরই ওপর যে গড়া রাজনীতি শাসননীতি অর্থনীতি তা দিতে সেদিন অশোক হয়েছিলেন রাজচক্রবর্ত্তী—সম্রাট ও বিশ্ববন্ধু।

চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করেন ৩০৩ খৃঃ পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬৪৭৪ সৃষ্টাব্দ। তাঁর ছেলে বিন্দুসার রাজত্ব করেন ২৭৮ খৃঃ পূর্ব্বে, তাঁর পুত্র অশোকের রাজ্যশাসনকাল ২৩৬ খৃঃ পূর্ব্বে। অশোকের পুত্র কুণাল রাজত্ব করেন ২২৮ খৃঃ পূর্ব্বে। তারপর বন্ধ্যু পালিত, ইন্দ্রপালিত, দেববর্ম্মা, শতধন্মা, ও শেষ রাজা বৃহদ্রথ।

মহান ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ এই সময়েই সাক্ষাৎভাবে দেখা যায়। অবশ্য পুরাণে যবনাসুরের যাবনিক গণনাদির উল্লেখ থাকলেও গ্রীক্ আক্রমণই ভারতের প্রথম বিজাতির পদক্ষেপ।

গ্রীকবিজয়ের পূর্ব্বে ভারত গণতন্ত্রে ও রাজতন্ত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজ্যে ও রাজবংশে বিভক্ত হয়। গ্রীকগণের ইতিহাসে তাহা বিস্তৃতভাবে লেখা হয়েছে। তন্মধ্যে পুষ্করাবতী, ন্যাস তক্ষশীলা, অভিসার, পুরু-রাজ্য, সৌভূতি, শিবিরাষ্ট্র, মল্লরাষ্ট্র, ক্ষুদ্রক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য গ্রীকগণ পুষ্করাবতীকে পিউকালোটিশ, পুরুকে পোরাস, শিবিদের সিবই বলেছেন।

সুঙ্গবংশ—সুঙ্গবংশের রাজত্বকাল ১১২ বৎসর। প্রথম রাজা পুষ্যমিত্র ইতিহাসের এক বিখ্যাত লোক—তিনি রাজত্ব করেন ১৬৪ খৃঃ পূর্ব্বে। দশজন রাজা ছিলেন এ বংশে। শেষ রাজা দেব-ভূতির রাজত্বকাল ছিল ৭৮ খৃঃ পূর্ব্ব অর্থাৎ ৬৬৯৯ সৃষ্টাব্দ।

কান্ববংশ—এরপর ৬৯ খৃঃ পূর্ব্ব থেকে ৩৩ খৃঃ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেখি কান্ববংশের রাজ্যবিস্তার। বাসুদেব বা দেবভূতি থেকে সুরু আর সুশর্ম্মার সময়ই তার শেষ।

অন্ধ্রবংশ—এরপরই মহারাষ্ট্রে রাজত্ব করলেন অন্ধ্রবংশ। কয়েকটি রাণীকেও দেখি এ বংশে রাজত্ব করতে। এ রাজত্ব সুরু হয় ১০ খৃঃ পূর্ব্বে, আর শেষ হয় ৩৪৬ খৃষ্টাব্দে। এঁদের রাজত্বকালেই সাগর-পারে মহান অবতার যীশুখৃষ্টের জন্ম হয়। এবং সেই থেকেই খৃষ্টাব্দের সুরু হয়। আজ সব হারিয়ে আমরা খৃষ্টের নামে বছর গণনা করি। অথচ আমাদের সৃষ্টাব্দ, কল্যাব্দ, ব্রহ্মাব্দ, শকাব্দ সবই ছিল।

আর্য্য ভারত কাউকে কোনদিন নষ্ট করে নি, কাউকে হিংসা করেনি—কারো প্রচারিত মহিমা বা নামে বাধা দেয় নি। কারণ

তাঁরা জানতেন, তাঁদের উন্নতি ও পথে নয়—কৃষ্টির পথে। পরিচয় নামের মধ্যে নেই, আছে কর্ম্মের মধ্যে, সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে। তাই তাঁরা গ্রন্থে, মন্দিরে, প্রচারে, কৃষ্টিতে আপন পরিচয় অব্যাহত রেখে গেছেন।

এই অন্ধ্রবংশের প্রথম রাজা সিমুক বা শিপ্রিক সাতবাহন। তারপর রাজা ও রাণী মিলিয়ে ২৩ জন এ-বংশে রাজত্ব করেন। শেষ রাজা গৌতমী পুত্র শাতকর্ণী। এঁদের ভৃত্যদলও তখন অন্যত্র এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

শাতকর্ণীর পুত্রের নাম পুলোমৎ বা পুলোমায়ী। এই বংশে রাজা হন ৭ জন। পুলোমায়ী পঞ্চম বা যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণী শেষ রাজা।

বৈদেশিক রাজ্য—মৌর্য্য সময় থেকে সুরু ক'রে এই সময়ের মধ্যেই বিদেশাগত বহুশক্তি ভারতের বুকে এসে নতুন রাজ্য ও বংশ বিস্তার করেছে। তাদের মধ্যে পাণ্ড্য, শক, পহ্লব, বা কুষাণ প্রভৃতিরাই প্রধান। কুষাণরাজ কণিষ্ক নিজ বিক্রমে 'সম্রাট' উপাধি-লাভ করেন এবং নিজের শৌর্য্যে চিহ্নিত করেন 'শকাব্দ' প্রচলনে। সে সব কথা আমরা ভুলেই ছিলাম তবে বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতের শাসন-পরিষদ সেই প্রাচীন শকাব্দ প্রচলনে আবার অগ্রসর হয়েছেন। কারণ প্রাচীন অন্যান্য 'অব্দ' অপেক্ষা শকাব্দ প্রামাণ্য।

একটি জিনিস দেখলে বেশ বোঝা যায়, কি ক'রে সুপ্রাচীন কাল থেকে বহিরাগত শক্তি বা সম্প্রদায় ভারতের বুকে এসে, ভারতের কোলে আশ্রয় নিয়ে ভারতীয় হয়ে গেছে।

ভারতের গ্রীক আক্রমণের পর যে কয়েকজন গ্রীকরাজা ভারতে রাজ্যস্থাপনে তৎপর হ'ন, তার মধ্যে মিনান্দার বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থকার। আজও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ মিলিন্দপঞ্‌হো (মিলিন্দের প্রশ্ন) তাকে অমর ক'রে রেখেছে।

পহ্লব বংশেও হিন্দু-সংস্কার প্রবেশ করে। শক তো ভারতের সঙ্গে অব্দ মাধ্যমে সংযুক্ত। তাছাড়া মথুরা, মালয়, কঙ্কন, উজ্জয়িনী নাসিক সর্বত্রই শক ক্ষাত্র বা গণরাজ্য বিস্তার করেছেন।

উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপ চষ্টনের পৌত্র তো নামটাই বদলে নিলেন হিন্দু

রুচি অনুসারে—তিনি হলেন রুদ্রদামন। তারপর শেষ রাজা হ'ন রুদ্র সিংহ, যাকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরাজিত করেন।

কুষাণ বংশও তাই। রাজা কণিষ্ক যে বিদেশের একজন আজ তা কজন মনে রাখতে পারে।

কুষাণ বংশ—কুষাণ বংশজ সম্রাট কণিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশোয়ার)। তিনি কাশী জয় ক'রে পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত অভিযান চালান। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ভারতে চতুর্থ বৌদ্ধ-মহাসভা আহ্বান করেন। সে অধিবেশনে অধ্যক্ষ ছিলেন বসুমিত্র—আর তার সহকারী ছিলেন অশ্বঘোষ। এঁরা দুজনেই ছিলেন মহাপণ্ডিত। অশ্বঘোষ আবার সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি ছিলেন।

সে যুগে এমনই ধর্ম্ম-মহাসভা চলে এসেছে সেই নৈমিষারণ্যের গৌরব অনুসরণ ক'রে।

কণিষ্কের পরই কুষাণ রাজ্য ও শেষ গুপ্ত বংশের অভ্যুদয়।

গুপ্তবংশ—প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩৪০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তবংশ স্থাপন করেন। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত কিন্তু পৃথক। গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি বংশীয়া কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। এ যেন রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের এক মিলন প্রচেষ্টা! এমন কি সেই সময়ের মুদ্রায় লিচ্ছবিগণের নামোল্লেখ ছিল রাণী কুমারদেবীর প্রতিকৃতির পাশে। অনেকের মতে শকাব্দ বা গুপ্তাব্দ এঁরই প্রচলিত আর 'বিক্রামাদিত্য' ইনি এবং নবরত্ন সভা ও কবি কালিদাস প্রভৃতির আবির্ভাব এই সময়েই। চন্দ্রগুপ্তের ছেলের নাম সমুদ্রগুপ্ত। পরাক্রমী সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন দিগ্বিজয়ী—'ভারতের নেপোলিয়ান' নামে তাঁর পরিচিতি। এঁরই সময় 'অটবী' রাজ্য অর্থাৎ আটবিক বা অরণ্যাঞ্চলের স্বাধীন রাজারা সাম্রাজ্যবাদ স্বীকার ক'রে নেন। সমুদ্রগুপ্তই দিগ্বিজয়ে পূর্ব্বে কামরূপ ও ডাবক (হয়তো ঢাকা), উত্তরে নেপাল, দক্ষিণে মালবাদি প্রদেশ জয় করেন। তারপরই পাই, তাঁর ছেলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নাম। অনেকে বলেন, ইনিই যথার্থ বিক্রমাদিত্য।

আবার অনেকে বলেন প্রকৃত বিক্রমাদিত্য হচ্ছেন দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের পৌত্র—কুমার গুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্ত। ইনি যেমন ছিলেন

বীর, তেমনই পণ্ডিত—তাছাড়া লোকহিত কল্পে তাঁর দান তদানীন্তন প্রসিদ্ধ 'সুদর্শন' বাঁধের সংস্কার কাজেই প্রমাণিত হয়।

চন্দ্রগুপ্তের সময় পরিব্রাজক ফাহিয়ান আসেন ভারতে। বহু বৌদ্ধ কীর্ত্তি ও ভাস্কর্য্যে এ যুগ সমৃদ্ধ। তাই এ যুগকে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।

আবার সেই স্বর্ণযুগ বিদেশী শক্তিদের প্রলুব্ধ ক'রে তোলে—তার ফলে আসে হুণ, তাতার, মোগল, পাঠান।

এই সময় বহিরাগত শত্রু হুণদের আক্রমণ সুরু হয়। তাদের প্রথম বাধা দেন মালবরাজ যশোধর্ম্মন। অনেকে আবার বলেন হুণ-রাজ মিহিরকুল-বিজয়ীরাজ যশো-ধর্ম্মনই 'বিক্রমাদিত্য।' কিন্তু একথা সত্য বলে মনে হয় না।

মৌখরিবংশ—কনৌজের মৌখরিবংশের প্রতিষ্ঠাতা ঈশান বর্ম্মণ। বংশের শেষ রাজা গ্রহবর্ম্মণের সঙ্গে পুষ্যভূতি রাজকন্যার বিয়ে হয়।

পুষ্যভূতি বংশ—এ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা প্রভাকর বর্দ্ধনের ছিল দুই ছেলে রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন। জ্যেষ্ঠ রাজ্যবর্দ্ধন রাজ্য পেলেও নিহত হন। তাঁর পরলোক গমনের পর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হর্ষবর্দ্ধন হন থানেশ্বরের রাজা। এঁদের বোন ছিলেন রাজ্যশ্রী। মালবরাজ রাজ্যশ্রীর স্বামী কনৌজ পর্ম্ম রাজ গ্রহধনকে হত্যা করে রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করলে হর্ষবর্দ্ধন তাঁকে উদ্ধার করেন এবং তাঁর সাহচর্য্যে কনৌজ পরিচালনা করেন।

কনৌজের শূন্য সিংহাসনে বসে রাজা হর্ষবর্দ্ধন সব অত্যাচারের শোধ নিতে উদ্যোগী হলেন। থানেশ্বরের ও কনৌজের মিলিত শক্তিলাভে হর্ষবর্দ্ধন ক্রমে পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন। সুশাসনে তিনি আপন মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন ও নিজের শাসনকালের সময়টিকে 'হর্ষাব্দ' নামে পরিচিত করেন। তিনি ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করেন এবং কামরূপ রাজের সহায়তায় মগধ জয় করেন। এঁরই সময় বিখ্যাত কবি বাণভট্ট তাঁর কাদম্বরী প্রণয়ন করেন। হর্ষবর্দ্ধন হিন্দু ছিলেন কিন্তু পরে বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী হ'ন। এঁরই শাসনকালে চীন পর্য্যটক হিউয়েন সাঙ ভারতে আসেন। হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে অনুষ্ঠিত প্রয়াগের মহামোক্ষ পরিষদ বা ধর্ম্মসম্মেলন ভারতীয় কৃষ্টির এক অপূর্ব্ব

সাক্ষ্য। প্রতি পাঁচ বৎসরে তিনি প্রয়াগে এই মেলার অনুষ্ঠান ক'রে শিব, সূর্য্য ও বুদ্ধ ত্রিদেবের করতেন অর্চ্চনা এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বহু বৌদ্ধ বিহার এঁর দানে সমৃদ্ধ।

রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য কাশ্মীর থেকে নেপাল কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি বুদ্ধ দন্ত এনেছিলেন কাশ্মীর থেকে—এবং দূত বিনিময় করেছেন চীনের সঙ্গে। তিনি ছিলেন একাধারে কবি—বীর ও রাজনীতিজ্ঞ। অমরকাব্য কাদম্বরী রচয়িতা বাণভট্ট এঁর চরিত্র নিয়েই লেখেন 'হর্ষচরিত।'

গৌড়—এরপরই কনৌজ থানেশ্বর সংঘর্ষের পরিণামে পশ্চিমবঙ্গে এই গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুজনের মতে এই গৌড়ই বঙ্গদেশের রাজধানী। এ বংশের পরাক্রান্ত সুবিখ্যাত রাজা শশাঙ্ক। কনৌজ ও থানেশ্বরের সহিত সঙ্ঘর্ষ, প্রভাকর বর্দ্ধনের ছেলে রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা তাঁর কীর্ত্তি বা কলঙ্ক।

তথাপি রাজা শশাঙ্ক ভারত-ইতিহাসের এক দীপ্ত নক্ষত্র। বৌদ্ধ-বিদ্বেষী হলেও তিনি বাহুবলে ভারতের বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

এর পরই আমরা পাই চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও গুর্জ্জর প্রতিহার বংশ। দীর্ঘকাল স্থায়ী না হলেও সাম্রাজ্য স্থাপনের গৌরবে ও বহিরাগত শত্রু-প্রতিরোধে এ সব রাজ্য যশোধিকারী হয়েছিল।

চালুক্য বংশ—পল্লব-বংশ বিজেতা দ্বিতীয় পুলকেশীকে আবার অনেকে বিক্রমাদিত্য রূপে বর্ণনা করেন। তিনি কাঞ্চী অধিকার করেন। মনে হয় 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিটি ছিল সে যুগের এক লোভনীয় সম্পদ।

রাষ্ট্রকূটবংশ—দক্ষিণ ভারতে এই বংশ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

গুর্জ্জর প্রতিহার— প্রবাদ যে রামানুজ লক্ষ্মণের বংশধরগণই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। অনেকে বলেন, এঁরা বহির্ভারতের এক বংশ। এ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন মিহিরভোজ। এঁর ছেলে মিহিরপাল। পালবংশের নারায়ণ পালকে পরাজিত করলেও পরে পালবংশের সংঘর্ষেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

যশোধন, মিহিরভোজ, মহেন্দ্রপাল, মহীপাল প্রভৃতি খ্যাত সব নরপতি এই সময়েই আবির্ভূত হন। এবং তারপর দীপ্ত হয়ে ওঠে বাংলার পালবংশ ও সেনবংশ।

পালবংশ—এর পরই দেখি রাজতন্ত্রের অবসানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। বাংলার পাল বংশ, এই গণতন্ত্রের এক নতুন দৃষ্টান্ত। মাৎস্য ন্যায়ের অবিচারে বাংলায় তখন প্রজা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। তাই প্রজা চাইল সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

সাধারণের নির্ব্বাচিত গোপাল দেব রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। সে তন্ত্রে রাজ-বংশধরের দাবী রাখার নিয়ম ছিল না বটে, কিন্তু গোপাল দেবের পর থেকে আবার রাজ-বংশধরই বসতে থাকে সিংহাসনে। ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৭ জন রাজা এ বংশে রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, বিগ্রহ পাল, মহীপাল, রামপাল প্রভৃতি রাজারা আজও খ্যাতিতে অমর হয়ে আছেন।

বর্ম্ম বংশ—বাংলায় তখন আরও একটি রাজবংশের উদ্ভব দেখা যায়—তার নাম বর্ম্ম বংশ। হরি বর্ম্মা থেকে সুরু ক'রে ভোজ বর্ম্মা পর্য্যন্ত ৫ জন রাজার নাম পাই—আর তাদের রাজত্ব চলে ১০৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

অন্যান্য রাজবংশ—পূর্ব্বোক্ত বংশাদি ছাড়া এ সময় অন্য বহু রাজ্য ও বংশের উত্থান ও পতন হয়। তার মধ্যে রাজপুতানার চৌহান বংশ, চন্দেল বা চন্দ্রাত্রেয় বংশ, চেদি, হৈহয় বা কলচুরি বংশ, গাহড়-ওয়াল বংশ, পরমার বংশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ছোট ছোট এই সব রাজ্যের গার্হস্থ্য শত্রুতাই বিদেশীর রীতি ভারতকে অর্পণ করে।

এর মধ্যে গাহড়বাল বংশের জয়চন্দ্র ও চৌহান বংশের পৃথ্বীরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বহিশ'ত্রু মহম্মদ ঘোরিকে ভারতে আমন্ত্রণ ক'রে আনে।

সেনবংশ—বাংলার গৌরব ও বাংলার কলঙ্ক এই সেনবংশ। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটের এক ব্রাহ্মণ-বংশ—বীর্য্য-মদে উন্মত্ত হয়ে ক্ষত্রিয়ের বেশে দেখা দেয় বাংলার বুকে। সেই বংশেরই সামন্তসেন নদীয়ায় সেনবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন আর পৌত্র বিজয় সেন। বিজয় সেন পূর্ব্ববঙ্গও জয় করেন।

বিজয় সেনের ছেলে বল্লাল সেনই কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি করেন এই প্রথা তাঁর কীর্ত্তি ও কলঙ্ক—তদানীন্তন আশীর্ব্বাদ আর বর্ত্তমানের অভিশাপ। নয়টি বিশেষ গুণে সে যুগের কুলীন ছিলেন গুণী; আজ তা সবই কু-তে লীন হতে চলেছে। বংশ মর্য্যাদা গুণ ছেড়ে মানে এসে বৈবাহিক-যৌতুকের পরিমাণ ঠিক করছে।

হয়ত এই সব কারণে সেই সময়কার সমাজের নানা ক্ষুব্ধ ভাবই বাঙ্গলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় মহা বিপর্য্যয় নিয়ে এল। আর এল বহিঃশত্রুর আক্রমণ, মোগল-পাঠানের অভিযান।

নইলে লক্ষ্মণ সেনের সময়েই সারা বাংলা মেতেছিল জয়দেবের কবিতায়। ধোয়ী হলায়ুধ উমাপতি বা শ্রীধরের পাণ্ডিত্য-চর্চ্চায় বাংলা তখন দীপ্ত। সুকবিও ছিলেন স্বয়ং লক্ষ্মণ সেন। তিনি বারাণসী প্রয়াগ ও পুরীতে বিজয়-স্তম্ভ প্রোথিত করেও বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলেন না আর সেদিন বাংলার দুর্ব্বলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বই মুসলমানকে ডেকে আনে বাংলার বুকে। প্রবাদ মাত্র ১৮টি মুসলমান অশ্বারোহী লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত ক'রে বঙ্গদেশ জয় করেন, কিন্তু মনে হয় তা সত্য নয়—কারণ তারপরও নদীয়া নগরের পতনের পর বাংলার সিংহাসনে লক্ষ্মণ সেনের বংশধরকে দেখা যায়। তবে একথা সত্য যে এই সময়ের পরই 'মহান ভারতে'র গৌরব বিদেশীর হাতে বিপর্য্যস্ত হতে সুরু করে।

আর্য্য-ভারতে যবনের প্রবেশ—মহান ভারতের ইতিহাস-পৃষ্ঠায় কলঙ্কের দাগ এই সময় থেকেই অঙ্কিত হতে থাকে। এই সময়ের অথবা এর পরবর্ত্তী ভারতেতিহাস আজকে নানাভাবে বহু গ্রন্থে—স্কুল কলেজের পাঠ্য হিসাবেও লেখা হয়েছে। বিদেশীর কলমে হয়তো কিছু কলঙ্কিত হয়েছে, আবার কোন কোন অংশের বিস্মৃত অধ্যায় হয়তো তাদেরই অনুসন্ধানেই হয়েছে স্বচ্ছ। আমরা সে সবই জানতে পারি আধুনিক ইতিহাসের পাতায়—সুতরাং তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

আমরা সেই সুপ্রাচীন ইতিবৃত্তটুকুই বলবো এখন—যাতে আমাদের প্রাচীন রীতি, নীতি, সমাজ ও ধর্ম্মের কথা আছে। তবে সে যুগের

ইক্ষ্বাকু, রাম, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠিরের মতনই মধ্যযুগের রাজা কণিষ্ক, বিক্রমাদিত্য, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শশাঙ্ক, বিজয় সেন, আদিশূর, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি রাজার রাজ্যের কথা পরম গৌরবে পূর্ণ।

●

বহির্ভারতে উপনিবেশ

মোটামুটি সংক্ষেপে ভারতীয় রাজ বংশের একটি খসড়া পেলেও ইতিহাস আর্য্যগণের আরও এক বিস্তৃত উপনিবেশের সন্ধান দেয়। জন-বৃদ্ধির কারণে বা সুখ ও সমৃদ্ধির আকাঙ্খায় ভারতীয় আর্য্যগণ ভারতের বাইরেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন সেদিন।

ভারত প্রবেশের সমসময়ে স্বর্গের দেবতা মাটির কোলে এসে শুধু হিমালয় ডিঙ্গিয়ে ভারতেই প্রবেশ করেননি—গিয়েছেন দূর পাশ্চাত্যে আজ যা পারস্য, আরব, জার্ম্মাণ বা গ্রীকরাজ্য নামে কথিত। ভারতে উপনিবেশের পরও তারা নিয়মিত ভাবে নানা অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। আর সে ইতিহাস স্পষ্টই প্রমাণ করে যে প্রাচীন আর্য্যগণ শক্তিতে ছিল দৃঢ়, সাহসে ছিল অকুতোভয়, কূপ-মণ্ডুকত্ব তো নয়ই বরং প্রাণশক্তিতে ছিল উচ্ছল।

প্রমাণিত হয়ে গেছে যে আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে ভারতের সঙ্গে এশিয়া বা মেসোপটমিয়ার যোগাযোগ ছিল—সমুদ্র পথে ছিল আর্য্যদের অবাধ গতিবিধি।

জাতকাদিতে উল্লিখিত আছে পশ্চিমে বাবেরু বা ব্যবিলন সিরিয়া, ইজিপ্ট, পূর্ব্ব মলয় দ্বীপপুঞ্জতে আর্য্যদের গতিবিধি ছিল। পরবর্ত্তী যুগে প্রাচীন ভারতের ভৃগুকচ্ছ সুপারক, মুরচীপত্তন, কাবেরী পত্তন, তাম্রলিপ্ত থেকে বড় বড় জাহাজে আর্য্যরা বাণিজ্যের জন্য যেতেন রোম, চীন, মালয়, যবদ্বীপ, বা বর্ত্তমানের ইন্দোচীনে—চম্পা কম্বোজ প্রভৃতি দেশে, সেখানে আর্য্যরা শেষ পর্য্যন্ত বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেছে ও সফল হয়েছে। প্লীনি প্রভৃতি বৈদেশিক ঐতিহাসিক-গণও তা স্বীকার করে গেছেন।

পূর্ব্ব এশিয়ায় যবদ্বীপ বা কম্বোজ ব্যতীত আনাম, সুমাত্রা, বালি, মলয়দ্বীপ বা সুবর্ণ ভূমিতে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

চম্পা ও কম্বোজ—ইন্দোচিনের প্রসিদ্ধ উপনিবেশ। বর্ত্তমান আনামদ্বীপ ব্যাপিয়া ছিল চম্পা আর কম্বোডিয়াই কম্বোজ। চম্পার রাজন্যবর্গের মধ্যে জয় পরমেশ্বর, বর্ম্মদেব, হরিবর্ম্মণ, শ্রীজয় বর্ম্মণ, বিজয় বর্ম্মণ প্রভৃতি প্রধান। কম্বোজের শত্রুতা ও কুবলাইখাঁর দুর্দ্ধর্ষতা থেকে রক্ষা করেন এঁরাই এই ভূখণ্ডকে—চীনের সঙ্গেও ছিল এঁদের যোগাযোগ।

১৩০০ বৎসর রাজত্বের পর এ সব ধ্বংশ হয় বটে তবে—আজও হিন্দু মন্দিরাদি হিন্দু গৌরবের সাক্ষ্য দেয়। অনেকে মনে করেন যে ভারতের চম্পা (ভাগলপুর) আর কম্বোজ থেকেই এই চম্পা ও কম্বোজের প্রতিষ্ঠাতারা সেখানে যান। চীনাভাষায় কম্বোজের নাম ছিল ফু-নান। প্রবাদ এই প্রতিষ্ঠাতা কৌণ্ডিল্য—নাগবংশীয় সোমা এঁর পত্নী। তারপর বহুদিন পরে ইতিহাসের পাতায় দেখি এই রাজবংশে মহেন্দ্রবর্ম্মণ, যশোবর্ম্মণ প্রভৃতির নাম। আঙ্কার বাত নামক বিরাট মন্দির এ রাজ্যের এক কীর্ত্তি।

মলয়দ্বীপ—রামায়ণে এর উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন এই স্থান ছিল সে যুগে লঙ্কা বা তার পার্শ্ববর্ত্তীস্থান। ইতিহাসে শৈলেন্দ্র বংশকে দেখি এর সিংহাসনে। "মহারাজ" উপাধি নিয়ে চীনের সঙ্গে মিত্রতায় কৃষ্টি-কলায় ও শৌর্য্যবীর্য্যে উন্নত হলেও একদিন চোলরাজ কর্তৃক তারা পরাজিত হয়। তারপর নরপতি বিজয় এ রাজ্য অধিকার করে মত পহিতে এর রাজধানী স্থাপন করেন।

চীনে বা ভারতের নালন্দা বিহারে এঁদের দান ছিল। বাঙ্গালী বৌদ্ধ কুমার ঘোষ ছিলেন এ বংশের গুরু। এঁদের বিরাট মন্দির বরবুদর বিরাটত্বে ও শিল্পসৌন্দর্য্যে আজও বিশ্বসভায় বরেণ্য।

এমনই ভাবে সেদিন ভারতের বাইরে আর্য্যগণ পূর্ণভাবে আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। বর্ত্তমান শ্যাম, ,পেগু, লাওস বা মালব ব্রহ্ম, মলক্কা, সুমাত্রা বা শ্রীবিজয় সবই ভারতীয় উপনিবেশের সাক্ষ্য দেয়।

রামায়ণ ও মহাভারত
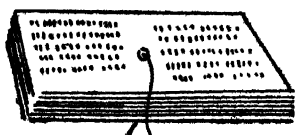
প্রাচীন ভারতের বংশ ও রাজ্য বিস্তারের যে তালিকাই সংগৃহীত হোক না কেন, তা হয়তো তেমন পূর্ণতর হবে না, কারণ কোন সে অতীতে, কোন সে অজ্ঞাত বংশধারা ভারতের দিকে দিকে প্রবাহিত হয়ে নূতন নূতন বংশ ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছে তার সঠিক বিবরণ কে বলবে? তবে তার সার্থকতর অগণিত পরিচয় পাওয়া যায় ভারতের মহান দুই কাব্যে—রামায়ণ ও মহাভারতে।

বিভিন্ন বংশধারায় ভারত সমৃদ্ধ হলেও—মহান ভারতের প্রধানতম দুটি বংশ, ঐ সূর্য্য বংশ ও চন্দ্র বংশের বিবরণ নিয়ে, সেই বংশদ্বয়ের বিশিষ্টতম চরিত্রগুলির রূপায়ণে এই দুই মহাকাব্য রূপায়িত। আর তারই মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে তৎকালীন বিভিন্ন রাজ্য, বংশ, সমাজ ও নীতির কথা।

পূর্ব্বোক্ত বংশ-তালিকার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তে তাকে সন্নিবেশিত না ক'রে মহাকাব্যের বর্ণনানুযায়ী তাকে জানাই অধিকতর স্পষ্ট হবে। হয়তো তাই অতি প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের অন্তর্ব্বর্তী একটা সময়কে বহু ঐতিহাসিক মহাকাব্য-যুগ বলেই বর্ণনা করে গেছেন।

সে মহাকাব্য হয়তো পুরাণের পুরাতন কাহিনী নিয়ে কল্পিত, হয়তো ঐতিহাসিক সত্য কবি-বর্ণনার অলঙ্কারে স্থানে স্থানে রঞ্জিত ও পল্লবিত তবে ঠিক অন্যান্য অষ্টাদশ পুরাণের মত পৌরাণিক আখ্যান-বস্তু নিয়েই সজ্জিত হয় নি—ঐতিহাসিক তথ্য নিয়েও তা হয়েছে সমৃদ্ধতর।

তাই এই দুই মহাকাব্য ঠিক বেদ বা পুরাণের কোঠায় পড়ে না। আবার রূঢ় বাস্তবের আদর্শে ঐতিহাসিক প্রমাণেরও ধার ধারে না। তারা মহান হয়ে উঠেছে, উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে বাল্মীকি ও ব্যাসের অমর লেখনীর মাধুর্য্য-সম্পদে।

গ্রন্থের রচয়িতারাও প্রাচীন, কিন্তু মূল ঘটনা প্রাচীনতর—তাই

আমরা পরে গ্রন্থকারের বিবরণ পেলেও, আগে রামায়ণ ও মহাভারতের কাব্য কথার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত জেনে নেবো, পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বংশ-বৃত্তান্ত অবগতির জন্য।

তবে এ কথা আমরা যেন ভুলে না যাই যে সারা জগতের মহা-কাব্যের ইতিহাসে মহান্ ভারতের মহাভারত ও রামায়ণের স্থান অতি উচ্চে আর একথা যেন আমরা প্রাণ দিয়েই অনুভব করি যে, এই রামায়ণ ও মহাভারতের সৌন্দর্য্য কবি-কমণ্ডলুর অমৃত অভিষেক বারিতে সিঞ্চিত—রূঢ় ঐতিহাসিক বাঁধা-ধরা ছকে আবদ্ধ নয়।

রামায়ণ

সরযূতীরে লোকবিশ্রুতা অযোধ্যানগরী। এই অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ। সে সময় এমন ধর্মপরায়ণ প্রজাবৎসল রাজা খুব কমই ছিলেন। কিন্তু এক দুঃখ তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিল না। শেষে পুত্র-কামনায় তিনি এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সে যজ্ঞের পুরোহিত হয়ে এলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের নির্দ্দেশক্রমে সেই যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন হলো। এই যজ্ঞাগ্নি থেকে বেরিয়ে এলেন এক মহাপুরুষ। তিনি বললেন, আমি প্রজাপতি প্রেরিত পুরুষ—আপনার জন্যে এই পায়স এনেছি। এই পায়স আপনার পত্নীদের খেতে দিন। দশরথ সেই পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রথমা পত্নী কৌশল্যাকে দিয়ে কিছু অংশ দিলেন সুমিত্রাকে এবং শেষ অংশ কৈকেয়ীকে দিতে গিয়ে আবার কি মনে ক'রে সুমিত্রাকে আরো খানিকটা পায়স খেতে দিলেন। পায়সের গুণে তিন মহিষীই গর্ভধারণ করলেন।

দ্বাদশ মাস পূর্ণ হ'লে কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করলেন।

যথাসময়ে পুত্রেরা বিদ্যালাভ ক'রে অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী হলেন। লক্ষ্মণ শৈশব থেকেই জ্যেষ্ঠের অনুগত। ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হ'লে রাজা দশরথ তাঁদের বিবাহের আয়োজন করতে লাগলেন।

কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই একটি ঘটনা ঘটলো। বিশ্বামিত্র ঋষি

রাজার কাছে প্রার্থী হ'য়ে এলেন। রাজা তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করবেন অঙ্গীকার করলেন।

বিশ্বামিত্র বললেন, দুই কামরূপী রাক্ষস—মারীচ এবং সুবাহু তাঁর যজ্ঞ নষ্ট করছে। তাই এসেছি আপনার পুত্র রামচন্দ্রকে নিয়ে যেতে। এক রামচন্দ্র ছাড়া কারো সাধ্য নেই তাদের বধ করে।

ঋষির কথা শুনে রাজা মূর্চ্ছিত হলেন। জ্ঞান হ'লে বশিষ্ঠ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, ঋষিবাক্য অবহেলা করবেন না, হয়ত আপনার পুত্রের এতে মঙ্গলই হবে।

পিতৃ-হৃদয় কোনো কিছুতেই প্রবোধ মানতে চায় না। শেষে বশিষ্ঠ বললেন, ঋষির কাছে আপনি প্রতিশ্রুত—মিথ্যাচার করবেন না।

অসহায়ের মতো রাজা দশরথ পুত্রকে ঋষির হাতে অর্পণ করলেন। অনুগত লক্ষ্মণ তাঁর সঙ্গ নিলেন।

বিশ্বামিত্র ঋষি হ'লেও তাঁর শক্তিও বড় কম ছিলো না। তিনি বলা ও অতিবলা নামে দুই মন্ত্র রামচন্দ্রকে দিলেন। এই মন্ত্রের অসাধারণ শক্তি। এই শক্তি লাভ ক'রে রামচন্দ্র তাড়কাকে বধ করলেন। তাড়কানিধনের পর বিশ্বামিত্র তাঁর দিব্যাস্ত্রগুলিও রামচন্দ্রকে দিলেন।

আশ্রম-উপকণ্ঠে মারীচ ও সুবাহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটলো। মায়াবী রাক্ষস রামচন্দ্রের হাতে নিহত হ'লে, বিশ্বামিত্র তাঁদের নিয়ে মিথিলার দিকে গেলেন। এইখানে ঋষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যা পাষাণ হ'য়ে ছিলেন। রামচন্দ্রের দেখা পেলে এই অভিশপ্ত-জীবন থেকে অহল্যা মুক্তি পাবেন—এও ঋষি তাঁকে ব'লে দিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে নিয়ে প্রথমে সেখানেই গেলেন। অভিশপ্ত-নারী রামচন্দ্রের স্পর্শে মুক্ত হলেন।

এরপর তাঁরা মিথিলায় এসে উপস্থিত হলেন। মিথিলার রাজা জনক তাঁদের সসম্মানে আহ্বান করলেন। রামচন্দ্রের সবিশেষ পরিচয় পেয়ে তিনি তাঁকে হরধনু দেখালেন। বললেন, এই ধনুতে কেউ গুণ দিতে পারেন নি, সীতার পণ যিনি এই ধনুতে জ্যা-রোপণ করতে পারবেন, তিনি তাঁকে বিবাহ করবেন। বিশ্বামিত্রের নির্দেশে

সেই ধনু রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে জ্যা-রোপণ ক'রে আকর্ষণ করলেন। প্রচণ্ড শব্দে সেই ধনু ভেঙে পড়লো। জনক আনন্দিত হ'য়ে ভাবী-জামাতাকে আলিঙ্গন করলেন।

রামচন্দ্রের বিবাহ-সংবাদ নিয়ে অযোধ্যায় লোক ছুটলো। জনকের আমন্ত্রণ পেয়ে রাজা দশরথ এলেন মিথিলায়।

অতঃপর দশরথের অনুমতিক্রমে রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার এবং আর এক কন্যা ঊর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের এবং দুই ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হলো।

বিয়ের পর দশরথ পুত্র ও পুত্র-বধূদের নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। এরপর রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাইলেন। যথারীতি আয়োজনও সম্পূর্ণ হ'লো।

কিন্তু এ সংবাদ কৈকেয়ীর দাসী মন্থরার কানে বিষ ঢেলে দিলে। সে-বিষে কৈকেয়ীও সংক্রামিত হ'লো। মন্থরাই দিলে কৈকেয়ীকে পরামর্শ।

একদা দেবাসুর যুদ্ধে আহত-দশরথকে সেবা ক'রে কৈকেয়ী তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সে সময় দশরথ কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কৈকেয়ী তখন সে-বর নেননি। বলে-ছিলেন, সময় হলে চেয়ে নেবেন। মন্থরা সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললে, আজ সময় উপস্থিত—তুমি সেই দুটি বর চেয়ে নাও। এক বরে তোমার ভরতের রাজ্যাভিষেক, অপর বরে রামচন্দ্রের তের বছর বনবাস।

কৈকেয়ী দশরথকে সে-প্রস্তাব করতেই দশরথ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। দশরথের সহস্র বিলাপেও কৈকেয়ীর মন গললো না। এদিকে রাজা প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ। ক্ষত্রিয় রাজা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারেন না—কৈকেয়ীর প্রস্তাবমত রামচন্দ্রকে বনবাসেই যেতে হ'লো। অনুগত লক্ষ্মণ ও সহধর্মিণী সীতা রামচন্দ্রের অনুগমন করলেন। ভরত সে সময় মাতুলালয়ে ছিলেন। তাঁকে আনতে লোক গেলো।

কিন্তু দশরথ আর শয্যাত্যাগ করলেন না, রামচন্দ্রের জন্যে বিলাপ করতে করতেই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। পুত্রেরা কেউ উপস্থিত

না থাকায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও হ'লো না। বশিষ্ঠের নির্দেশক্রমে তাঁর মৃতদেহ তৈলপূর্ণ আধারে রক্ষিত হ'লো।

ভরত অযোধ্যায় ফিরে এসে সকল দুঃসংবাদই অবগত হলেন। ভরত ক্ষোভে-দুঃখে তাঁর মাতাকে তিরস্কার করলেন। তারপর ভরত মহারাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ ক'রে রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে সসৈন্যে যাত্রা করলেন।

পথে নিষাদপতি গুহের সঙ্গে দেখা হ'লো। তিনি রামচন্দ্রের সংবাদ দিলেন এবং তাঁরই নির্দেশমত তাঁরা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে এলেন। তিনি জানালেন, রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বতে আছেন। ভরত সৈন্য-সামন্ত রেখে ক্ষৌমবাস পরিধান করে চিত্রকূট পর্ব্বতে এলেন।

রামচন্দ্র ভরতকে দেখে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন। পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনে মর্মাহত হলেন এবং যথারীতি শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করলেন।

তারপর ভরতের আগমনের কারণ শুনে তিনি দুঃখিত হ'য়ে বললেন, আমি পিতার আদেশ অমান্য করতে পারিনা। ন্যায় হোক, অন্যায় হোক পিতৃ-আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে। ভরতের সকল অনুরোধ ব্যর্থ হ'লো। তখন তিনি রামচন্দ্রের প্রতীক হিসাবে তাঁর পাদুকা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এই পাদুকাকেই রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ভরত রাজ্য-শাসন করতে লাগলেন। এবং মাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে লাগলেন।

এদিকে রামচন্দ্র আরও বন অতিক্রম করলেন। ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তাঁরা পঞ্চবটী বনে এসে স্থায়ী হলেন। এখানেই দেখা হ'লো এক কাম-রূপিনী রাক্ষসীর সঙ্গে। এই রাক্ষসী ছিল ইতিহাস-খ্যাত মহাপরাক্রমশালী রাবণ রাজার ভগ্নী শূর্পণখা। লক্ষ্মণ এই শূর্পণখার নাক-কান কেটে দিয়েছিলেন।

রাবণ ভগ্নীর এই অবস্থা দেখে মহা ক্রুদ্ধ হ'য়ে রামকে বধ করতে উদ্যত হ'লেন। কিন্তু রামকে হত্যা করা সহজ নয়—দেবতাদেরও সাধ্য নেই রামচন্দ্রকে বিনাশ করে। এ সংবাদ রাক্ষসরাই তাঁকে

দিলে। তখন রাবণ রামচন্দ্রের পত্নীকে হরণ করতে মনস্থ করলেন।

মারীচ ছিল মায়াবী রাক্ষসী। সে ইচ্ছানুরূপ রূপ-পরিগ্রহ করতে পারতো। রাবণ তারই শরণ নিলেন। মারীচকে সম্মুখে রেখে রাবণ এলেন সেই পঞ্চবটী বনে।

মারীচ স্বর্ণ-মৃগের রূপ ধরে সেই বনে খেলা করতে লাগলো। এইরূপ একটি বিচিত্র হরিণকে দেখে সীতার লোভ হ'লো। রামচন্দ্রকে বললেন, ঐ হরিণটি ধ'রে দিতে। লক্ষ্মণকে কুটিরে রেখে রামচন্দ্র এগিয়ে গেলেন। কিন্তু মায়াবী হরিণ তাঁকে প্রলুব্ধ করে বহু দূরে নিয়ে গেলো। অবশেষে ক্লান্ত হ'য়ে রামচন্দ্র হরিণের আশা ত্যাগ ক'রে ফিরে আসার জন্যে ব্যস্ত হলেন। কিন্তু মায়াবী মারীচ এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়—সে তখন এক কৌশল অবলম্বন করলো। রামচন্দ্রের স্বর অনুকরণ ক'রে আর্তস্বরে সীতা ও লক্ষ্মণের নাম ধ'রে চীৎকার ক'রে উঠলো।

রামচন্দ্র রাক্ষসের মায়া বুঝতে পেরে, কুটিরের দিকে দ্রুত পা চালালেন।

এদিকে সীতা রামচন্দ্রের আর্তস্বর শুনে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। লক্ষ্মণকে এগিয়ে দেখতে বললেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সীতাকে একা রেখে যেতে চাইলেন না। তখন সীতা তাঁকে তিরস্কার ও কটুবাক্য বলতে লাগলেন। শেষে বাধ্য হ'য়ে লক্ষ্মণকে যেতে হ'লো।

রাবণ এই অবসরে সীতাকে হরণ করলেন। রাবণের রথ আকাশ-পথে উঠলো। সীতার কান্না সারা আকাশ-পথে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। সেই রোদন শুনে বৃদ্ধ জটায়ুপক্ষী রাবণের রথ আক্রমণ করলো। তার পাখার ঝাপটে রাবণের রথ চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেলো।

তখন রথ ছাড়াই সীতাকে আকর্ষণ ক'রে মায়াবী রাবণ চললেন শূন্য-পথে। সীতা কাঁদতে কাঁদতে একটি একটি ক'রে তাঁর সকল অলঙ্কারই গা থেকে খুলে ফেলে দিলেন। এমনি ক'রেই যেন তিনি তাঁর গমন-পথের নিদর্শন রেখে যাচ্ছেন। এই ভাবে জনশূন্য অরণ্য-প্রদেশের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একটি পর্ব্বত-শৃঙ্গে পাঁচটি বানর দেখলেন। সেখানেও ফেলে দিলেন তাঁর উত্তরীয় এবং অলঙ্কার।

লঙ্কায় রাবণ সীতার পরিচর্য্যায় রাক্ষসীদের নিযুক্ত করলেন।

এদিকে রাম লক্ষ্মণ কুটিরে ফিরে এসে দেখেন, সীতা নেই। পঞ্চবটী বনের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও কোথাও সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না। শেষে সীতার শোকে রামচন্দ্র কাতর হ'য়ে পড়লেন।

কিন্তু নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকলে চলে না, সীতার অন্বেষণে তাঁরা পঞ্চবটী ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু কোন্ পথ? কে দেবে সে নির্দেশ?

বহু পথ অতিক্রম ক'রে এসে তাঁরা মৃতপ্রায় জটায়ুর সাক্ষাৎ পেলেন। জটায়ু তাঁদের সকল কথা নিবেদন ক'রে বললেন, দুর্দ্ধর্ষ রাবণ তোমার পত্নীকে হরণ করেছে—তোমরা দক্ষিণাভিমুখে যাও।

এই দক্ষিণ দিক ধ'রে কিছুদূর যেতেই বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হ'লো। তিনিও জানালেন সীতার সংবাদ এবং নিদর্শন-স্বরূপ সীতার পরিত্যক্ত উত্তরীয় ও অলংকারাদি দেখালেন। তাই দেখে রাম সীতার শোকে বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন। তারপর উভয়ের মধ্যে পরামর্শ চললো এবং সীতা উদ্ধারে সুগ্রীব তাঁকে সকল রকমে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সুগ্রীবও জানালেন রামচন্দ্রকে তাঁর দুঃখের কথা। জ্যেষ্ঠ ভাই বালী তাঁকে অন্যায় ভাবে বিতাড়িত করেছেন। সুগ্রীবকেও রাম প্রতিশ্রুতি দিলেন, বালীকে বধ করে তাঁকে রাজ-সিংহাসনে বসাবেন।

এরপর বালীর সঙ্গে হলো রামচন্দ্রের তুমুল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে বালী নিহত হলেন এবং সুগ্রীব রাজা হয়ে বসলেন। রাজা হয়ে সুগ্রীব সীতা-অন্বেষণে চারদিকে চর পাঠালেন। কিন্তু সকল চরই একে একে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। শেষে হনুমান নিলেন সীতার সন্ধানের ভার। এই হনুমান ছিলেন মহাবীর এবং জ্ঞানী।

যাত্রাকালে রামচন্দ্র তাঁকে তাঁর হাতের অঙ্গুরীয় নিদর্শনস্বরূপ দিলেন। হনুমান রামচন্দ্রকে প্রণাম করে যাত্রা করলেন।

হনুমান ঘুরতে ঘুরতে এলেন বিন্ধ্যপর্ব্বতে। সেখানে দেখা হলো জটায়ুর ভাই সম্পাতির সঙ্গে। তাঁর কাছে শুনলেন, সমুদ্রের অপর পারে লঙ্কা বলে একটি দ্বীপ আছে। সেখানে রাবণ

সীতাকে অবরোধ ক'রে রেখেছে। এখন তুমি সমুদ্র-লঙ্ঘনের উপায় স্থির কর।

হনুমান পর্ব্বত-শৃঙ্গে উঠে রামচন্দ্রকে স্মরণ ক'রে লম্ফ প্রদান করলেন। পবন-নন্দন হনুমান প্রচণ্ড বেগে সমুদ্র অতিক্রম করতে লাগলেন। দূর থেকে দেখতে পেলেন পরপারে বনরাজী শোভিত দ্বীপ। সাগর পারে নেমে কি ভাবে তিনি সীতার অন্বেষণ করবেন ভেবে নিলেন। তারপর সুরু হ'লো তাঁর অন্বেষণ। প্রথমেই প্রবেশ করলেন রাজ-প্রাসাদে। কিন্তু রাজ-প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও কোথাও সীতাকে দেখতে পেলেন না। লঙ্কার বন, উপবন, বিভিন্ন হর্ম্যরাজী পরিদর্শন করেও সীতার সন্ধান মিললো না। অবশেষে দেখলেন, সীতাকে অশোকবনে রাক্ষসী-পরিবেষ্টিতা।

ক্রন্দনরতা সীতাকে দেখে হনুমানের বুঝতে দেরী হ'লো না ইনিই সীতা। হনুমান এসে গাছের ওপর বসলেন, সকলেই কৌতূহলী হয়ে সেদিকে তাকালো।

হনুমান কৌশল ক'রে রাম-প্রদত্ত আংটি সীতার কোলের ওপর ফেলে দিলেন। সীতা সেই আংটি দেখে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন—রাক্ষসীরা কিছু বুঝতে না পেরে মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগলো। সীতা তাঁরও একটি নিদর্শন মাটিতে রেখে দিলেন। হনুমান নেমে এসে নিয়ে গেলেন।

এবার বিদায়ের পালা। কিন্তু হনুমান এমন নিঃশব্দে ফিরে যেতে চান না—তাই অশোকবনের গাছপালা ভেঙে দিয়ে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করলেন।

রাক্ষসীরা ছুটে গিয়ে এ-সংবাদ রাবণরাজাকে জানালে। রাবণ সেই হনুমানকে ধরবার জন্যে রাক্ষসদের নিযুক্ত করলেন। হনুমান তো ধরা দিতেই চান। কারণ তিনি লঙ্কায় এসে একবার রাবণকে দেখে যাবেন না? হনুমান ধরা পড়ে রাবণের কাছে আনীত হ'লো।

রাবণ আদেশ দিলেন, এই মর্কটটার লেজ পুড়িয়ে দাও। আদেশ-মত তার লেজে কাপড় জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'লো।

হনুমান সেই আগুন লঙ্কার সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। লঙ্কা পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেলো।

হনুমানের এই কাণ্ড দেখে সবাই হতবাক হ'য়ে গিয়েছিলো। মনের আনন্দে হনুমান আবার সাগর লঙ্ঘন ক'রে রামচন্দ্রের কাছে ফিরে এলেন। হনুমানের মুখে সকল সংবাদ পেয়ে এবং সীতার নিদর্শন দেখে রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের আয়োজন করতে লাগলেন।

এদিকে রাবণও খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন। সামান্য একটা মর্কট এতবড় কাণ্ডটা করে গেলো—এতে সকলেই বিচলিত হলেন। রাবণের ভাই বিভীষণ বললেন, এই অগ্নিকাণ্ড সামান্য নয় মহারাজ! এই আগুন সর্বনাশের ইঙ্গিত বহন করছে। যাকে আপনি সামান্য মনে করছেন মহারাজ, সে যে সামান্য নয় আমি সেই কথাই বলতে এসেছি। রাম নররূপী দেবতা। ত্রিভুবনে কারো শক্তি নেই তাকে বধ করতে পারে। আপনি সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন মহারাজ !

কিন্তু বিভীষণের হিতোপদেশ শুনে রাবণ শত্রুজ্ঞানে ভাইকে পরিত্যাগ করলেন।

বিভীষণ ক্ষুণ্ণমনে রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে রামচন্দ্রের কাছে চলে এলেন। শরণাগত হিসেবে রাম বিভীষণকে আশ্রয় দিলেন। এবং বললেন, তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো, আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি তোমাকে লঙ্কার রাজ-সিংহাসনে বসাবো।

এই বিভীষণের কাছ থেকেই রামচন্দ্র রাবণ-বধের সকল গোপন-তথ্য সংগ্রহ করলেন।

এর পর সুরু হ'লো সাগর বাঁধবার আয়োজন। বানররাই বড় বড় বৃক্ষ ও পাথর দিয়ে সেই সেতু নির্মাণ করলো। রামচন্দ্র সদলবলে লঙ্কায় প্রবেশ ক'রে শিবির সংস্থাপন করলেন।

রাবণ গুপ্তচর মুখে এ সংবাদ অবগত হ'য়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন। এসময় অনেকেই তাঁকে যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত হতে বললেন। কিন্তু রাবণ সে কথায় কর্ণপাতও করলেন না।

যুদ্ধ সুরু হ'লো। এই যুদ্ধে বহু রাক্ষস নিহত হ'লো। রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণ—যিনি মহাবীর ব'লে খ্যাত তিনিও শেষ পর্যন্ত প্রাণ

হারালেন। এরপর রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ—যিনি ইন্দ্রকে পরাস্ত করে-ছিলেন, তিনি রামচন্দ্রের বধের জন্য নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সম্পূর্ণ করতে বসলেন, কিন্তু সে যজ্ঞ তাঁর সম্পূর্ণ হ'লো না। বিভীষণই সে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হ'তে দিলেন না, কারণ তিনি জানতেন এই যজ্ঞ শেষ করতে পারলে ইন্দ্রজিৎ সকলকেই নিহত করবার শক্তি অর্জন করবে। তিনি লক্ষ্মণকে নিয়ে যজ্ঞাগারে উপস্থিত হলেন। ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যকে দেখে, বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি কটুবাক্য ব'লে তিরস্কার করলেন এবং যজ্ঞ অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি লক্ষ্মণকে আক্রমণ করলেন। ইন্দ্রজিৎ ধরাশায়ী হ'লেন।

পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রাবণ শোকে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন।

এরপর রাবণ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। কিন্তু রাবণকে বধ করা সহজসাধ্য নয়। রামের সকল শর ব্যর্থ হ'লো। শেষে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করতেই রাবণ ভূপতিত হলেন।

যথারীতি রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হ'লে রামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

এর পর রাম সন্দর্শনে যখন সীতা এলেন, তখন রামচন্দ্র বললেন, আমার কর্তব্য আমি করেছি। যুদ্ধে শত্রুজয় ক'রে তোমাকে উদ্ধার করেছি। যে নিজের শক্তিতে অপমানের শোধ নিতে পারে না তার পৌরুষ বৃথা। কিন্তু এত যে করেছি, সে তোমার জন্যে নয়, নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন এবং আমার বংশের গ্লানি দূর করবার জন্যে আমি কাজ করেছি। নইলে তোমাকে গ্রহণ করবো ব'লে নয়। রাবণের অঙ্কে নিপীড়িত হয়েছ তুমি—তোমাকে আমি গ্রহণ করতে পারি না।

এ কথা শুনে সীতা মরমে মরে গেলেন। তিনি স্থির করলেন জীবন আর রাখবেন না—লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করতে বললেন।

সীতার আদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত হ'লো। সীতা রামচন্দ্রকে প্রণাম ক'রে যুক্তকরে অগ্নিকে বললেন, যদি আমার হৃদয় চিরকাল রাঘবের প্রতি একনিষ্ঠ থাকে, তিনি যাকে দুষ্টা মনে করেন সেই আমি যদি শুদ্ধচরিত্রা হই, তবে লোকসাক্ষী অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করুন।

এই বলে সীতা নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্নি-প্রবেশ করলেন। সকলে হায় হায় ক'রে উঠলো।

কিন্তু স্বয়ং অগ্নিদেব সীতাকে কোলে ক'রে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এলেন।

সীতার এই অগ্নিশুদ্ধিতে রামের সংশয় গেলো। সকলেই উৎফুল্ল হ'য়ে রাম-সীতাকে সঙ্গে ক'রে অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

ভরত-শত্রুঘ্ন বশিষ্ঠাদি সকলে হৃষ্টচিত্তে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করলেন।

অভিষেকের পর সুগ্রীব ও বিভীষণ তাঁদের অনুচরদের সঙ্গে নিজ নিজ দেশে চ'লে গেলেন।

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাম বিবিধ যজ্ঞ করলেন। তিনি দশ সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন এবং দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। রামরাজ্যের সকল প্রজা নিজ নিজ কর্মে তুষ্ট, ধর্ম-পরায়ণ, সত্যবাদী ছিলেন।

কিন্তু এত ক'রেও লোকাপবাদ দূর হ'লো না। সীতা সম্বন্ধে নানাজনে নানা কথা বলতে লাগলো। এই অপবাদের জন্যে রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে রেখে আসেন। সীতা ছিলেন তখন অন্তঃসত্ত্বা। এই বাল্মীকির আশ্রমেই রামচন্দ্রের দুই পুত্র লব এবং কুশ জন্মগ্রহণ করে।

এরপর বাল্মীকি এবং বশিষ্ঠাদির পরামর্শক্রমে আবার সীতাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনা হ'লো। কিন্তু অপবাদ দূর হ'লো না। বার বার এই অপবাদের গ্লানি সীতা সহ্য করতে পারলেন না। মাটি-মায়ের সন্তান তিনি। মা বসুমতীই তাঁকে কোলে আশ্রয় দিলেন।

প্রজানুরঞ্জনের জন্যে পত্নীত্যাগ—এতবড় আদর্শ জগতে বিরল।

* * * *

মহাভারতের গল্প হলো মূলতঃ কুরু-পাণ্ডবকে নিয়ে। আনুষঙ্গিকভাবে যেসব কাহিনী এতে এসে পড়েছে তা অবিচ্ছিন্ন নয়। বরং মূল কাহিনীকে তারা সাহায্যই করেছে। মহাভারতের পটভূমিকাও

যেমন বৃহৎ, সংখ্যানুপাতে চরিত্রগুলিও তেমনি অসংখ্য। এতগুলি চরিত্রকে নিয়ে পূর্ণ মর্যাদাদান—গ্রন্থকারের দিক থেকে কম কৃতিত্বের কথা নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এ বিরল।

মহাভারত

কুরু-পাণ্ডবের কথা বলতে গেলে একটু গোড়া থেকেই বলতে হয়। হস্তিনাপুরের রাজা তখন শান্তনু। গঙ্গার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তিনি বিবাহ করতে চাইলেন। গঙ্গা সম্মত হলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন তাঁর কাজে রাজা কোনোদিনই বাধা দেবেন না—বাধা পেলে তিনি সেইদিনই গৃহ-ত্যাগ করবেন।

বেশ সুখেই দিন কাটছিলো। গঙ্গা সন্তান-সম্ভবা। রাজা মনের আনন্দেই আছেন। কিন্তু কোথায় সন্তান? সে সন্তানকে রাণী গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়েছেন। সংবাদ শুনে রাজা ক্ষুণ্ণ হলেন। এমনি ক'রে গঙ্গা পর পর সাতটি পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দিলেন। বাধা দিলেন রাজা অষ্টম পুত্রের বেলায়। বললেন, এ কি মহাপাতক করছো তুমি! গঙ্গা হাসলেন। বললেন, তুমি পুত্র চাও—পুত্রই পাবে কিন্তু আমাকে আর পাবে না।

কিন্তু জানতে পারি কি, তোমার এই পাপাচরণ কেন?

গঙ্গা বললেন, বশিষ্ঠের শাপে অষ্টবসু নরদেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন—আমি তাদেরই উদ্ধারকল্পে সাতজনকেই জলে বিসর্জন দিয়েছি কিন্তু বাধা পেলাম, অষ্টম পুত্রের বেলায়। ও পুত্র তোমার কাছেই রইলো—আমি চললাম।

গঙ্গা অন্তর্হিত হলেন। একমাত্র পুত্র দেবব্রতকে নিয়ে শান্তনু ক্ষুণ্ণ মনে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।

কাল যায়। কিন্তু কালের প্রলেপে শান্তনুর মন শান্ত হয় না। দেবব্রত দেখলেন, পিতার মনে সুখ নেই। তিনি রাজকার্য্য ছেড়ে বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়ান।

এমনি বেড়াতে বেড়াতে শান্তনু একদিন যমুনা তীরে এসে দেখলেন, এক অপরূপ সুন্দরী তাঁর দিকে সস্মিত নয়নে চেয়ে আছেন। রাজা তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন।

শুনলেন, তিনি দাসরাজের কন্যা। রাজা শান্তনু দাসরাজের কাছে গিয়ে সেই কন্যার পাণিপ্রার্থনা করলেন। দাসরাজ জানালেন, আমার এই কন্যার গর্ভজাত সন্তান রাজা হবে এই প্রতিশ্রুতি দিলে আমি কন্যা দান করতে পারি।

রাজা ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে এলেন। সংবাদ চাপা থাকলো না। দেবব্রতও শুনলেন। তিনি গোপনে দাসরাজের সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন, আমি যদি স্বেচ্ছায় রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করি—তাহলেও কি আপনি কন্যা দেবেন না?

দাসরাজ বললেন, কিন্তু তোমার পুত্র? সে তার প্রাপ্য রাজ্য ছাড়বে কেন?

দেবব্রত বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি কখনো বিবাহ করবো না—আপনি কন্যা দান করুন।

এই অসাধ্য সাধন করলেন বলেই দেবব্রত হলেন ভীষ্ম। পিতা আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করলেন। বললেন, আমি তোমাকে বর দিচ্ছি—তুমি যতদিন বাঁচতে ইচ্ছা করবে ততদিন তোমার মৃত্যু হবে না—মৃত্যু হবে তোমার ইচ্ছামৃত্যু।

এই দাসকন্যা সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পুত্র হ'লো, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র যৌবন লাভ করবার আগেই পিতার মৃত্যু হ'লো। সত্যবতীর মত নিয়ে ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদ বেশীদিন বাঁচলেন না—যুদ্ধে নিহত হলেন। বাধ্য হ'য়ে অপ্রাপ্ত যৌবন বিচিত্রবীর্য্যকেই রাজা হ'তে হ'লো।

কাশীরাজের তিন কন্যার একসঙ্গে স্বয়ংবর হচ্ছে শুনে ভীষ্ম তাঁদের তিন-জনকেই হরণ ক'রে নিয়ে এলেন বিচিত্রবীর্য্যের জন্যে। কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা বললেন, আমি শাল্বরাজকেই বিবাহ করতে চাই—আমার পিতারও এতে সম্মতি আছে। দয়া ক'রে আমাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

ভীষ্ম সেই ব্যবস্থাই করলেন। এবং দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন। কিন্তু অম্বা শাল্বরাজের

গৃহেও স্থান পেলেন না। প্রত্যাখ্যাত অম্বার চোখে আগুন জ্বলে উঠলো। ভীষ্মই তাঁর সর্বনাশের কারণ। তাই তিনি ভীষ্ম-বধের জন্যে কঠোর তপস্যা সুরু করলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে বর দিতে এলেন। কিন্তু অম্বার এক পণ ঃ ভীষ্ম-বধ ছাড়া তিনি আর কোনো বর নেবেন না। মহাদেব বললেন, তুমি অন্য দেহে পুরুষত্ব পেয়ে ভীষ্মকে বধ করবে, বর্ত্তমান দেহের সব ঘটনাও তোমার মনে থাকবে। তুমি দ্রুপদের কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং কিছুকাল পরে পুরুষ হবে।

এই অম্বাই নবজন্ম লাভ ক'রে পরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে শিখণ্ডী নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

ভীষ্ম অঙ্গীকার করেছিলেন, স্ত্রীলোকের সঙ্গে ও নপুংসকের সঙ্গে কোনোদিন যুদ্ধ করবেন না। তাই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীষ্ম শিখণ্ডীকে সম্মুখে দেখে অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন। ভীষ্মের এই অস্ত্র-ত্যাগই ভীষ্ম-বধের অন্যতম কারণ।

বিবাহের পর বিচিত্রবীর্য্য অতি অল্প দিনের মধ্যে যক্ষ্মারোগে প্রাণ হারালেন।

অপুত্রক অম্বিকা ও অম্বালিকা ব্যাসের অনুগ্রহে দুই পুত্র লাভ করলেন। একটি অন্ধ, একটি পাণ্ডুবর্ণ।

এই অন্ধ পুত্রই ভারত-প্রসিদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র এবং অপরটি পাণ্ডু। জ্যেষ্ঠ হলেও জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য পেলেন না—পেলেন পাণ্ডু।

ব্যাস বর দিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী গান্ধারীর শতপুত্র হবে। কিন্তু গান্ধারী পুত্র লাভ করবার আগেই পাণ্ডু-মহিষী কুন্তীর পুত্র-সন্তান হ'লো। জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে রাজ্যের অধিকারী হলেন কুন্তী-পুত্র যুধিষ্ঠির। গান্ধারী মনের জ্বালায় জ্বলতে লাগলেন। শতপুত্র লাভ করেও গান্ধারীর সে-জ্বালা কোনোদিন নেভেনি।

ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র এবং পাণ্ডুর পাঁচপুত্র। এঁরাই হলেন কুরু ও পাণ্ডব। এই কুরু-পাণ্ডব নিয়েই কুরুক্ষেত্র রচনা। জমি নিয়ে লড়াই। যা যুগে যুগে হয়ে আসছে।

জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির রাজা হবেন এই সম্ভাবনা দুর্য্যোধনের মনকে

বিষিয়ে তুললো। এই ঈর্ষার স্তিমিত আগুনই তাঁকে সর্বনাশের পথে নিয়ে গেলো।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারদের শিক্ষার ব্যবস্থা হ'লো। শাস্ত্র-শিক্ষার সঙ্গে শস্ত্র-শিক্ষা। দ্রোণাচার্য্য হলেন শিক্ষা-গুরু। এখানেও সকল বিদ্যায় পাণ্ডবরাই হলেন অগ্রণী। তার মধ্যে অর্জ্জুন হলেন ধনুর্বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ। ঈর্ষা প্রবল আকার ধারণ করলো। দুর্যোধন নানা চক্রান্ত করতে লাগলেন এই পঞ্চ পাণ্ডবের বিনাশের জন্যে। কিন্তু সকল ষড়যন্ত্রই হ'লো ব্যর্থ।

কুমারদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লে তাঁদের ক্রিয়া-প্রদর্শনের জন্যে সভা আহ্বান করা হ'লো। দেশ-বিদেশ থেকে রাজা-মহারাজারা সেই খেলা দেখতে এলেন। পুরমহিলারাও বসেছেন পৃথক আসনে। অর্জুনের অস্ত্র-চালনায় সভাস্থ সকলেই স্তম্ভিত হলেন। কিন্তু বিস্মিত হন নি একজন অজ্ঞাতকুলশীল যুবক—তিনি আহ্বান করলেন অর্জুনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

সভাস্থ সকলেরই দৃষ্টি পড়লো এই যুবকটির প্রতি। শালপ্রাংশু-মহাভুজ কবচকুণ্ডল-শোভিত অনিন্দ্য-সুন্দর কে ঐ যুবক?

এই যুবকের নাম কর্ণ। সূর্য্যের অনুগ্রহে কুমারী কুন্তী এই পুত্র লাভ করেছিলেন। কিন্তু কলংকের ভয়ে এই পুত্রকে তিনি জলে ভাসিয়ে দেন। সূতবংশীয় অধিরথ ও তাঁর পত্নী রাধা এই শিশু-পুত্রকে পালন করেন।

সভাস্থ সকলেই যখন কর্ণের পরিচয় জানতে সমুৎসুক তখন কুন্তী তাঁর পুত্রকে চিনতে পেরে মূর্চ্ছিত হন। সেদিনও পারলেন না তিনি কর্ণকে আপন সন্তান ব'লে গ্রহণ করতে। কর্ণের সকল পরিচয় তাই অন্তরালেই রয়ে গেলো।

কিন্তু কর্ণ যখন অধিরথ-সূত বলে নিজের পরিচয় দিলেন তখন সভাস্থ সকলেই 'ছি-ছি' করতে লাগলেন। এবং তাঁরা সকলেই সমস্বরে বলে উঠলেন: এ রাজ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা—এখানে ওর স্থান নেই।

দুর্য্যোধন কর্ণকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, ক্ষুব্ধ হয়ো না বন্ধু—আমি তোমাকে সমগ্র অঙ্গ রাজ্য দান করছি।

কিন্তু রাজ্য পেলেও তাঁর পরিচয় মোছে না—তিনি সূত-পুত্র।

এই সদম্ভ উক্তি শুনে, দুর্য্যোধন বললেন সকলের জন্ম-বৃত্তান্তই আমার জানা আছে—সুতরাং সে প্রশ্ন না তোলাই ভাল।

কর্ণ সভা-মণ্ডপ ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন।

দুর্য্যোধন আবার নতুন ক'রে পরামর্শ-সভা বসালেন। পাণ্ডব-বিনাশের নতুন ষড়যন্ত্র। এবারের ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন সখা কর্ণ এবং মাতুল শকুনি।

তাঁরা পরামর্শ ক'রে বারণাবতে এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করালেন। যার প্রধান উপকরণ হ'লো গালা। কৌশল ক'রে ধৃতরাষ্ট্রই পাঠালেন তাঁদের এই বারণাবতের এই নূতন আবাসে। চক্রান্ত পাণ্ডবরাও বুঝেছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা চলেনা। তাঁরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই এলেন বারণাবতে। কিন্তু যুধিষ্ঠির গোপনে এক সুড়ঙ্গ-পথ নির্ম্মাণ করালেন। একদিন গভীর রাত্রে নিজেরাই অগ্নি-সংযোগ করে সেই সুড়ঙ্গ-পথে অন্তর্হিত হলেন।

সকলেই জানলো পাণ্ডবরা পুড়ে মরেছে। দুর্য্যোধনও এ-সংবাদে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

এইখান থেকেই পাণ্ডবদের বনবাস সুরু হলো। এই বনবাস-কালেই হিড়িম্বা-রাক্ষসীর সঙ্গে ভীমের সাক্ষাৎলাভ ঘটে। হিড়িম্বা ভীমের অনুরাগিণী—ভীম তাঁকে ত্যাগ করতে পারলেন না, বিবাহ করলেন। এই হিড়িম্বার গর্ভে ভীমের একটি পুত্র-সন্তান জন্মলাভ করে। তার মাথা ঘটের মতো আর চুল খাড়া ব'লে হিড়িম্বাই তার নাম দিলেন ঘটোৎকচ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসরা যৌবন-প্রাপ্ত হয়। ঘটোৎকচও হ'লো। কুন্তী ও পাণ্ডবদের প্রণাম ক'রে সে বললে, আমার প্রতি আপনাদের আদেশ?

কুন্তী বললেন, পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি—তুমি শ্রেষ্ঠ বীর, প্রয়োজনে সাহায্য করাই হবে তোমার পরম কাজ।

প্রয়োজন হ'লেই সে উপস্থিত হবে। ব'লে ঘটোৎকচ বিদায় নিয়ে উত্তর দিকে চলে গেলো।

পাণ্ডবরা জটা-বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ ক'রে তপস্বীর বেশে মৎস্য,

ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল ও কীচক দেশের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন। পথে দেখা হলো ব্যাসের সঙ্গে। ব্যাস হ'লো এঁদের পূর্বপুরুষ। তিনি বললেন, তোমাদের সকল কথাই আমি জানি। বিষণ্ণ হ'য়ো না বৎস, তোমাদের মঙ্গল হবে। তাঁরই নির্দেশক্রমে তাঁরা এলেন এক-চক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে। ব্রাহ্মণ পরম আদরে তাঁদের স্থান দিলেন। একদিন খবর পেলেন দ্রুপদরাজ-কন্যা দ্রৌপদী স্বয়ংবরা হচ্ছেন। ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারী বেশে তাঁরা এলেন সেই স্বয়ংবর-সভায়। দেশ-বিদেশ থেকে বহু রাজা সমাগত। কর্ণ দুর্য্যোধনাদিও এসেছেন।

দ্রৌপদীর পণ লক্ষ্যভেদ। একটি যন্ত্রের মধ্যস্থিত ছিদ্রপথ দিয়ে পর পর পাঁচটি বাণ দ্বারা তাঁর লক্ষ্য-বস্তু বিদ্ধ করতে হবে। পণ শুনে সকলেই পিছিয়ে এলেন। এগিয়ে এলেন মহাবীর কর্ণ। কিন্তু তিনি ধনুর্বাণ হাতে করতেই 'সূতপুত্র' ব'লে দ্রৌপদী আপত্তি জানালেন। অনেকেই প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু দ্রৌপদী বললেন, তিনি কিছুতেই সূতপুত্রকে বরণ করবেন না।

কর্ণ ধনুর্বাণ ফেলে সভা-গৃহ ত্যাগ করলেন। এলেন ছদ্মবেশী অর্জুন। দুর্য্যোধন চমকে উঠলেন। অর্জুনের হাতে লক্ষ্যবস্তু বিদ্ধ হলো। দ্রৌপদী স্মিত-হাস্যে অর্জুনের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন।

মায়ের আদেশে দ্রৌপদী হলেন পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী।

দ্রৌপদীর এই পঞ্চস্বামী সম্বন্ধে অনেক কাহিনীই লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু কাহিনী যাই থাক, দেশ-কাল ভেদে তখন হয়তো ঐ প্রথাই প্রচলিত ছিলো। মনে হয় এই যুক্তিই সমীচীন।

পাণ্ডবদের বিবাহ-সংবাদ হস্তিনাপুরেও পৌঁছুলো। ধৃতরাষ্ট্র খুসী হলেন। তাঁদের পরম সমাদরে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন এবং তাঁদের অর্দ্ধরাজ্য ভাগ ক'রে দিলেন। খাণ্ডবপ্রস্থ পড়লো পাণ্ডব-দের ভাগে। এই খাণ্ডবপ্রস্থই হ'লো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ইন্দ্রপ্রস্থ।

এই সময় নারদ এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। যুধিষ্ঠিরকে বললেন—দ্রৌপদী স্ত্রী-রত্ন। তোমরা সেই রত্ন লাভ করেছো। কিন্তু পাঁচজনকে সমান ভাবে খুসী রাখা তাঁর পক্ষে কি সম্ভব হবে? যাতে পাঁচ ভাই-এর মধ্যে কোনদিন বিচ্ছেদ না হয়, সে চেষ্টাও ঐসঙ্গে করা উচিত।

নারদের এই নির্দ্দেশক্রমেই যুধিষ্ঠির নিয়ম করলেন যে দ্রৌপদী এক একজনের গৃহে এক এক বৎসর বাস করবেন। সে সময় অন্য কোন ভাই তাঁদের গৃহে প্রবেশ করবেন না। যদি করেন তবে তাঁকে ব্রহ্মচারী হয়ে বার বৎসর বনবাসে যেতে হবে।

পাঁচ ভাই এ-নিয়ম মেনে নিলেন। কিন্তু নিয়তির বিধান—এক সময় ব্রাহ্মণরা এসে অর্জুনকে জানালেন—আমাদের গো-ধন অপহৃত হচ্ছে। ব্রাহ্মণের ধন চোরে নিয়ে যাচ্ছে—তুমি তার প্রতিকার করো। রাজধর্ম্ম পালনের জন্যে অর্জুন ব্রাহ্মণদের আশ্বাস দিয়ে অস্ত্র আনতে গেলেন। কিন্তু যে-গৃহে এই অস্ত্রাদি সংরক্ষিত আছে সেই গৃহে তখন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বাস করছেন। অর্জুন পূর্ব নিয়ম স্মরণ করে সমস্যায় পড়লেন, কিন্তু তখন চিন্তা করবারও সময় নেই। সুতরাং নিয়ম-ভঙ্গ করেই তাঁকে ঘরে ঢুকতে হ'লো।

কাজ উদ্ধার ক'রে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন শাস্তি গ্রহণের জন্যে। যুধিষ্ঠির বললেন—জ্যেষ্ঠের ঘরে কনিষ্ঠ এলে দোষ হয় না, তোমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নেই। অর্জুন কিন্তু অধর্মাচরণ করতে চাইলেন না—বার বৎসরের জন্যে বনবাসে গেলেন।

এই বনবাসকালে—বহুদেশ ভ্রমণ করতে করতে একদা অর্জুন নাগরাজ-কন্যা উলুপীর সাক্ষাৎ পেলেন। উলুপী তাঁকে কামনা করলেন পতিরূপে। অর্জুন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না—বিবাহ করলেন। এই বনবাসকালেই অর্জুন মণিপুরে চিত্রাঙ্গদাকেও বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর গর্ভেই অর্জুনপুত্র বভ্রুবাহন জন্মগ্রহণ করেন। তারপর অর্জুন পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্ত্তী সকলতীর্থ পর্য্যটন করে প্রভাসে গেলেন। প্রভাস থেকে গেলেন দ্বারকায়, দ্বারকায় কৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রাকে দেখে অর্জুন মোহিত হলেন। কৃষ্ণের পরামর্শে তিনি তাঁকে হরণ করে বিবাহ করেন। এই সুভদ্রার গর্ভে মহাভারত-খ্যাত অভিমন্যুর জন্ম। প্রতিশ্রুত কাল কাটিয়ে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন। তখন একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মহারাজ, আপনি রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করে সম্রাটোচিত কাজ করুন। মহাসমারোহে সেই আয়োজনই চললো। রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ হ'লো

ইন্দ্রপুরী। জ্ঞাতি-ভাই দুর্য্যোধনাদি সে-ঐশ্বর্য্য দেখে ঈর্ষান্বিত হলেন।

মাতুল শকুনি দুর্য্যোধনের মনোভাব বুঝলেন। বললেন—তুমি চাও এই ইন্দ্রপ্রস্থ ?

পরিহাস মনে ক'রে দুর্য্যোধন মাতুলকে তিরস্কার করলেন।

কিন্তু শকুনি তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি ইচ্ছা করলে, শুধু ইন্দ্রপ্রস্থ কেন সমগ্র সাম্রাজ্য তাঁর হাতে তুলে দিতে পারেন। চাই বুদ্ধি—আর সে বুদ্ধি আমি তোমাকে দেবো দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন উত্তেজিত হয়ে বললেন—আমি তোমার শরণাপন্ন।

আবার বসলো দুজনের মধ্যে গোপন-সভা। এবং সেই পরামর্শ-মত হস্তিনাপুরে এসে তাঁরা যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার আমন্ত্রণ জানালেন। এই দ্যূতক্রীড়া ছিলো তখনকার দিনে বিলাস। যুধিষ্ঠিরও ছিলেন পাশা খেলার অনুরাগী। তাই অতি সহজেই মাতুল শকুনির ফাঁদে পা দিলেন।

নিষেধ করলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি। বললেন, এ পাপ-খেলায় জগতে কারো মঙ্গল হয় নি। কিন্তু খেলার উন্মাদনায় তখন যুধিষ্ঠির হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছেন।

শকুনি কি যাদু জানেন! তাঁর হাতের পাশা যেন কথা বলে। যুধিষ্ঠির সর্বস্ব হারাতে বসলেন। হারালেন রাজ্য, ধন রত্ন যা যেখানে ছিলো। শেষে ভাইদের পণ রাখলেন—তাও হারালেন।

বাকি আছেন একমাত্র দ্রৌপদী। অবশেষে তাও পণ রাখলেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর সকলে হায় হায় ক'রে উঠলেন। তিরস্কার করলেন তাঁরা শকুনিকে। কিন্তু খেলার উন্মাদনায় রাজসভা তখন চঞ্চল।

যুধিষ্ঠির এই শেষ খেলাতেও হারলেন। দ্রৌপদীকে নিয়ে আসা হ'লো সভাস্থলে—লাঞ্ছিত হলেন কুরু-কুললক্ষ্মী সকলের সম্মুখে। এতবড় পাপও ভীষ্ম-দ্রোণাদি ধর্মের মুখ চেয়ে নীরবে সহ্য করলেন। অধোবদনে রইলেন যুধিষ্ঠির, অধোবদনে রইলেন যুধিষ্ঠিরের ভাইরা।

পণ-অনুযায়ী পাণ্ডবেরা দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস স্বীকার ক'রে নিয়ে বনে চলে গেলেন।

কিন্তু তাঁদের বনে পাঠিয়েও দুর্যোধনের ঈর্ষা কমলো না। পাণ্ডবদের দুর্দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার জন্যে দুর্যোধন সদলবলে এলেন দ্বৈতবনে। সঙ্গে এলেন কুরু-পত্নীরা।

কিন্তু তাঁরা দ্বৈতবনে প্রবেশ করতে পারলেন না। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন দিলেন বাধা। ফলে উভয়পক্ষে হলো যুদ্ধ। সে যুদ্ধে কুরু-সৈন্য অনেক নিহত হ'লো এবং দুর্যোধনাদি সহ কুরু-পত্নীগণ অপহৃত হলেন। সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির গন্ধর্বদের আক্রমণ করলেন। এখানে শত্রু-মিত্রের প্রশ্ন নয়, গন্ধর্বরা কুরু-নারীদের হরণ ক'রে তাঁদের কুলে আঘাত দিয়েছে। কুরু-পাণ্ডব এখানে এক। যুদ্ধ এখানে ব্যক্তিস্বার্থে নয়, কুল-স্বার্থে। তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অপেক্ষা এ-যুদ্ধের গুরুত্ব অনেক বেশী।

চিত্রসেন পরাভব স্বীকার ক'রে বন্দীদের মুক্তি দিলেন।

এই বনবাসকালে পার্থ ইন্দ্রের দিব্যাস্ত্রলাভের জন্যে হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা সুরু করলেন। ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে বললেন—তুমি শিবের আরাধনা করো—তোমার অভীষ্ট লাভ হবে। মহাদেব কিরাতের বেশে দর্শন দিলেন। সেই সময়ে মূক নামে এক দানব বরাহের রূপ ধ'রে অর্জুনের দিকে ধাবিত হ'লো। অর্জুন শরাঘাত করতে গেলে, কিরাতবেশী মহাদেব বললেন—এ বরাহকে মারবার ইচ্ছা আমি পূর্বেই করেছি, অতএব তুমি নিরস্ত হও। অর্জুন শর-যোজনা করেছেন তাই আর নিবৃত্ত হতে পারলেন না। দুজনেরই শর বরাহ-অঙ্গে বিদ্ধ হ'লো। অর্জুন বললেন—তুমি মৃগয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করেছো সেজন্যে তোমাকে বধ করবো। তারপর দুজনে ঘোরতর যুদ্ধ হ'লো। অর্জুন কিছুতেই কিরাতকে পরাস্ত করতে পারলেন না। শেষে অনন্যোপায় হয়ে তিনি মহাদেবের পূজো করলেন। তাঁর নিবেদিত মাল্য কিরাতের মস্তকে লগ্ন হ'তে দেখে, অর্জুন তাঁর পায়ের ওপর পড়ে গেলেন। মহাদেব তুষ্ট হয়ে তাঁকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করলেন এবং তার প্রয়োগ-কৌশলও বলে দিলেন এবং মহাদেবের নির্দেশক্রমে তিনি স্বর্গে গিয়ে অন্যান্য দেবতাদেরও তুষ্ট ক'রে বিবিধ অস্ত্রলাভ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁকে প্রার্থিত দিব্যাস্ত্র দিলেন। এই স্বর্গবাস কালেই

অর্জুনের সঙ্গে উর্বশীর সাক্ষাৎ ঘটে। উর্বশী তাঁকে প্রণয় নিবেদন করলে, অর্জুন গুরু-পত্নী জ্ঞানে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। উর্বশী তাঁকে অভিসম্পাত দিলেন, তুমি নপুংসক নর্ত্তক হয়ে স্ত্রীদের মধ্যে বিচরণ করবে।

ইন্দ্র অর্জুনকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, উর্বশীর অভিসম্পাত তোমার কাজে লাগবে—অজ্ঞাতবাসকালে তুমি এক বৎসর নপুংসক নর্ত্তক হয়ে থাকবে, তারপর আবার পুরুষত্ব পাবে।

অর্জুনের বৃহন্নলার রূপ-পরিগ্রহের এই হ'লো কারণ।

কালপ্রবাহে একদিন দ্বাদশ বর্ষও অতিক্রান্ত হলো। এবারে সুরু হলো পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস। তাঁরা ছদ্মবেশে বিরাট রাজার আশ্রয়ে এসে বাস করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির দ্যূত-ক্রীড়ায় নিপুণ, তাই সভাগৃহেই তাঁর স্থান হ'লো, ভীম এলেন সূপকারের বেশে, সহদেব গোরক্ষক হয়ে, নকুল অশ্বরক্ষক আর অর্জ্জুন নপুংসক বৃহন্নলার বেশে বিরাট রাজার কন্যাকে নৃত্য-গীত-বাদ্য শেখাতে এলেন। এবং দ্রৌপদী এলেন সৈরিন্ধ্রীর বেশে। এই সৈরিন্ধ্রীর কাজ হ'লো, কেশসংস্কার, চন্দনাদি পেষণ, মাল্যরচনা প্রভৃতি। সেকালে রাজ-মহিষীদের পরিচর্য্যায় সৈরিন্ধ্রীদের নিযুক্ত করা হ'তো।

রাজ-শ্যালক কীচক সৈরিন্ধ্রীকে দেখে মুগ্ধ হলো। তাকে পাবার জন্যে সে নানা কৌশল অবলম্বন করলো। বিপদ বুঝে সৈরিন্ধ্রী-বেশী দ্রৌপদী গোপনে ভীমের সঙ্গে দেখা ক'রে সমস্ত কথা জানিয়ে এলেন। হতভাগ্য কীচক ভীমের হাতে প্রাণ হারালো।

এদিকে পাণ্ডবরা কোথায় অজ্ঞাতবাস করছে তা জানবার জন্যে দুর্য্যোধন নানা দেশে চর নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু কেউ কোনো সন্ধান দিতে পারলেন না। দুর্য্যোধন দুশ্চিন্তায় পড়লেন। কারণ অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হলেই তাঁদের রাজ্য তাঁদের ফিরিয়ে দিতে হবে। এই সময় ঘটলো এক মজার ঘটনা।

দুর্য্যোধন সসৈন্যে বিরাট-রাজ্য আক্রমণ করলেন। তাঁদের গো-নিলেন, ধনও হরণ করলেন।

বিরাটের পুত্র উত্তর সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলেন, কিন্তু

কোথায় পাবেন উপযুক্ত সারথি। শেষে সকলের অনুরোধে বৃহন্নলা নিলেন সেই সারথ্যের ভার।

কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়ে উত্তর ভয়ে পিছিয়ে এলেন। নিরুপায় হয়ে বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকেই অস্ত্র ধরতে হ'লো। অর্জুনের শরাঘাতে কুরু-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেলো। তখন দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীগণ সে বিক্রম দেখে সন্দেহ করলেন এবং ক্রমে অর্জুনের প্রকৃত পরিচয় সকলেই জানতে পারলেন কিন্তু তখন পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কাল সম্পূর্ণ হ'য়েছে। পরিচয় পেয়ে বিরাট রাজা অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে কন্যা উত্তরার বিবাহ দিলেন।

পাণ্ডবদের হাতে রাজ্য প্রত্যর্পণের সময় হলে, দুর্য্যোধন সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির বললেন—সম্পূর্ণ রাজ্য আমরা চাই না—আমাদের অর্দ্ধ-রাজ্য তাঁরা দিন। এই শান্তির বাণী নিয়ে স্বয়ং কৃষ্ণ এলেন হস্তিনাপুরে। কিন্তু মূঢ় দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রপ্রমাণ জমিও তাঁদের ফিরিয়ে দেবেন না জানালেন।

ব্যর্থ হ'লো কৃষ্ণের দৌত্য। শুষ্কমুখে ফিরে গেলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যুদ্ধের সম্ভাবনায় ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির অপ্রসন্ন হলেন। যুদ্ধ তিনি চান না—চান ন্যায়তঃ অধিকার। তবু আশা ছিলো ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি হয়তো বা বাধা দেবেন। কিন্তু বাধা তাঁরা দিলেন না। শৌর্য্য এখানে পরাশ্রিত—তাঁরা কর্মের নিয়ামক মাত্র।

যুদ্ধ হ'লো ধর্মের সঙ্গে অধর্মের। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এ যুদ্ধ নয়—ধর্মের হাতে অধর্মের বিনাশ। এই তত্ত্ব নিয়েই অষ্টাদশ অধ্যায় গীতার উদ্ভব।

কিন্তু এ যুদ্ধের সম্ভাবনায় পাণ্ডব-জননী কুন্তীর চোখে নিদ্রা নাই। কর্ণ যে তাঁরই পুত্র। কি ক'রে এক পুত্রের জন্য অপর পুত্রের বিনাশ কামনা করবেন?

কৃষ্ণ কুন্তীর মনোভাব বুঝলেন। তিনি কর্ণকে কুন্তীর দুর্বলতার কথা জানালেন। কিন্তু কর্ণ কিছুতেই দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করতে চাইলেন না। বরং বললেন—শৈশবে যখন জননীই আমাকে ত্যাগ করতে পেরেছেন—জানি, তখনই আমার জীবন-ইতিহাস লেখা হয়ে

গিয়েছে। আজ আমাকে তুমি ফিরিয়ে নিতে এসেছো কৃষ্ণ—প্রলোভন আমারও কম নয়, কিন্তু অর্জুনকে ঈর্ষা করেছি—আজ তাকে ভাই বলে আলিঙ্গন করতে পারবো না। আজ যে-পরিচয় তুমি নিয়ে এলে কৃষ্ণ—এ আমার পরিচয় নয়, মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করলাম আমি। তাই হোক, পাণ্ডবই হোক জয়ী। হতভাগিনী জননীকে বলো কৃষ্ণ, যাঁকে তিনি মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন সে মুছেই যাবে।

মুছেই গেলেন একে একে মহা মহা রথীগণ কুরুক্ষেত্র-মহা-প্রাঙ্গণে। অবশেষে ভীষ্ম নিলেন যুদ্ধের সকল ভার। কিন্তু দুর্যোধনের সংশয় যায় না—হয়তো স্নেহবশে তিনি পাণ্ডবদের গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে পারবেন না। ভীষ্ম দুর্যোধনের মনোভাব বুঝলেন, বললেন, যুদ্ধ আমি করবো বৎস, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি এমন যুদ্ধই করবো যা কেউ কোনোদিন চোখে দেখেনি। তবে যুদ্ধ আমি করবো না, নারী এবং নপুংসকের সঙ্গে। সে সম্ভাবনা যদি আসে—আমি সেই মুহূর্তেই অস্ত্র পরিত্যাগ করবো।

সত্যই ভীষ্ম এমন যুদ্ধ করলেন—যা ত্রিভুবনে কেউ কোনোদিন দেখেনি। ভীষ্মের শরাঘাতে পাণ্ডবরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণকে নিয়ে পরামর্শ-সভা বসলো। শেষে কৃষ্ণের পরামর্শে শিখণ্ডী এলেন কুরুক্ষেত্র মহা-প্রাঙ্গণে। ভীষ্ম-অপহৃতা অম্বার তপস্যাবলে দেবতারা তাঁকে বর দিয়েছিলেন, তুমি নপুংসক শিখণ্ডীরূপে জন্মগ্রহণ করে ভীষ্মকে বধ করবে। ভীষ্ম-বধের আয়োজন দেবতারাই এই ভাবে নির্দিষ্ট করেছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে নপুংসক শিখণ্ডীকে দেখে ভীষ্ম অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন। ভীষ্ম শর-শয্যায় শায়িত হলেন। তখন ইচ্ছামৃত্যু-ভীষ্ম মৃত্যুকে আহ্বান করলেন।

শর-শয্যায় শায়িত ভীষ্ম। ছুটে এলেন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা, ছুটে এলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভীষ্ম হাসলেন। বললেন—এসেছো জনার্দন! তবে দাঁড়াও আমার সম্মুখে, একবার নয়ন-ভরে দেখি। ক্ষুব্ধ কেন কৃষ্ণ? জগতে এতবড় মৃত্যু কি কেউ কোন দিন দেখেছে? অর্জুন হয়তো ভাবছে, এই পরিণাম জেনেও আমি

কেন নীরব ছিলাম। তুমি তো জানো কৃষ্ণ, আমি দুর্য্যোধনকে এ-যুদ্ধ থেকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারিনি। তোমার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। দুর্মতি যে সে এমনি করেই হিতবাক্য উপেক্ষা করে। আমি সত্যপালন করেছি। কুরুকুলে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছি। এই সত্যপালনের জন্যেই অসহায়ের মতো দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাও সহ্য করেছি। লোকে যাই বলুক, তুমি তো জানো কৃষ্ণ, পরাধীন ব্যক্তির বিচার করার কোনো অধিকার নেই। ধর্মের মুখ চেয়ে আমি শুধু কালের প্রতীক্ষা করেছি।

তারপর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বৃথা শোক পরিহার করে ধর্মানুযায়ী রাজ্য-শাসনের উপদেশ দিলেন। সেটা অনুশাসন পর্ব্ব।

এই অনুশাসন পর্বই মহাভারতের বিশিষ্ট পর্ব। রাজনীতি, ধর্ম-নীতি, সমাজনীতির গূঢ়তত্ত্ব এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এমন কোনো বিষয়বস্তু জগতে নেই যা মহাভারতে বলা হয় নি। তাই মহা-ভারত কাব্যগ্রন্থ হয়েও, জ্ঞানানুশীলনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। জগতে এতবড় বিরাট গ্রন্থ আর লিখিত হয় নি।

ভীষ্মের মৃত্যুর পর কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি যুদ্ধে নামলেন। এই যুদ্ধে অর্জুন-পুত্র অভিমন্যু নিহত হলেন। পুত্র-শোকাতুর অর্জুন জয়দ্রথকে নিহত করে তার প্রতিশোধ নিলেন। এর পর ঘটোৎকচ রণক্ষেত্রে এসে মহাপ্রলয় সুরু করলো। কর্ণ বিব্রত হয়ে তাঁর অমোঘ অস্ত্র বৈজয়ন্তী বাণ—যা অর্জুন বধের জন্য তিনি অতি সংগোপনে রেখেছিলেন, তাই নিক্ষেপ করতে বাধ্য হলেন। ঘটোৎকচ নিজের জীবন দিয়ে অর্জুনকে রক্ষা করে গেলেন। নইলে অর্জুনকে রক্ষা করা দেবেরও অসাধ্য ছিলো। কৃষ্ণ নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন—এইবারে তুমি কর্ণ-বধের আয়োজন করতে পারো।

কিন্তু কর্ণকে বধ করা সোজা কথা নয়। তাঁর সহজাত কবচ-কুণ্ডল তাঁকে বর্মের মতো রক্ষা করছে। তা'ছাড়া কর্ণের মতো বীর খুব কমই আছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—কর্ণকে তুমি অবজ্ঞা ক'রো না।

এই কর্ণকে বধ করবার জন্যে দেবতারাও কম ছলনা করেন নি।

ব্রাহ্মণবেশে ইন্দ্র তাঁর কবচ-কুণ্ডল হরণ করলেন। যুদ্ধকালে তাঁর রথ-চক্র মেদিনী গ্রাস করলো। তবু কর্ণের শরাঘাতের কাছে অর্জুন দাঁড়াতে পারলেন না। কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—অর্জুনকে তিনি প্রাণে মারবেন না। গোপন ভ্রাতৃ-স্নেহই তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'লো।

কর্ণের মৃত্যুর পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, কর্ণ-বধের জন্যে তুমি গর্ব করো না। কর্ণকে মেরেছি আমরা সকলে মিলে, নইলে তোমার একার সাধ্য ছিলো না কর্ণকে পরাস্ত করো।

কর্ণ-বধের পরই কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে পরিণত হলো। দুর্যোধন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে দ্বৈপায়ন-হ্রদে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু ভীমের আক্রোশ এই দুর্যোধনেরই ওপর। তিনি তাঁকে জল থেকে টেনে তুলে যুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং কুরুবংশের শেষ বীর দুর্যোধন ভগ্ন-মনে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু ভীমের গদার প্রচণ্ড আঘাতে তিনি উরুভঙ্গ হয়ে সেই মহাশ্মশানে পড়ে গেলেন।

কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে ভীমের ব্রত উদ্‌যাপিত হ'লো।

যুধিষ্ঠির বললেন, এবারে তুমি বিরত হও। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে—আর কেন? রাজা দুর্যোধন এখন হতপ্রায়—এঁর আপন জন বলতে আর কেউ অবশিষ্ট নেই, এঁর জন্যে শোক করাই উচিত। যুদ্ধের প্রয়োজন আমাদের শেষ হয়েছে—দুর্যোধন এখন আমাদের ভাই।

সাশ্রুপূর্ণ নয়নে এগিয়ে গেলেন যুধিষ্ঠির। বললেন—আমাদের ক্ষমা করো ভাই। যুদ্ধ আমরা চাইনি—চেয়েছিলে তুমি। আজ তোমার একার অপরাধে কুরুবংশ শেষ হয়ে গেলো। দুঃখ এই, আমরা বেঁচে থেকে সেই যন্ত্রণা ভোগ করবো।

কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠির এই বলেই বিলাপ করতে লাগলেন—দুঃখ এই, এ মহাশ্মশানের রচয়িতা আমি নিজে।

সেই মহাশ্মশানে এসে দাঁড়ালেন, শতপুত্রের জননী গান্ধারী। অন্ধ-স্বামীকে অতিক্রম করবেন না বলে যিনি চক্ষু আবৃত করে রেখেছিলেন। আজ এই মহাশ্মশানে এসে এই প্রথম চক্ষের আবরণ সরিয়ে ভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করলেন। বললেন—কৃষ্ণ, এই লীলাই কি তুমি জগতকে দেখাতে চেয়েছিলে? নইলে, তুমি তো

পারতে কৃষ্ণ এর প্রতিরোধ করতে। তবে কেন তুমি এই মহা-পাতক হতে দিলে? কেন এমন করে আমার বুকে শেল হানলে? তুমি ভগবানই হও, আর যেই হও—আমি যদি অন্ধ স্বামীর শুশ্রূষা করে কিছুমাত্র পুণ্য অর্জন করে থাকি, তবে তোমাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। তুমিও পাবে এমনি শোক—যেমন করে কুরু-পাণ্ডব তুমি বিনাশ করেছো তেমনি করে তুমি তোমার জ্ঞাতিদেরও বিনষ্ট করবে। তোমাকেও মরতে হবে অপঘাতে।

এই তপঃসিদ্ধা মহিয়সী নারীর অভিসম্পাত বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিলো। আপন পাপে যদুবংশ ধ্বংস হয়ে গেলো, শ্রীকৃষ্ণকেও ব্যাধের শরাঘাতে প্রাণ হারাতে হলো।

গান্ধারী-ধৃতরাষ্ট্র অধ্যায় এইখানেই শেষ হয়েছে। তাঁরা শান্তির আশায় বনে গেলেন। কুন্তী তাঁদের সঙ্গ ছাড়লেন না, তিনিও তাঁদের অনুগমন করলেন।

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন-প্রণালী চিরস্মরণীয়। কর্ম করতে এসেছিলেন—কার্যকাল শেষ করে, তিনি মহাপ্রস্থানের অভিলাষ জ্ঞাপন করলেন। জ্যেষ্ঠের আদেশে ভ্রাতারাও প্রস্তুত হলেন।

অতঃপর অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে এবং যুযুৎসুর ওপর রাজ্যপালনের ভার দিয়ে, যুধিষ্ঠির সুভদ্রাকে বললেন—তোমার পুত্র কুরুরাজরূপে হস্তিনাপুরে থাকবেন। যাদবগণের একমাত্র বংশধর কৃষ্ণ-পৌত্র বজ্রকে আমি ইন্দ্রপ্রস্থে অভিষিক্ত করেছি, তিনি অবশিষ্ট যাদবগণকে পালন করবেন। তুমি এঁদের রক্ষা করো, যেন অধর্ম না হয়। এইরূপে যুধিষ্ঠির সর্বব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে প্রজাদেরও ডেকে তাঁর অভিপ্রায় জানালেন। প্রজারা 'হায় হায়' ক'রে উঠলো—তারা তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু যুধিষ্ঠির সংকল্পে অটল। তিনি পদব্রজে স্বর্গে যাবেন। এই সশরীরে স্বর্গ-লাভ মর্ত্ত-মানবের পক্ষে অভূতপূর্ব।

যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতৃগণ এবং দ্রৌপদী সমস্ত আভরণ ত্যাগ ক'রে বল্কল পরিধান করলেন এবং যজ্ঞ ক'রে সেই সব অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন। পুরবাসী ও নরনারীগণ উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন।

অতঃপর পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী উপবাস ক'রে পূর্বদিকে চললেন—একটি কুকুর তাঁদের অনুগামী হলো। তাঁরা বহুদেশ অতিক্রম করলেন। শেষে হিমালয় পার হয়ে বালুকার্ণব ও মেরু পর্বত দর্শন করে যোগযুক্ত হয়ে স্বর্গাভিমুখে চলতে লাগলেন। হঠাৎ দ্রৌপদী যোগভ্রষ্ট হয়ে পড়ে গেলেন। ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন,—পাঞ্চালী তো কোনো অধর্মাচরণ করেন নি, তবে কেন ভূপতিত হলেন? যুধিষ্ঠির বললেন,—ধনঞ্জয়ের ওপর তাঁর বিশেষ পক্ষপাত ছিল, তাই তাঁর এই পতন। সহদেব যখন পড়লেন, তখনও যুধিষ্ঠির তার কারণ ব্যক্ত করলেন—সহদেব মনে করতেন তাঁর চেয়ে বিজ্ঞ কেউ নেই। নকুলের পতনে বললেন—উনি মনে করতেন ওঁর চেয়ে রূপবান আর নেই।

দ্রৌপদী, নকুল ও সহদেবের পরিণাম দেখে অর্জুন শোকার্ত হলেন। কিছুদূর গিয়ে তিনিও প'ড়ে গেলেন। ভীম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—অর্জুন কোনোদিন পরিহাস করেও মিথ্যা বলেন নি, তবে কেন তাঁর পতন? যুধিষ্ঠির বললেন,—অর্জুনের গর্ব ছিলো তাঁর তুল্য বীর কেউ নেই। ভীম পড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, - আমার পতন কেন হলো দাদা! উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি ছিলে ভোজন-বিলাসী এবং অপরের বল না জেনে নিজের বলের গর্ব করতে।

একমাত্র কুকুর রইলো যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে। ভূমি ও আকাশ নিনাদিত করে ইন্দ্র রথারোহণে এসে অবতীর্ণ হলেন। বললেন—ধর্মরাজ তুমি, এই নাও রথ—স্বর্গে যাও।

যুধিষ্ঠির বললেন—আমি দ্রৌপদী এবং ভাইদের ফেলে স্বর্গে যেতে চাই না। ইন্দ্র বললেন—তাদের জন্য শোক করো না—তারা স্বর্গেই গেছে। তুমি গিয়ে তাদের দেখতে পাবে।

যুধিষ্ঠির বললেন—কিন্তু আমার এই কুকুর?

ইন্দ্র যখন কুকুরকে ত্যাগ করার কথা বললেন, যুধিষ্ঠির সে-আদেশ প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন—এ আমার ভক্ত। একে ত্যাগ ক'রে আমি দিব্য ঐশ্বর্যও চাই না।

ইন্দ্র বললেন—কুকুর নিয়ে তুমি স্বর্গে যেতে পারবে না।

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন,—ভক্তকে ত্যাগ করলে ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ হয়। নিজের সুখের জন্যে আমি এই কুকুরকে ত্যাগ করতে পারি না। প্রাণ বিসর্জন দিয়েও আমি ভীত অসহায় আর্ত দুর্বল ভক্তকে রক্ষা করি, এই আমার ব্রত।

ইন্দ্র বললেন,—কুকুরের দৃষ্টি পড়লে যজ্ঞ দান হোম প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভ্রাতৃগণ ও পত্নীকে ত্যাগ করে তুমি নিজ কর্মের প্রভাবে স্বর্গ-লোক লাভ করেছ, এখন কি মোহে এই কুকুরকে ছাড়তে চাও না?

যুধিষ্ঠির বললেন,—মৃতজনকে জীবিত করা যায় না, তাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধও থাকে না। আমার ভ্রাতৃগণ ও পত্নীকে জীবিত করবার শক্তি আমার নেই—সে জন্যেই ত্যাগ করেছি, তাঁদের জীবদ্দশায় ত্যাগ করিনি। আমি মনে করি, শরণাগতকে ভয় দেখানো, স্ত্রীবধ, ব্রহ্মস্ব-হরণ ও মিত্র-বধ—এই চার কার্য্যে যে পাপ হয়, ভক্তকে ত্যাগ করলেও সেইরূপ হয়।

তখন কুকুররূপী ভগবান-ধর্ম নিজমূর্তি গ্রহণ করে বললেন,—মহারাজ, তোমাকে আমি সকল দিক দিয়ে পরীক্ষা করলাম—তুমি ভারতশ্রেষ্ঠ, তুমি সশরীরে স্বর্গলাভ করবে।

কিন্তু যুধিষ্ঠির বললেন—আমি স্বর্গ চাই না। আমার ভ্রাতারা, আমার পত্নী যেখানে আছেন আমি সেইখানেই থাকতে চাই।

পরীক্ষা সম্পূর্ণ হলো। তিনি পত্নী ও ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

মহাভারতের মূল কাহিনী এই।

ভারতের প্রাচীন রাজবংশের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের কথা নিয়ে রামায়ণ মহাভারতে আরও অন্যান্য বহু রাজবংশের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেই সব বংশ-কাহিনী নিয়ে নানা পুরাণও রচিত। পরবর্তী পুরাণ-প্রসঙ্গে সে সব কথা আমরা আলোচনা করব।

●

কথা ও কাহিনী

প্রাচীন রামায়ণ মহাভারত কি শুধু কাহিনী? অথবা সে কি কাব্য? কাহিনীও নয়, কাব্যও নয়—ইতিহাস পুরাণ ব'লে থেমে গেলেও চলবে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"রামায়ণ মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র···শুদ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে।"

কাব্যের রসে রামায়ণ মহাভারত মহাকাব্যের গৌরব লাভ করেছে বটে, কিন্তু হাজার হাজার বছর আগেকার এই ইতিকথা মহা-ইতিহাসের সাক্ষ্যস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। এই দুই কাব্য-গ্রন্থ কাব্যের ছন্দে গাঁথা হলেও—সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ থেকে সুরু ক'রে শত শত বংশের পরিচয় আমরা জানতে পারি। আবার দেখি, বশিষ্ঠের ধর্ম-বিচার, ভীষ্মের রাজনৈতিক উপদেশ, যুধিষ্ঠিরের ন্যায়-ধর্ম, শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণা, কর্ণের শৌর্য্য, লক্ষ্মণের ত্যাগ, রামের প্রজানুরঞ্জন। আবার এই কাব্যের মধ্যেই রয়েছে কৃষ্ণার পঞ্চ-পতি বরণ, অন্য পুরুষ সংসর্গে নারীর সন্তানোৎপত্তি, আর্য্য-অনার্য্য বিবাহ প্রভৃতি। যুদ্ধের দামামা মধ্যে যাঁর হাতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজলো—তিনি হলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হলেন আবার অর্জুনের সারথী—। পূর্ণাবতার রামচন্দ্রকেও দেখতে পাই, মানুষের মতোই দুর্বল হয়ে পড়েছেন শম্বুক-বধে, সীতার পাতাল প্রবেশে, লক্ষ্মণ বর্জনে। প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে মহাভারত অতি প্রাচীন সমাজ ও নীতিবিষয়ক তথ্যের অনন্ত ভাণ্ডার। ভূগোল জীবতত্ত্ব পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা কি ছিল তাও এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ইহা কোনও ব্যক্তি বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।"

মহাভারত পড়লে আমাদের প্রাচীন সমাজ ও জীবনযাত্রার একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারি। সেযুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সকলেই প্রচুর

মাংসাহার করতেন, ভদ্রসমাজেও সুরাপান দোষের ছিলনা। এমন কি গোমাংস ভোজন এবং গো-মেধ যজ্ঞের উল্লেখ অনেক স্থানেই দেখতে পাওয়া যায়। তখন অস্পৃশ্যতা কম ছিল, দাস-দাসীরাও অন্ন পরিবেশন করতো। সেকালে রাজাদের অনেক পত্নী এবং দাসী বা উপপত্নী থাকতো। বর্ণ-সংকরত্বের ভয় ছিল, কিন্তু অনুশাসনপর্বে ভীষ্ম বহু প্রকার বর্ণসংকরের উল্লেখ ক'রে বলেছেন, তাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নেই। অনেক বিধবা সহমৃতা হতেন—অবশ্য বাধ্যবাধকতা ছিলো না। নারীর মর্য্যাদার অভাব ছিলো না কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁদেরও দানবিক্রয় এবং জুয়াখেলায় পণ রাখা হ'ত। ভূমি ধনরত্ন বস্ত্র যানবাহন প্রভৃতির সঙ্গে রূপবতী দাসীও দান করার প্রথা ছিল। উৎসবে শোভাবৃদ্ধির জন্য বেশ্যার দল নিযুক্ত করা হ'ত। দেবপ্রতিমার পূজা প্রচলিত ছিল। রাজাকে দেবতুল্য জ্ঞান করা হ'ত, কিন্তু অনুশাসন পর্বে ভীষ্ম বলেছেন, যিনি প্রজারক্ষার আশ্বাস দিয়ে রক্ষা করেন না সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো বিনষ্ট করা উচিত। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান অতি বীভৎস ছিল। পুরাকালে নরবলি দেওয়া হ'তো, মহাভারতের কালে তা নিন্দিত হলেও একেবারে লোপ পায় নি, জরাসন্ধ তার আয়োজন করেছিলেন।

যুদ্ধের বর্ণনা অতিরঞ্জিত হলেও আমরা সেকালের যুদ্ধরীতির পরিচয় খানিকটা পাই। ভীষ্মপর্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের যে নিয়ম বন্ধন বিবৃত হয়েছে তা আধুনিক সার্বজাতিক নিয়ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। নিরস্ত্র বা বাহনচ্যুত যোদ্ধাকে হত্যা করা দোষের। নিয়ম-লঙ্ঘন করলে যোদ্ধা নিন্দাভাজন হতেন। স্বপক্ষ বা বিপক্ষ যে কেউ আহত হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। সূর্য্যাস্তের পর যদিও আর যুদ্ধ করা হ'তো না, তবে সময় সময় রাত্রিকালেও যুদ্ধ চলতো। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে যুদ্ধ হ'তো, কিন্তু অশ্বত্থামা তার ব্যতিক্রম করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের কাছে বেশ্যা-শিবির থাকতো। বিখ্যাত যোদ্ধাদের রথে চার-ঘোড়া জোতা হ'তো। ধ্বজদণ্ড রথের ভিতর থেকে উঠত. রথী আহত হলে ধ্বজদণ্ড ধরে নিজেকে সামলাতেন। অর্জুন ও কর্ণের রথ শব্দহীন ব'লে বর্ণিত হয়েছে। দ্বৈরথ যুদ্ধের

পূর্বে বাকযুদ্ধ হ'ত, বিপক্ষের তেজ কমাবার জন্যে দুই বীর পরস্পরকে গালি দিতেন এবং নিজের গর্ব করতেন। বিখ্যাত রথীদের চারদিকে রথী যোদ্ধারা থাকতেন, পিছনে একাধিক শকটে রাশি রাশি শর ও অন্যান্য ক্ষেপণীয় অস্ত্র থাকত। বোধহয় পদাতি সৈন্য ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ করত না, তাদের বর্মও থাকত না—এই জন্যে রথারোহী বর্মধারী যোদ্ধা একাই বহু সৈন্য শরাঘাতে বধ করতে পারতেন। সেকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষও কম হয়নি। রামায়ণ মহাভারতেও এর দৃষ্টান্ত কম নেই। বিবিধ আগ্নেয়াস্ত্রের পরিচয়, কৈকেয়ী ও দময়ন্তীর বিমান-চালনার কথাও এই দুই মহাগ্রন্থে রয়েছে।

দুঃখময় সংসারে মিলনান্ত আখ্যানই মানুষ পছন্দ করে এ ধারণা ভুল। তা যদি হ'তো তবে রামায়ণ মহাভারত এত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারতো না। এই দুই গ্রন্থের স্পষ্ট উদ্দেশ্য, বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে লোকের মনোরঞ্জন এবং কথাচ্ছলে ধর্মশিক্ষা। অবশ্য অন্য উদ্দেশ্যও এর মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। মানুষ অমর নয়—সেইজন্যে বাস্তব বা কাল্পনিক সকল জীবনবৃত্তান্তই বিয়োগান্ত। রামায়ণ রাম-রাবণ প্রভৃতির এবং মহাভারত ভরতবংশীয়গণের জীবনবৃত্তান্ত। এই দুই গ্রন্থের রচয়িতারা তাঁদেরই জীবন-কথা নিয়ে, তাঁদেরই সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহ প্রভৃতি জীবন-দ্বন্দ্বের চিত্র এঁকেছেন।

রামায়ণ রচনা করেছেন বাল্মীকি। এই বাল্মীকি ছিলেন দস্যু রত্নাকর। বিবেকের আঘাতে তিনি কঠিন সাধনায় মগ্ন হ'ন। এই সাধনকালেই তিনি ক্রৌঞ্চ-মিথুনের সাক্ষাৎ পান। মিথুনাসক্ত ক্রৌঞ্চ ব্যাধের শরাঘাতে ভূপতিত হ'লে ভার্য্যার করুণ বিলাপে ঋষি চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর কণ্ঠ হ'তে স্বতোৎসারিত বাণী নির্গত হ'লো :—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

উচ্চারণ ক'রেই তিনি বিস্মিত হলেন—এ কি কথা তাঁর মুখ দিয়ে নির্গত হ'লো!

ব্রহ্মা এসে জানালেন, এই ছন্দোবদ্ধ শোক-বাক্য শ্লোক নামেই

ব্যাপ্ত হবে। এখন তুমি সমগ্র রামচরিত রচনা কর। যা অবিদিত আছে সে সমস্তও তোমার বিদিত হবে, তোমার কাব্যে কোনও বাক্য মিথ্যা হবে না।

বাল্মীকির রাম-চরিত রচনার এই হ'লো পূর্ব ইতিহাস।- এই জন্যেই তাঁকে আদি কবি বলা হয়। এই রামায়ণে তিনি চব্বিশ হাজার শ্লোক, পাঁচশ সর্গ এবং সাতটি কাণ্ড রচনা করেছিলেন।

মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস। এই দ্বৈপায়ন মহাভারতোক্ত সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসজাত সন্তান। যমুনার দ্বীপে জাত বলে তাঁর নাম দ্বৈপায়ন। ইনি মাতার আদেশ নিয়ে তপস্যায় রত হয়েছিলেন। বেদ বিভক্ত ক'রে তিনি পরে ব্যাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ব্যাসদেব মহাভারতের রচয়িতা হলেও তার লিপিকার ছিলেন গণেশ। ব্যাস গণেশকে অনুরোধ করলে তিনি বললেন, আমি সম্মত আছি কিন্তু আমার লেখনী ক্ষণমাত্র থামবে না। ব্যাসদেব তাতেই রাজী হয়ে বললেন, কিন্তু আমি যা ব'লে যাব, তার অর্থ না বুঝেও লিখতে পারবেন না।

চতুর ব্যাস এক একটি কূটশ্লোক ব'লে চিন্তা করবার অবসর নেন। ব্যাসদেবের মহাভারতে এই রকম কূটশ্লোকের সংখ্যা হ'লো ৮৮০০।

ভগবান ব্যাস এই গ্রন্থে কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সত্যপরায়ণতা এবং ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের দুর্বৃত্ততা বিবৃত করেছেন। এই মহাভারতে লক্ষ শ্লোক এবং অষ্টাদশ পর্ব আছে।

এই মহাভারত কবে রচিত হয়েছে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোনো কোনো প্রাচীন পণ্ডিত বলেন, খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। বাল গঙ্গাধর তিলকের মতে এই যুদ্ধ হয় খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে। মহাভারত ব্যাসের রচিত হলেও, বিভিন্ন-কালে বিভিন্ন অংশ এতে সংযোজিত হয়েছে।

আর্য্যভারতে বেদের পর এরূপ প্রামাণ্য গ্রন্থ আর রচিত হয়নি। শাস্ত্রকারগণ তাই একে পঞ্চমবেদ ব'লে অভিহিত করেছেন।

দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্য-'পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান......
চারিমুখে বাহিরিল বাণী,
চারিদিকে করিল প্রয়াণ।
......জগতের গঙ্গোত্রীশিখর হতে শতশত স্রোতে
...... শতভাগে গেল বিদারিয়া।
নূতন সে প্রাণের উল্লাসে, নূতন সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে
বিশ্ব যবে হয়েছে উন্মাদ
অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চারি হাত দিয়া
বিষ্ণু আসি কৈলা আশীর্ব্বাদ।
লইয়া মঙ্গল শঙ্খ করে কাঁপায়ে জগৎ চরাচরে
বিষ্ণু আসি কৈলা শঙ্খনাদ।
জগতের মহা বেদব্যাস গঠিলা নিখিল উপন্যাস,
বিশৃঙ্খল বিশ্বগীতি লয়ে
মহাকাব্য করিলা রচন।

(রবীন্দ্রনাথ)

মহান ভারতে এবার সুরু হবে বেদ-সংহিতা ও উপনিষদের কথা—যা একদা প্রকৃতির রুদ্ররূপে ভেসে আসা দেবতার সন্তান, অমৃতের পুত্ররা মৃত্যুশীল মাটির কোলে দাঁড়িয়ে গেয়েছিল নিজেদের শান্তি ও জগতের কল্যাণ কল্পে। মাটির কোলে এসে ভারত-প্রবেশের পর আর্য্য ও অনার্য্যদের ক্রমবিকাশ, আর্য্য-সন্ততির বংশ বিস্তার, উপনিবেশ স্থাপন, সেচ ও কৃষি, যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান, নগর-পত্তন, রাজ্য-শাসন, বহির্ভারতে বসবাস—সব কথাই সংক্ষেপে বলা হয়েছে—বলা হয়েছে রামায়ণ, মহাভারতের কাব্য কথা। অবশ্য অন্য পুরাণ এবং সমাজ ও সংস্কৃতির বহু বিষয় আছে হিন্দুর ধর্ম্মকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের সঙ্গে পরবর্ত্তী দ্বিতীয় খণ্ডে, তবে এখন বলা হবে ভারতের সমস্ত গৌরবের মূলবস্তু বেদ সংহিতা ও উপনিষদ কথা—তারই সংক্ষিপ্ত আংশিক অনুবাদ দিয়ে বোঝান হবে বেদ ও উপনিষদের তথ্য ও তত্ত্ব আর তার সঙ্গে অতীত কৃষ্টি ও ইতিবৃত্তের একটি মোটামুটি ইঙ্গিত।

যেদিন স্বর্গের দেবতা ভারতে এসে মানুষের মাটিতে পা দিল, এগিয়ে চল্ল বন জঙ্গল কেটে নতুন বসান নগরে, বসাল যজ্ঞকুণ্ড—সেদিন তাঁরা ফেলে আসা সেই স্বর্গ, ফেলে আসা নিজেদের সেই পিতৃপুরুষ দেবতাদের স্মরণ করলো, মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করলো পথে পথে। যজ্ঞকুণ্ডের পাশে বসে—কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সেই যে গান—তাতেই ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো সে যুগের পরম-শক্তিমান দেবতার কথা, সে যুগের সমাজের কথা, সে যুগের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা—সে যুগের রাজা ও প্রজার কথা, সুখ ও শান্তির কথা, ভক্তি ও ভক্তের কথা। তাকেই বলি আমরা বেদ।

বেদ কি ?

"বেদ" শব্দটি বিদ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে প্রধানতঃ চারটি—"জানা" "বিচার করা" "লাভ করা" আর "অবস্থান করা"। এখন শুধু "জানা" কথাটি ধরেই অনেকে "বেদ" অর্থে বলেন —যাতে সব জানা যায় তাই বেদ। কিন্তু শুধু 'জানা' মানেটাই বা ধরবো কেন ? তা ছাড়া "জানা"অর্থ বোঝাবার জন্যে তো অনেক শব্দই আছে। "জ্ঞান" ধাতুও তো "জানা" অর্থে ব্যবহার হতে পারতো। তবে ঋষিরা কেন চারটি অর্থ-বিশিষ্ট ধাতু নির্ব্বাচন করে একটা সন্দেহের সৃষ্টি করলেন। একটু ভাবলে উত্তরটা বেশ সহজ হয়ে পড়ে। জ্ঞান-গর্ভ কোন গ্রন্থে যদি কিছু জানা যায়, আবার জেনে সেই বিষয় বা উদ্দেশ্যের বিচার করা যায়, বিচার করে কল্যাণময় হলে তাকে লাভ করা যায়, বিশ্বাস কোরে তাতে স্থির থাকা যায় তাই "বেদ"। এক বিদ্' ধাতু থেকে নামটির সৃষ্টি করে ঋষিরা বুঝিয়ে দিলেন—'যে পরব্রহ্মের অবস্থান নিত্য ও শাশ্বত, এবং যে গ্রন্থের সাহায্যে তাঁকে জানা যায়, তাঁর স্বরূপ বিচার করা যায়, তাঁকে লাভ করা যায় তাই বেদ।

এ গ্রন্থে আমরা সে জ্ঞানের পথ দেখাতে পারবো না বটে তবে সমাজ ও ধর্ম্মের কথা বলতে হলেও বেদের কথা বলে নিতেই হবে। কারণ যে সব রাজর্ষিরা ও ব্রহ্মর্ষিরা রাজ্য গঠন ও উপনিবেশ স্থাপনের পর—নগর ও সমাজ গ'ড়ে তাঁদের রীতি-নীতি, আচার-

ব্যবহার, ধর্ম্ম আর সংস্কারের নানা বাঁধা-ধরা নিয়ম গড়লেন—শিল্প, ভাস্কর্য্য, তীর্থ-মন্দির, রাজ্য ও রাজধানীতে ভারতকে গৌরব-মণ্ডিত করলেন তাঁরা কিন্তু সব কিছুর আগে পেয়েছিলেন এই বেদ। বাল্মীকির রামায়ণ, কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মহাভারত, হারীতের সমাজ-নিয়ম, যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞান-কথা, জনকের উপদেশ, কপিল কণাদের দর্শন সবই তো গড়ে উঠলো এই বেদের পর।

বেদের মধ্যেই আছে মানুষের সত্যকার ইতিহাস। তবুও তো সাগর-পারের অনেক পণ্ডিত বলেছেন "বেদ চাষার গান।" তাতো বটেই, তবে চাষার মতন চাষা তাঁরা—শুধু মাটীই চাষ করতেন না, মানুষের মনও তাঁরা করতেন চাষ। কর্ষণ করে চিত্ততলে নব অঙ্কুরের সূচনা করতেন। জগতের মঙ্গলের জন্যে, দেশ ও দশের কল্যাণ কামনা আর নিজের মুক্তি-পথের পাথেয় মনে করে সেই প্রাচীন ঋষির দল গাইতেন নানা গান, করতেন স্তব, করতেন যজ্ঞ, ভজন-সাধন। সেইসব কথা বা মন্ত্রই ঋক্, কতগুলি ঋকের সমষ্টি হ'ল সূক্ত। সে সব মন্ত্রের মধ্যে ছিল সৃষ্টির বিবরণ, তাঁদের বংশধারার ইতিহাস, পালনকর্ত্তা যে দেবগণ, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা—অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ সকলের প্রতি প্রাণ-শক্তি দানের জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। তাঁদের কাছে প্রার্থনা—"হে দেবতা, আমাদের রক্ষা কর, মুক্তির পথ দেখাও, পরমাত্মাকে চিনতে দাও, দেহে স্বাস্থ্য দাও, চিত্তে দাও আনন্দ।

আত্মোপলব্ধির প্রত্যয় নিয়ে তাঁরা সারকথা গাইতেন গায়ত্রী মন্ত্রে—

"ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োন প্রচোদয়াৎ"।

বলেছেন—অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা-মৃতংগময়।

একথা তাঁরাই বলতে পারতেন, যাঁরা তপস্যা দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে তত্ত্ব ও মন্ত্র দর্শন করতেন। তাঁদের তাই বলা হতো ঋষি। এই ঋষিরাই সে সব গান রচনা করতেন, বা লিখতেন—তাই বেদ-বাণী, বেদমন্ত্র।

মন্ত্র হলেও তা' কথা, গান বা কবিতা—এযুগের চারণ-কবির কাব্যের মতন। তা থেকে সে দেশের মানব-সমাজের সব কিছু জানতে পারি, জানতে পারি তাদের উত্থান-পতন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিচার ও সাধনার কথা।

নিতান্তই জটিল এই বিশ্বের আদি গ্রন্থের রহস্য কথা। তাই বুঝতে হ'লে জিনিষটাকে আরও সহজ ক'রাই দরকার। হয় তা' হবে একেবারে 'কথামালা' বা 'বোধোদয়' বোঝবার মতন।

ধরা যাক্ আজ থেকে ৪০০০ বছর পরে অর্থাৎ ৫৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ একখানা পুঁথির পাতা পাওয়া গেল। পাতার পর পাতা জুড়ে তাতে আছে নানা শ্লোক—গদ্য কবিতা ইতিবৃত্ত। লেখা আছে তাতে—

গান্ধী ঋষিঃ সত্যং দেবতা রাজনৈতিকং ছন্দঃ—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে কশ্যপস্য পুত্রাঃ মনুবংশজাশ্চ, গৃহ্নন্তু ভবন্তু উপদেশান্ গণনায়কেভ্যঃ যথা শান্তির্মুক্তিশ্চাপি অসুরক্লিষ্টায়ৈ জনতায়ৈ কল্পেতে। উদ্বুদ্ধাঃ ভবন্তু ভবন্তঃ সত্যেন অহিংসয়া চ। ন হন্যুঃ শত্রূন্ অস্ত্রেণ কেবলমসহযোগেন তান্ সমুৎসন্নান কুরুত। শান্তিময্যা বাণ্যা তে আকর্ষণীয়াঃ বঃ স্বাধীনতালিপ্সাবহ্নিঃ তেষামুৎপীড়নার্থং সকলানি দংদহ্যন্তাম্।

এ অংশটার মানে করলে দাঁড়াবে—

"গান্ধী ঋষি—সত্য দেবতা—রাজনৈতিক ছন্দ—

"হে কশ্যপসন্তান, মনু-বংশজগণ—অসুরদের অত্যাচারক্লিষ্ট জনদেবতাকে শান্তি ও মুক্তি দিতে গণনায়কের উপদেশ মন্ত্রে দীক্ষা লও। সত্য ও অহিংসার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হও। অস্ত্রে শত্রুকে আঘাত করিও না—অসহযোগে তাহাদিগকে উৎসন্ন কর। শান্তির মন্ত্রে তাহাদিগকে আকৃষ্ট কর। তোমাদের স্বাধীনতা কামনার ইন্ধন যেন তাহাদিগের অসূয়া, অত্যাচার ও অন্যায়কে বিনষ্ট করে।"

আর একখানা পাতায় যদি লেখা থাকে—

"সুভাষ-ঋষিস্তেজো দেবতা বীর্যং ছন্দঃ—

হে মনুজাঃ, শপেঽহং সত্যেন

কৃত্বা পরাভূতান্ সর্বানশ্বেতকায়ান্ নরাংশ্চ বৈ
স্বাধীনতাং বো দাস্যামি যুষ্মাকং সর্বসিদ্ধিদাম্।
দেহি দেহীতি মহ্যং বৈ জীবিতং রুধিরং চ বঃ।
মত্তঃ প্রাপ্স্যথ স্বারাজ্যং যূয়ং ভদ্রমভীপ্সিতম্॥"

অনুবাদ করলে অনেকটা হবে—

"ঋষি সুভাষ—তেজো দেবতা—বীর ছন্দ।

হে মানবকগোষ্ঠী,—আমি সত্যকে স্মরণ করিয়া শপথ করিতেছি যে, ঐ শ্বেতকায়গণকে পরাভূত করিয়া আমি তোমাদিগকে স্বাধীনতা দিব। তোমরা আমাকে তোমাদের রক্ত, তোমাদের জীবন দাও, আমি তোমাদিগকে মুক্ত-ভূমি দান করিব।"

এই দুখানা পাতায় কি আজকের ইতিহাসই বলা হচ্ছে না।

বহির্ভারতের কথা বুকে নিয়ে—৫০০০ বছর পরে কোন গ্রন্থে হয়তো পাওয়া গেল—

সুকর্ণ ঋষির্নেহেরুর্দেবতা ভাষণং ছন্দঃ—

উচ্চভূমিং তিরস্কৃত্য সমুদ্রমেখলামনু
দ্বীপং সমাগতা দেব তব বংশ্যাঃ বয়ং চিরম্॥
অত্রত্যাস্তু জনাঃ সর্বে সংবদ্ধাঃ যুষ্মাভিঃ সদা
সংস্কৃতিযোগসূত্রেণ বহোঃ কালান্ন সংশয়॥
এতস্য দেশভাগস্য নাম যত্তু সুবিশ্রুতম্।
তবৈব দেশনাম্নস্তু গৃহীত্বার্দ্ধং কৃতং হি তৎ॥
যস্মিন্ দেশেঽস্য যৎকর্ম কর্তুমহং নিয়োজিতঃ।
জাকর্তেত্যস্য বৈ নাম্নঃ যোগ্যকর্তা সুভাষণম্॥
প্রবলিংসেতি যন্নাম দেশস্যাস্য সমাহৃতম্।
পূর্বকলিংগশব্দাভ্যাং তন্নাম কবিভিঃ কৃতম্।
যা বেত্তি নাম যৎ পুণ্যমধুনৈব প্রকীর্তিতম্।
ভারতবর্ষসম্পর্কাৎ অভিধানং তদেবহি॥
সর্বেষাং মংগলং ভূয়াৎ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু দেশোঽয়ং যাচতে তু তৎ॥

যদি তার মানে করা যায় তবে দাঁড়ায়—

রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ বলিতেছেন ঃ নেহেরু দেবতা ঃ ভাষণ ছন্দ।

"হে আর্য্য, আপনাদের বংশধরগণ আমরা আপনাদের ঐ উচ্চভূমি ছাড়িয়া সাগর মেখলা ব্যাপ্ত এই দ্বীপদেশে সমাগত। সেই প্রাচীন কাল হইতেই এই ভূমিজ মনু-সন্তানগণের সহিত আপনারা সংস্কৃতির যোগসূত্রে আবদ্ধ। পুরাকালীন ভবদীয় জন্মভূমির নামার্দ্ধ লইয়াই আমাদের এই দেশভাগের নামকরণ। যে স্থানে আজ আমরা কর্ম্ম-যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিতেছি মদ্দেশীয় সেই জোগকর্ত্তা—যোগ্যকর্ত্তা নামেরই সংস্কারিত পরিচয়। পূর্ব্ব ও কলিঙ্গ নাম সহযোগে গঠিত আর্য্য বংশধরগণের সাগরদ্বীপস্থ এই প্রবলিঙ্গ দেশে প্রথম জম্বুদ্বীপের ভারতভূমির শস্যস্থলী পতিত ও স্থাপিত হয়। 'যবশস্য' এই ভূ-ভাগকে যাবা নামে অভিহিত করে—এ দেশ আর্য্য কল্যাণে শান্তিপ্রদ হউক, সকলে নিরাময় হউক, সকলের মঙ্গল হউক।"

এমনই ধারা সব কথা লেখা সেই গ্রন্থখানা যদি আজকের কংগ্রেসী কোন বুলেটিনও হয় তবে কি সেটা আমাদের বেদ বা ইতিহাস বলে মনে হবে না? তবে তাও হতে হবে জ্ঞান-কথায় পূর্ণ।

এমন সব কথার মধ্যে আমরা সে যুগের কয়েকটী নেতা বা দেবতার কথাই তো জানতে পেলাম। তার উপর জানলাম, তাদের সাধনা ও উপনিবেশের কথা। এ সব অবশ্য লেখা হ'ল বোঝাবার জন্য—নইলে বেদের ইতিকথা সবই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা।

হয়তো ঠিক এমনই করে পূর্ব্বপুরুষ ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন আর্য্যগণ। বেদে—বৃহস্পতি ঋষি, ভরদ্বাজ ঋষি বা বশিষ্ঠ ঋষি, বিশ্ব দেবতা, মিত্র-বরুণ দেবতা বা সবিতা দেবতাকে স্মরণ করে ত্রিষ্টুপ ছন্দে, জাগতী ছন্দে বা অনুষ্টুপ ছন্দে প্রাচীন সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কথা, উপদেশ ও কাহিনী বলে গেছেন প্রাচীনতম এই গ্রন্থ বেদে। শুধু স্বার্থ বা ইহকাল নয়, পরমার্থ ও পরলোকের কথায় ভরা। সে মহাবাণী অলৌকিক—জ্ঞান ও পরাজ্ঞানের আকর।

তবে সেই সব শ্রেয় ও প্রেয় কথাতো আর এ যুগের স্বার্থ-সঙ্কট

যুগের কলমে লেখা যাবেনা, ঋষিদের সে কথা অননুকরণীয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথায় পূর্ণ সেই বেদ ভারতের এক অপূর্ব্ব সম্পদ।

বেদ জগতের আদিম গ্রন্থ। বিশ্বে এর আগে আর কোন গ্রন্থ লেখাই হয়নি—জগতের বিদগ্ধ-সমাজ এই কথাই মনে করেন।

প্রাচীন আর্য্যগণ তাদের জীবনের চলার পথে সকলের জানবার জন্য ও সকলকে জানাবার জন্য যে বাণী বল্লেন বা লিখে রেখে গেলেন সেই আখ্যায়িত গান, মন্ত্র ও আখ্যায়িকা নিয়ে সংকলিত হ'ল এই বেদ। এই বেদ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রভৃতি অষ্টাদশ ঋষি ব্যাস বা বিভক্ত করলেন চার ভাগে—ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব্ব।

বেদ-চতুষ্টয়ের গৌরব বৃদ্ধি কামনায় বর্ণিত হ'ল যে,—ব্রহ্মার চতুর্মুখ থেকে ক্রমান্বয়ে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব বেদ নির্গত হল —শস্ত্র, ইজ্যা, স্তুতি স্তোম ও প্রায়শ্চিত্তাদি উপদেশ উদ্গীত হ'ল, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব বেদ আর স্থাপত্য বেদ প্রচারিত হ'ল।

বাস্তবে আর্য্যগণের উদ্গীত বেদ, ঋষিরা করলেন সংগ্রহ। 'ঋষিদর্শনাৎ'—যিনি মন্ত্র দর্শন করেন তিনি ঋষি। তাঁরা বুঝলেন— ঐ মন্ত্রেই আছে বিশ্ব-কল্যাণ। মন্ত্র-শক্তি স্থাপিত হ'লো।

বেদ সংহিতা

সংগ্রহকালে—বেদের মন্ত্রসমূহ ঋষিরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন ঋক্, যজু, সাম। ঋষি-সৃষ্ট বেদের তাই আর একটি নাম "ত্রয়ী।" মন্ত্ররাশি যখন শ্রেণীগতভাবে পৃথক্ পৃথক রূপে সংকলিত হলো, তখন এক একটি সংকলনের নাম হলো সংহিতা। যে সংকলনে শুধু ঋক্ মন্ত্রগুলি সন্নিবেশিত হলো তা ঋক্ সংহিতা, যাতে সমগ্র সামগান সংকলিত হ'ল তা সাম সংহিতা। যাতে যজ্ঞাদি প্রয়োজনের যজুর্মন্ত্র সংগ্রথিত হ'ল তা যজু সংহিতা। অথর্ব্ববেদে এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রই আছে। হয়তো তাই বলা হয় অথর্ব্ব সংহিতা—পরে সঙ্কলিত। কিন্তু ঋকের পর অন্য সব বেদই সংগৃহীত।

যজ্ঞানুষ্ঠানে চারজন ঋত্বিকের প্রয়োজন হ'ত—হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা, ব্রহ্মা। হোতা ঋক্‌মন্ত্রসমূহ পাঠ করে দেবতার আবাহন করতেন, এই জন্য ঋক্‌বেদের নাম 'হৌত্রবেদ'। উদ্গাতা সমগ্র

মন্ত্র গান করে দেবতার স্তবগান করতেন। এই জন্য সামবেদের নাম 'ঔদ্‌গাত্র বেদ'। অধ্বর্যু যজুর্মন্ত্র সমূহ পাঠ করে দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দিতেন। এই জন্য যজুর্বেদের নাম আধ্বর্য বেদ। আর ব্রহ্মা দেখতেন যজ্ঞের কাজে কারও কোন ভুল না হয়।

সাধারণ ভাবে বোঝাতে গেলে বলতে হয়, কাজ করতে গেলে কেউ গুন গুনিয়ে গান ধরে—কেউ শ্রমটা লাঘব করতে, কেউ আবেগে, আবার কেউ উৎসাহে। যজ্ঞের সময় এই রকম গানগুলোই হ'ল সামগান।

তারপর যাগ-যজ্ঞ করবার সময় দেবতাদের স্তুতির জন্য যে মন্ত্র পাঠ হ'ত—যে মন্ত্রে আহুতি দেওয়া হ'ত—হ'ত যজ্ঞবেদী রচনা, হ'ত যজ্ঞাগ্নি জ্বালানো—সেই সব আচার অনুষ্ঠানের মন্ত্র ও নিয়ম হ'ল ঋক্।

আগে নিয়ম তবে তো গান—তাই ঋক্ আগে সাম পরে।

যজুর্বেদও অনেকটা তাই। বিভিন্ন দল হয়ে বিভিন্ন নিয়ম বিভিন্ন ভাবে করতো পালন—তারই খানিকটা যজুঃ। আবার তার মধ্যেও গুরু-শিষ্যে হ'ল মতান্তর—যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয়ী মতে শুক্ল যজুর্বেদ প্রচলিত হলেও তাঁরই অন্য শিষ্যের দল গাঁথলেন কৃষ্ণ যজুর্বেদ।

তারপর অনেক পরে, অথর্ব্ব মুনি—যুদ্ধ, চিকিৎসা, বশীকরণ প্রভৃতি কার্যের জন্য করলেন অথর্ব্ব বেদের সঙ্কলন।

এবার এক এক করে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

ঋগ্বেদ সংহিতা

বেদের যে মন্ত্রগুলি পাঠ হয় তাকে বলা হয় ঋক্। ঋক্‌গুলি এক করে তৈরী হয়েছে "ঋগ্বেদ-সংহিতা।" এখন মানুষের সমাজে ধীরে ধীরে বিভিন্ন বংশধারা তো পৃথক হয়ে যাবেই—লোক বাড়লেই ঘর বাড়বে। এক এক বংশের এক এক ঋষি কতক-গুলি ঋক্ কণ্ঠস্থ করে আপন আপন মণ্ডলীর মধ্যে ব্যবহার করতেন—সেইগুলি হতো এক এক মণ্ডল।

সংহিতা বা মণ্ডলের প্রতিটি ঋক্ বা মন্ত্রই কোন দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতি। অবশ্য সেই স্তুতির মধ্যেই পাওয়া যায় প্রাচীন যুগের ইতিবৃত্ত। কয়েকটি ঋক্ নিয়ে যখন একটি স্তুতি শেষ হ'ল তখন

তার নাম হ'ল সূক্ত। কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট সূক্ত ব্যবহার করতেন এক এক মণ্ডলী। এই সব মণ্ডলের যোগেই হ'য়ে উঠল সংহিতা।

অধ্যায়-বিভাগের মতন দেখি ঋগ্বেদ-সংহিতায় সেই সব বিভিন্ন মণ্ডল। প্রতি মণ্ডলে প্রতি সূক্তের সঙ্গে সেই ঋষির নাম জড়িয়ে আছে, যে ঋষির মণ্ডলী মণ্ডল তারই, আর আছে দেবতার নাম, যার জন্যে সে স্তুতি। আর যে সুর বা ছন্দে তা গীত হত তার নাম।

প্রতি মণ্ডলেই বিশিষ্ট ঋষির সংগৃহীত সূক্ত—প্রত্যেকটি স্বাতন্ত্র্যে পূর্ণ। তবে প্রথম ও শেষ মণ্ডলে কয়েকজন ঋষির সম্মিলিত সংগৃহীত সূক্তও দেখা যায়।

প্রথম মণ্ডলে ১৯১টি সূক্ত : দীর্ঘতমা আর তাঁর ছেলেদের ৩৬টি, অঙ্গিরার বংশের ৩২, কণ্বংশের ২৭টি, অগস্ত্যের ২৭টি, গোতমের ২৭টি, দেবোদাস পুত্র পরুচ্ছেপের ১৩টি, বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দের ১১টি, শক্তি-পুত্র পরাশরের ৯টি, অজীগর্ত্ত-পুত্র শুনঃশেফের ৭টি, মরিচী পুত্র কশ্যপের একটী এবং অন্য আরও কয়েকজনের মিলিয়ে ১৯১টী সূক্তে প্রথম মণ্ডল শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় মণ্ডলে ভৃগুবংশীয় গৃৎসমদ ঋষির বংশধরগণের ৪৩টি সূক্ত, তৃতীয় মণ্ডলে বিশ্বামিত্র ঋষির বংশধরগণের ৬২টি সূক্ত, চতুর্থ মণ্ডলে বামদেব ঋষির বংশধরগণের ৫৮টি সূক্ত, পঞ্চম মণ্ডলে অত্রি ঋষির বংশধরগণের ৮৭টি সূক্ত, ষষ্ঠ মণ্ডলে ভরদ্বাজ ঋষির বংশধরগণের ৭৫টি সূক্ত, সপ্তম মণ্ডলে বশিষ্ঠ ঋষির বংশধরগণের ১০৪টি সূক্ত, অষ্টম মণ্ডলে কণ্ব ঋষির বংশধরগণের ১০৩টি সূক্ত আছে।

তবে অষ্টম মণ্ডলে আরও ১১টি বালখিল্য সূক্ত দেখা যায়। অনেকে তাই এটাকে পরে লেখা বা প্রক্ষিপ্ত বলে ধরেছেন।

এই যে সব সূক্ত এ আবার পৃথক পৃথক দেবতার স্তবে ভরা। সব সূক্ত দিয়ে এক এক ঋষি তো এক দেবতারই স্তব করেননি। তবে নবম মণ্ডলের সব সূক্তই এক সোম দেবতার স্তবে ভরা আর তা' প্রায় যেন সামবেদের গানের সুরের রেশে মেলে।

দশম মণ্ডলে আবার পাই প্রথম মণ্ডলের মতন নানা ঋষির সংগৃহীত সূক্ত। নানা দেবতার স্তবে এই ১৯১টী সূক্ত পূর্ণ।

মোট ঋগ্বেদে এইভাবেই আছে ১০২৮টী সূক্ত বা শ্লোক, তাতে শব্দ আছে ১৫৩৮২৬ আর অক্ষর আছে ৪৩২০০০।

এ হিসেব আমাদের নয়। একদিন নৈমিষ্যারণ্যেই এ হিসেব করা হয়।

সামবেদ সংহিতা

প্রাচীন রীতি অনুসারে যজ্ঞের সময় কোন কোন ঋক শুধু উচ্চারণ করাই হ'তো না—সুর তাল লয়ে সেই ঋক গান করা হ'তো। গানের এই অংশই হলো সামবেদ সংহিতা।

কিন্তু গানের সুর, ভাষা, উচ্চারণ ভিন্ন দেশে ভিন্ন রকম। এই ভিন্নরূপ নিয়েই শাখার সৃষ্টি। সামবেদ প্রধানতঃ তেরটি শাখায় বিভক্ত। এই ত্রয়োদশ শাখার মধ্যে কাশী, কান্যকুব্জ, গুর্জর ও বাংলাদেশে 'কৌথুমী', আর দ্রাবিড়ে রাণায়ানী শাখার প্রচলন। অন্য কোনো শাখা বড় একটা দেখা যায় না।

এই কৌথুমী শাখার সংহিতা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। ঋকগুলিকে বলে 'আর্চিক'। আর সেই আর্চিক গীত হলেই হয় 'গান'।

এই আর্চিক হ'লো তিনটি। ছন্দঃ আর্চিকে যে মন্ত্র বা ঋকগুলি আছে—গেয় গানে সেই গীতগুলি ঠিক পর পর সাজান।

'আরণ্যক' আর্চিকের মন্ত্র বা ঋক আছে আরণ্যক গানে।

'উত্তরা' আর্চিকে যে ঋক আছে, তন্মূলক গান দেখা যায় 'উহ ও উহ্য' গানে। তবে গরমিলও কোথাও কোথাও দেখা যায়।

যজুর্ব্বেদ সংহিতা

যজুর্ব্বেদ পূর্ণভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নিয়মে ভরা। ঋগ্বেদ পদ্যে, স্তুতি ও পরমাত্মা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব কথায় পূর্ণ। যজুর্ব্বেদ গদ্যে, যজ্ঞ ও নানা অনুষ্ঠানের নিয়মাবলীতে পূর্ণ। যজুর্বেদের অনেক শাখা—তার মধ্যে ছয়টি কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ অবশিষ্ট শুক্ল যজুর্ব্বেদ। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদকে তৈত্তরীয় সংহিতা বলে। তৈত্তরীয় সংহিতায় কুরু, পাঞ্চালগণের বিবরণ ও কৌরবগণের বিবরণও আছে। তাই মনে হয় এদের সীমানায় কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ ও মিথিলাতে শুক্ল যজুর্ব্বেদ

প্রচলিত ছিল। প্রবাদ যে জনক রাজার পুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয়ী যজুর্ব্বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অংশ পুনঃসংকলন করে শুক্ল যজুর্ব্বেদ সম্পাদন করেন আর তারই ব্রাহ্মণগুলি বাজসনেয়ী সংহিতা নামে প্রখ্যাত হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের ১৭টি শিষ্যের হাতে এই সংহিতার আবার সপ্তদশ শাখা নির্দ্ধারিত হয়। তবে তার মধ্যে 'মাধ্যন্দিনী' শাখাই সমধিক প্রসিদ্ধ ও মোট ইহা ৪০ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপদ তিথিতে পালনীয় দশ যাগের কথা আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পিণ্ড পিতৃ যজ্ঞের কথা। বৈদিক সব যজ্ঞের মধ্যে কেবল এই যজ্ঞটী আজও প্রচলিত, তৃতীয় অধ্যায়ে অগ্নিহোত্র, বা সংসারাশ্রমে প্রাতে, সন্ধ্যায় করণীয় হোমের অনুষ্ঠান লিখিত আছে। এই অগ্নিহোত্র অংশেই প্রসিদ্ধ "গায়ত্রী" মন্ত্রের প্রথম সন্নিবেশ হয়েছে।

চতুর্থ থেকে অষ্টম অধ্যায়ে অগ্নিষ্টোমের বিধান, নবম অধ্যায়ে রাজসূয়, দশম অধ্যায়ে সৌত্রামণী এবং একাদশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অগ্নিচয়নের কথা লিপিবদ্ধ আছে। "অগ্নিচয়ন" ক্রিয়া আর্য্যগণের এক পরম ব্রত। আগুন নিয়েই মনু-সন্তানের প্রথম ইলাবৃতবর্ষে প্রবেশ—অগ্নি স্থাপনই তাদের প্রথম অনুষ্ঠান। কি উপনিবেশ স্থাপনে, কি ব্রত অনুষ্ঠানে, কি দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভে আর কি ঐ গার্হস্থাশ্রমে—আগুন ও যজ্ঞ যেন হিন্দুর শ্রেষ্ঠতম প্রতীক-কর্ম্ম। আজও নব্যযুগে Fire বা অগ্নি-মশালে বিজয় বা আনন্দ ঘোষণার কথা স্বীকৃত, ক্রীড়ারম্ভেও অগ্নি-স্থাপন আজ কর্ম্মসূচীর প্রারম্ভে সন্নিবেশিত। 'অগ্নি' ভারতীয় সংস্কৃতির শাশ্বত-প্রতীক।

অগ্নি তাই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দেবতা, জীবন-পথের প্রথম পাথেয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে তাঁরা যে অগ্নি জ্বালাতেন, চিরকাল সেই অগ্নিশিখা তাঁরা প্রজ্বলিত রাখতেন। কারণ আদিম বাসস্থানের তুষারপাতের হিম-ক্লেশ, বুঝি তাঁরা ভুলতে পারেননি। তারপর সেই অগ্নিতে আহুতি দিয়েই হ'ত সকল পূজা, সকল সাধনা। যজ্ঞ তাই তাঁদের প্রধান কর্ত্তব্য।

অনেকে বলেন যে এই অষ্টাদশ অধ্যায়ই প্রাচীন। ঊনবিংশ হ'তে পরিশিষ্ট আরম্ভ। দ্বাবিংশ থেকে পঞ্চ বিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত

অশ্বমেধ যজ্ঞ বিধান। বাকি ১৫টি অধ্যায় "খিল" নামে প্রখ্যাত। এতে আছে পূর্ব্বোক্ত কাণ্ডাদির পরিশিষ্ট—আনুপূর্ব্বিক ক্রিয়া এবং —পুরুষমেধ, সর্ব্বমেধ, পিতৃমেধ, প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ।

হিন্দুদের যজ্ঞই প্রধান কাজ। এই যজ্ঞ থেকেই অন্যান্য পূজা, গ্রহ-নক্ষত্রের আরাধনা, জ্যোতিষ, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, মন্ত্রের শুদ্ধা-শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য ব্যাকরণ, কাহিনী বর্ণনায় সাহিত্যের সৃষ্টি হ'ল। চিতি বা জ্যামিতি যজ্ঞকুণ্ড প্রস্তুতের সময় যে "চিতি" আঁকা হ'ল—তা থেকেই হ'ল জ্যামিতি।

অথচ এই যজ্ঞে নানা দেবদেবীকে স্মরণ করে আহুতি দানের মধ্যেও সবই যে একই ঐশী শক্তির প্রকাশ একথা হিন্দু ভোলেনি।

অথর্ব্ব বেদ—সংহিতা

এখন বলি অথর্ব্ব বেদের কথা। ঋক, যজু, সাম থেকে অথর্ব্ব একটু পৃথক। অনেকেই বলেন অথর্ব্ব বেদ পরবর্ত্তীকালে লেখা—এবং ঋক্, সাম ও যজু যে সব অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়—ঐ বেদ সেখানে অচল অর্থাৎ অথর্ব্ব—তাই এর নাম "অথর্ব্ব বেদ"। আবার অনেকের ধারণা আঙ্গিরা বংশের অথর্ব্ব ঋষি ঋক্, বেদ থেকেই এই অংশ সংকলিত ক'রে কিছু নূতন মন্ত্রসহ এক নূতন সম্পাদিত সংহিতা প্রকাশ করেন, তাই অথর্ব্বের ব্যাস করা অংশ অথর্ব্ব বেদ এবং ঋষি অথর্ব্ব সেদিন থেকে নাকি "ব্যাস" নামে অভিহিত হলেন।

অথর্ব্ব বেদে বিশটি কাণ্ড বা অধ্যায় এবং ৭৩১টি সূক্ত বা মন্ত্র।

এর প্রায় সব মন্ত্রগুলিরই উদ্দেশ্য শত্রুনাশ, পীড়া বা হিংস্রক জন্তু বা অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ, দুর্দ্দৈব থেকে পরিত্রাণ।

গদ্যে ও পদ্যে এ বেদ রচিত। ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া অংশগুলি প্রায়ই পদ্যে আর ক্রিয়াকাণ্ডের নিয়মগুলি গদ্যে লিখিত হয়েছে।

ঋগ্বেদের দশম খণ্ডের সঙ্গে অথর্ব্ববেদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

তাছাড়া ঐতরেয়, শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক বা ছান্দ্যোগ্য উপনিষদের প্রাচীন অংশে অথর্ব্ব বেদের নাম পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় পরবর্ত্তীকালে রচিত পুরাণের পাতায়। তাই অনেকে বলেন, অথর্ব্ব বেদ পরবর্ত্তীকালে রচিত।

ফলতঃ অন্যান্য বেদের বিষয়বস্তু যেমন ঐশীভাবে উন্নত,—অথর্ব্ব বেদের মন্ত্রগুলি যেন বাস্তব জীবনের সুখবৃদ্ধি, দুঃখ নাশ বা ঐহিক জীবনের উন্নতি ও শান্তি কামনায় গ্রথিত।

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক

এখন প্রকাণ্ড কলেবর এই বেদকে জ্ঞানী ব্রাহ্মণরা প্রথমেই দুটো ভাগ করলেন—একটা জ্ঞান কাণ্ড আর একটা কর্ম্ম কাণ্ড। যজ্ঞ ও কর্ম্মকাণ্ডের মূলকথাগুলি এক করে গেঁথে নিলেন আর ভাল ভাল কাহিনীগুলি দিলেন পৃথক ভাবে সাজিয়ে। ব্রাহ্মণরা বেদ থেকে এই যে আবার নতুন গ্রন্থ সম্পন্ন করলেন তার নামও দিলেন—ব্রাহ্মণ। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ মন্ত্র। যজ্ঞে মন্ত্রের বিনিয়োগ নিয়ে যে গ্রন্থে খুঁটিনাটি আলোচনা আছে তাই 'ব্রাহ্মণ'। যে সব গ্রন্থে কেবল ঋক্ মন্ত্রগুলিরই যজ্ঞের প্রয়োগে আলোচনা করা হয়েছে তাই ঋক্-বেদের ব্রাহ্মণ। এমনি ভাবে প্রতি বেদেরই সঙ্গে তার নিজস্ব ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ জন্মলাভ করেছে।

হয়তো আবার এই ব্রাহ্মণের যে অংশ সংসারের জন্য হল তার নাম "ব্রাহ্মণ" থাকলেও, তারা জ্ঞানী বা মুক্তি-কামী অরণ্যবাসীদের জন্য যা পৃথক করে শুধু অরণ্যের মধ্যেই আবদ্ধ রাখলেন তার নাম করলেন "আরণ্যক"। আরণ্যক ব্রাহ্মণেরই এক অংশ।

উপনিষদ

ব্রাহ্মণেরই এক অংশ "উপনিষদ"। ব্রাহ্মণদের কর্মের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার দরুণ সমাজের চিন্তাশীল শ্রেণী চিন্তারাজ্যে ব্রাহ্মণ্যমতবাদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তারই ফলে আরণ্যক ও উপনিষদ এই দুই সাহিত্যের জন্ম। 'উপ' (সমীপ) নি (নীচে) সদ্ (উপবেশন করা)—গুরুর নিকটে, গুরুর পদতলে উপবেশন করে যে গুহ্যতত্ত্ব শিখতে হ'ত তাই উপনিষদের উপজীব্য। অথবা যে তত্ত্ব কথা সেই পরমাত্মার সমীপবর্ত্তী করে তাই উপনিষদ। এই জন্য এর আর এক নাম 'রহস্য'।

বেদ-পুরুষের শিরোভাগকেই উপনিষদ্ বলা হয়। উপ (ব্যবধান রহিত) নি (সম্পূর্ণ) ষদ্ (গত্যর্থক ধাতু, জ্ঞান) = উপনিষদ্।

"ষদল বিশরণ গত্যবসাদনেষু" ধাতুর পূর্ব্বে উপ আর নি উপসর্গ যোগে এবং শেষে ক্বিপ্ প্রত্যয়ে হয় উপনিষদ্। উপনিষত্তে—প্রাপ্যতে ব্রহ্মাত্মাভাবোঽনয়া ইতি উপনিষদ্"—অর্থাৎ যাহার দ্বারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয় তাই উপনিষদ্। ব্রহ্মের কাছে পৌঁছে দিয়ে যে তাহারই নিকটে উপবেশনের অধিকারী করায় (উপ = সমীপে নিষৎ অর্থাৎ নিষীদতি মানে উপবেশন করায়) তাই উপনিষদ্।

উপনিষদের 'সদ্' ধাতুর আবার তিনটি অর্থ—১। বিশরণ (বিনাশ)। ২। গতি (জ্ঞান ও প্রাপ্তি)। ৩। অবসাদন (শিথিল করা)। তিনটি অর্থ ধরে অর্থ করলে দাঁড়ায়—"উপনিষাদয়তি সর্বনার্থকরসংসারং বিনাশয়তি, সংসারকারণভূতামবিদ্যাং চ শিথিলয়তি, ব্রহ্ম চ গময়তি ইতি উপনিষদ।" অর্থাৎ—উপনিষদ্ সেই শাস্ত্র যা সমস্ত অনর্থ উৎপাদনকারী সংসারকে নাশ ক'রে, সংসার কারণভূত অবিদ্যাকে শিথিল ক'রে বা নষ্ট ক'রে ব্রহ্মসমীপে উপস্থিত করায়।

ব্রহ্ম কি ?

এখন বিচার্য্য এই ব্রহ্ম কি ? তৈত্তিরীয় উপনিষদেই আছে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্মই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত।

আবার বলছেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।"

যাহা হইতে এই সমস্ত প্রাণ জন্ম নেয়, জন্ম নিয়ে জীবনধারণ করে, আবার প্রলয়ে যাহার মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয় সেই ব্রহ্ম—তাকে জানবার চেষ্টা কর। অন্য উপনিষদেও ব্রহ্ম-তত্ত্ব বোঝাতে যা যা বলেছেন তার অর্থ দাঁড়ায় যে—যাকে চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, হস্তদ্বারা আকর্ষণ করা যায় না, যাতে নেই কোন রূপ ও রঙ্গ, যে চক্ষু-কর্ণ-হস্ত-পদ দ্বারা স্পর্শের অতীত, সেই নিত্য, বিভু, সর্বগত, অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অধিবাসী ব্রহ্মতত্ত্বকে ধীমানপুরুষ সর্বদিকে দেখতে পান। কোথায় সে ব্রহ্ম তার ঠিকানা বলতে গিয়ে মুণ্ডক্য উপনিষদ বল্লেন—

"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ" সবই অমৃতময় ব্রহ্ম। তোমার সম্মুখে ব্রহ্ম, পশ্চাতে ব্রহ্ম, দক্ষিণে ব্রহ্ম, বামে ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের অপূর্ব্ব উদাহরণ দিয়েছেন উপনিষদ—

প্রজ্বলিত অগ্নি হাতে জ্বলন্ত সে স্ফুলিঙ্গ যেমতি
অগণিত প্রকাশিত হয়ে অগ্নিমাঝে মিলাইয়া যায়,
দীপ্ত ব্রহ্ম হতে নানা দীপ্ত জীব দেহ
বিনির্গত হয়ে পুন ব্রহ্মমাঝে মিশিবারে ধায়।

ব্রহ্ম—আত্মা—জ্ঞান—বিশ্ব—প্রভৃতি শব্দ প্রায়শঃ একই পরম তত্ত্বের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। প্রায় একই অর্থ নির্দ্দেশ করে তারা। যেমন—

১। **"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"**—প্রকৃষ্ট জ্ঞানই প্রকৃত ব্রহ্ম।

২। **"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"**—এই আত্মাই প্রকৃত ব্রহ্ম।

৩। **"ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠিং"**—এই সম্পূর্ণ বিশ্বই প্রকৃত ব্রহ্ম।

৪। **"সর্ব্বং যদয়মাত্মা"**—এই সবই আত্মার রূপ।

৫। **"অহমেবেদং সর্ব্বং"**—আমিই এই সব।

৬। **"প্রতিবোধবিদিতং মতং"**—প্রত্যেক জ্ঞানই ব্রহ্মের জ্ঞান।

৭। **"কৃৎস্ন প্রজ্ঞানঘন এব"**—সমস্ত জ্ঞানই পরম জ্ঞান।

৮। **"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"**—বিজ্ঞান আনন্দই ব্রহ্ম।

আরও সহজ করে বলেছেন উপনিষদ—

"দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছদ হইতে রহিত যে সর্ব্বানুভব স্বরূপ আত্মা তাই ব্রহ্ম"।

এখন এই যে অনুভব—সংসার বিষয় অনুভব তা যতক্ষণ থাকে শুধু সংসার নিয়ে জড়িয়ে ততক্ষণ তা দুঃখের আকর। ধনীর ধন আছে—কিন্তু সে যদি বসে ভাবতে থাকে—কি হবে এ ধনে? আরও ধন সঞ্চয়, আরও বৈভব বিলাসের পর তো এই মৃত্যু। তখন কোথায় আমি, কি পরিণাম? এই রকম যে অনুভব তা তাকে দুঃখই দেবে।

আবার অনুভব করলাম আমার জন আছে। আছে পুত্র, কলত্র, মিত্র—আছে বহু আশার ছেলে। হঠাৎ গেল মরে সেই ছেলে, অনুভব করতে পারি না কি তারপর? গেল স্ত্রী—কঠোর অনুভব—শেষ পর্য্যন্ত আমার মৃত্যু—তারপর? রইল জন কিন্তু শান্তি কই? জনের অনুভবেই এল দুঃখ।

মানুষকে সব সুখের শেষ কোথায় এ ভাবতে গেলেই সে অনুভব ক'রে হয় উন্মাদ। সেই উন্মত্ততাই হয়তো সিদ্ধার্থকে বুদ্ধ করলো—যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করাল, চৈতন্যকে করল গৃহছাড়া। তাঁরা তখন সংসারের অনুভব থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মের অনুভবে লিপ্ত হলেন। তাঁরা তখন চেতনবান। তাঁদের সেই চেতনাই—"ঋষি-চেতনা"।

তাঁদের দেখা সেই চৈতন্যের পথেরই সংবাদ বলেছে উপনিষদ।

শুধু সংসার নয়—ইন্দ্রিয় ও মনের অনুসরণ করে বা তার বশে গিয়ে মানুষের চেতনা যত এগিয়ে যায় সে বোঝে পূর্ণ আনন্দ এতে নেই—এতে আছে জরা, আছে ব্যাধি, আছে মৃত্যু, নিরানন্দ, অশান্তি। তখন সেই চেতনাই আরও স্পষ্টতর হয়ে পূর্ণতর রূপে বিকশিত হয়। তখন সেই পূর্ণতর চেতনা অনুভব করে – ইন্দ্রিয় ও মনের বশে আসা সংসারের যে কোন বিষয়ই হচ্ছে বন্ধন – আর সে বন্ধন দেয় বিয়োগ-ব্যথার বেদনা। অথচ এ থেকে মুক্তি যদি পাওয়া যায় তবে অসার থেকে সারের দিকে মন যায় ছুটে, স্বরূপভূত চিৎ জ্যোতিকে, সদানন্দকে পাবার জন্যে সে হয় ব্যাকুল। তখন সে ইন্দ্রিয়-মন-নিরপেক্ষ সম্যক বোধে সম্বুদ্ধ হয়ে, প্রকৃত জ্ঞানের পথে এই বিশ্ব-জগতে নিরন্তর যে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে তাই হল ব্রহ্মপ্রাপ্তির মূল। তখন তাঁর মধ্যে জ্ঞানবলে মানব-চেতনার এক অপূর্ণ রূপ থেকে পূর্ণতর রূপ হয় প্রকাশিত, নিজের সঙ্গে বিশ্ব-জগতের এক যোগসূত্র হয় লক্ষিত, স্বার্থের জ্ঞান হয় পরার্থে—আর পরার্থ থেকে হয় পরমার্থে ন্যস্ত। তখন তার নিজের সঙ্গে সারা বিশ্বকে সে অভেদ ভাবে। শুধু নিজের ধন, জন, দেহ, কেহ নয় – সকলের মঙ্গলের, শান্তির ও কল্যাণের দিকে সে ধাবিত হয় – আর নিজেই একখণ্ড স্বার্থ, অপূর্ণ অধ্যায় ও নিরানন্দ-ময় পথ থেকে মুক্ত হয়ে সে অখণ্ড—পূর্ণ, আনন্দময় পথে চলে যায়।

এই যে ইন্দ্রিয় বা মন থেকে মুক্ত চেতনা – এইটিই "ঋষি চেতন"। এই ঋষি-চেতনা লাভ করেই ইন্দ্রিয় ও মনের বিকার থেকে মুক্ত হয়ে অতীন্দ্রিয় ও অতিমানস জ্ঞানকে লাভ করে মহামানব মহর্ষিগণ যে জীবজগতের মধ্যে পরমার্থিক রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যাঁদের সম্যক-সম্বুদ্ধ চেতনার সামনে পরম সত্য অনাবৃত ও অবিক্ষিপ্তরূপে

নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছিলেন—তাঁদেরই দিব্যবাণী, মঙ্গলময় বাণী, এই উপনিষদ। গুরুশিষ্য পরম্পরায় সেই ঋষি-চেতনালব্ধ দিব্যবাণী উপনিষদ ক্রমান্বয়ে নানা শাখায়, নানা ভাবে প্রচারিত হলো, আর সেই মহাবাণী উপনিষদের আশ্রয় নিয়ে অগণিত সাধকবর্গ স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি, কর্ম্মশক্তি আর চিত্তবৃত্তিকে সুপথে কল্যাণকর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে নিজ নিজ চেতনাকে ইন্দ্রিয় ও মন থেকে মুক্ত করে নিয়েছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষত্ব এই যে ভারতের এই বহুমুখী সাধনা আর সভ্যতা এই ঋষি-চেতনালব্ধ তত্ত্বানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কি শুধু ধর্ম্মের চেতনাই নয়—কর্ম্ম চেতনাও এই ঋষি-চেতনালব্ধ মহাবাণীকে অনুসরণ করে উদ্বুদ্ধ। ভারতের জ্ঞানই শুধু নয়, তার বিজ্ঞান ও দর্শন, সাহিত্য ও শিল্প, কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম, সমাজ-নীতি ও রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য-নাতি, ব্যবহারিক জগত ও নৈতিকজগত সবই এই ঋষি-চেতনালব্ধ উপনিষদ-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তাকেই বলি আমরা "আর্য্য-সংস্কৃতি"।

রাগ-দ্বেষ-শূন্য, হিংসা-ঘৃণা-ভয়-বিরক্তি—জাতিহীন ও সম্প্রদায়গত অভিমানের অতীত, পরিশুদ্ধ মন ও বুদ্ধি-সমাহিত চিত্ত এবং আচার-ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য ঋষি প্রদর্শিত যে জ্ঞানপথ—তা সবই এই উপনিষদ প্রাপ্ত সভ্যতার দান।

উপনিষদে সত্য ও জ্ঞানের পথে যথার্থই কোন হিংসা ও বিদ্বেষ নেই—কারও কোন নিন্দা নেই, ধর্ম্মান্তরের প্রতি আক্ষেপ নেই, আছে শুধু সমগ্র মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ ও বোধের কথা। উপনিষদের এই ঋষি-চেতনালব্ধ সত্যকেই মহাপুরুষগণ "ব্রহ্ম" বলেছেন। ব্রহ্ম শব্দের শাব্দিক অর্থ বৃহত্তম। দেশগত, কালগত, শক্তিগত, গুণগত সত্তাগত ও অবস্থাগত যে কোন সীমা, পরিধি অথবা কল্পনা সেখানে শেষ হয়ে যায়—তার পরের অবস্থাটি হল "ব্রহ্ম"। পাশ্চাত্য দর্শনও বলে গেছেন যে সমস্ত Intelectual Conciousness, সমস্ত Philosophical Knowledge এর চরম অনুসন্ধানে পাওয়া যায় যে Infinite Eternal Absolute—তাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম মানুষের বৌদ্ধ-

চেতনার চরম আদর্শ—দার্শনিক জ্ঞানের পরম লক্ষ্য। তাই ভারতীয় ঋষি বলে গেলেন হাজার হাজার বছর আগে—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—সবই যে ব্রহ্মময়।

ডাক দিলেন সারা জগতকে এ বাণী শোনাতে—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"

'শোনগো অমৃতের পুত্রেরা—শোন আর অনুভব কর'

"ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম"

ব্রহ্মই এ বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ—ব্রহ্মই বরণীয়।

যেমন তার জ্ঞান এলো—বিশ্বের এই সব জীবই শিবময়, পরম পুরুষের এক অংশ, তা থেকেই সব উৎপত্তি, আবার তাতেই সব লয়, তখন সে বুঝলো—তবে আমি যে জীব এও যত ছোট, যত দীন, যত হীন হই—"অহং ব্রহ্মোস্মি" আমিও সেই ব্রহ্ম গো।

জীবের মধ্যে ব্রহ্মের অভিন্ন-রূপ চেতনাতে আসা মাত্র জীব বলতে পারলে "তত্ত্বমসি"—তুমিও সেই ব্রহ্ম গো।

তুমি আমি নিখিল বিশ্ব, এমন কি ঐ সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ—সব ব্রহ্ম। সমস্ত বিশ্বের রূপ তখন ব্রহ্ম-কল্পনা।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তম্"—ব্রহ্মময় এই জগত সত্য, জ্ঞানও অনন্ত।

শুধু তাই নয়—সে রসময়ও বটে—"রসো বৈ সঃ"। ব্রহ্ম যে তিনি অনন্তই নন, জ্ঞানময়ই নন, সত্যপূর্ণই নন, রসপূর্ণ। পরব্রহ্মে রসব্রহ্ম, রসব্রহ্মে পরব্রহ্ম। আর সে রস আস্বাদন হয় এই উপনিষদে। আর উপনিষদের সে রসতত্ত্ব অনুভূত হলেই আর্য্য-সন্তান বুঝতে পারে—আনন্দং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানং ব্রহ্ম, মনো ব্রহ্ম, প্রাণো ব্রহ্ম, অন্নং ব্রহ্ম,—নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মময়।

এখন এই ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য যে জ্ঞান বা বিদ্যার প্রয়োজন তাই উপনিষদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা। উপনিষদের দেওয়া এই ব্রহ্মবিদ্যা অর্জ্জন ক'রে মানুষ পরম ব্রহ্মের তত্ত্ব জানতে পেরেছে। আর সে বিদ্যাও উপনিষদকার বিস্তৃত ভাবে বলে গেছেন ব্রহ্মবিদ্যা রূপে।

সেই ব্রহ্মবিদ্যা ৩২ রকমের। এই বত্রিশ রকমের বিদ্যানুশীলন ব্রহ্ম জ্ঞানে অনিবার্য্য—আর এরই বিশদ ব্যাখ্যা দেখি নানা উপনিষদে।

উপনিষদ যে কত রকম তা এখনও প্রমাণ-সিদ্ধ হয় নি, কতক-গুলিকে যেমন প্রাচীনত্বের গৌরব দেওয়া হয়, কতকগুলিকে আবার তেমনি আপেক্ষিকভাবে নবীন বলা হয়। তবে অতি-প্রাচীন বা প্রাচীন সব উপনিষদই জ্ঞানের আকর। মুক্তিকেনোপনিষদে এক তালিকা আছে সকল উপনিষদের। তাতে ১০৮টি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন সংগ্রহ-সমিতি ১৭৯ উপনিষদের নাম অথবা ২২৩ উপনিষদের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। তার মধ্যে আবার ৩টি দু'বার উক্ত। সে কারণ ২২০টি উপনিষদ সর্বশেষ প্রামাণ্য সংগ্রহ বলে মনে হয়। তারমধ্যে কঠোপনিষদ বা ঈশাবাস্যের আশে পাশে অন্নপূর্ণোপনিষদ, আয়ুর্ব্বেদোপনিষদ, ইতিহাসোপনিষদ, রাধিকা-উপনিষদ, শ্যামোপনিষদও পাওয়া যায়। তাই এর মধ্যে বহু উপনিষদ পরবর্ত্তীকালে রচিত বলেই অনেকে অনুমান করেন।

দ্বাদশ উপনিষদ

অতএব প্রধান উপনিষদ বলতে গেলে ঋগ্বেদীয় কৌষীতকী ও ঐতরেয়, সামবেদীয়, ছান্দোগ্য ও কেন, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তরীয়, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর, শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক ও ঈশা এবং অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্ন মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই দ্বাদশ উপনিষদকেই বলা হয়ে থাকে।

এখন এই উপনিষদ সমূহের আকর ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত সহ উপনিষদের আংশিক আলোচনা প্রয়োজন।

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক

তন্মধ্যে ঋক্‌বেদের প্রধান দু'টী ব্রাহ্মণ—কৌষীতকী বা সাঙ্খ্যা-য়ন এবং ঐতরেয়। কৌষীতকী ব্রাহ্মণ ৩০টি অধ্যায়ে বিভক্ত আর তা যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবরণেই পূর্ণ। কৌষীতকী ঋষিই এর প্রধান সম্পাদক বা বক্তা। এঁর যে সম্প্রদায় তাদের মধ্যেই এর বেশী প্রচার। হয়তো তারই এক নাম ছিল সাঙ্খ্যায়ন অথবা ঐ নামের কেউ এর সঙ্গে ছিলেন।

কৌষীতকী ব্রাহ্মণ বা সাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের যে অংশ আবার অসাধারণ, যা শুধু অরণ্যবাসীদের জন্য ছাঁটাই করে গাঁথা হ'ল—তার নাম হল কৌষীতকী-আরণ্যক বা সাঙ্খায়ন-আরণ্যক। আজ

পর্য্যন্ত এই আরণ্যক অংশের ১৫টী ভাগই পাওয়া গেছে।

এই যে ১৫টী অধ্যায়—তা তো জ্ঞানগর্ভ বটেই। তবে তার মধ্যে আবার অপূর্ব্ব তত্ত্বকথা বা অতুলনীয় ইতিবৃত্তে, উপদেশে ও আদেশে যে অংশ পূর্ণ তারই নাম কৌষীতকী উপনিষদ। সে উপনিষদে আছে আত্মা ও পরলোকের কথা, মুক্তি ও মোক্ষের কথা, পরমাত্মা সম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব গভীর তত্ত্বকথা। সে সব অপূর্ব্ব কথা জগতে অন্য কোন গ্রন্থে বা প্রাচীনতম কোন জাতির মধ্যে কখনও দেখা যায়নি।

তবে এই তত্ত্ব-কথা যতই পরমাত্মার নির্দ্দেশনায় পূর্ণ থাকুক না কেন, তা প্রায়ই বলা হয়েছে সেই সব আদর্শে প্রবুদ্ধ নানা মহাজনের জীবন কথার মাধ্যমে। সেই সব অপূর্ব্ব কাহিনীর মধ্য দিয়েই উপনিষদের পরমসত্য ও তত্ত্ব বিঘোষিত হয়েছে।

তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ—এই অধ্যায় চারিটিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ।

কৌষীতকী উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে চিত্র-গাঙ্গায়নি নামক ক্ষত্রিয় রাজা আরুণি-উদ্দালক নামক এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পরলোকের কথা বলেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে পরব্রহ্মের কথা, পিতা-পুত্রের সস্নেহ সম্বন্ধের বিবরণে তা পূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়ে কাশীর রাজা ইন্দ্র—প্রাণ ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে আছে কাশীর ক্ষত্রিয় রাজা অজাতশত্রু কর্তৃক বালাকি নামক ব্রাহ্মণকে পরমব্রহ্মের উপদেশ-কথা।

আশ্চর্য্য ব্যাপার একটা—আজ সবাই বলে ব্রাহ্মণরা স্বার্থপর, শুধু নিজেদের মহিমার কথাই বলেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা তাঁদের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ উপনিষদে একথা তো লিখে রেখে গেলেন যে উপনিষদের প্রায় প্রতিটি উপদেশ বা সারগর্ভ উপাখ্যানের তত্ত্বকথার বক্তা ক্ষত্রিয় রাজা আর শ্রোতা বশিষ্ঠস্থানীয় ব্রাহ্মণ।

যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের একাদশ খণ্ডে বিদেহরাজ জনক এবং ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাহিনী এই কথাই নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই জন্ম নিলেও, বিশেষ

করে—ক্ষত্রিয় জাতিই এবিষয়ে প্রথম অংশ গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্বেরই এ এক স্বীকৃতি।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণও ৪০টি অধ্যায়ে পূর্ণ। তার শেষ দশটি অবশ্যই পরবর্ত্তীকালীন। তবে এই অংশেই রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁর রোগ আরোগ্যের জন্য অজীগর্ত্ত নামক ব্রাহ্মণ-পুত্র শুনঃশেপকে কিনে দেবতার নামে বলি দিতে চাওয়ার কথা আছে; আবার হোতা বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক স্তবে তুষ্ট বরুণের করুণায় হরিশ্চন্দ্রের রোগমুক্তি ও বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক শুনঃশেপকে পুত্ররূপে গ্রহণ প্রভৃতি উপাখ্যান আছে।

তাছাড়া শেষের তিনটী অধ্যায়েও অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। তখনকার আর্য্যাবর্ত্তের সীমানা, জাতি, সাম্রাজ্য প্রভৃতির নানা উল্লেখ আছে। পরীক্ষিতপুত্র **জনমেজয়**, মনু-পুত্র **শার্য্যাত**, উগ্রসেন-পুত্র **যুধাংশ্রৌষ্টী**, বিজবনপুত্র **সুদাস**, দুষ্মন্তপুত্র **ভরত** প্রভৃতি অনেক রাজার কথা আছে এই সব কাহিনীতে।

পাঁচভাগে বিভক্ত ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয় ভাগের ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত নিয়েই ঐতরেয় উপনিষদ। তার তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে—প্রথমটিতে আছে জগতের সৃষ্টি কথা, দ্বিতীয়টীতে আছে জীবের জন্মকথা আর তৃতীয়টীতে আছে পরব্রহ্ম কথা।

সামবেদের কৌথুমী-শাখার ব্রাহ্মণ ৪০ ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে প্রথম ২৫ ভাগকে বলে পঞ্চবিংশ বা **তাণ্ড্য** ব্রাহ্মণ। এ অংশ সোম যজ্ঞের বিবরণে পূর্ণ। কিছু কিছু ঐতিহাসিক বিবরণও আছে। ব্রাত্যস্তোমে ব্রাত্যদিগের বিবরণ পাওয়া যায়। এ অংশেও নৈমি-ষারণ্যের যজ্ঞ ও কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। কোশল-কাহিনীও আছে এই অংশে। তার পরের ৫ ভাগ ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ। তাতে আছে বহু প্রকার প্রায়শ্চিত্ত বিধান। অপরাধের জ্ঞান যখন মানুষের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে, মানুষ অনুতপ্ত হয়—তখনই করে প্রায়শ্চিত্ত। তারই বিধানে এ অংশ পূর্ণ। তা'ছাড়া বিপদ, রোগ, অজন্মা, ভূ-কম্প প্রভৃতি দুর্দ্দৈব কাটাবার নানা অনুষ্ঠানের উপদেশ আছে এ অংশে। তবে এই অংশকে অনেকে কিছু আধুনিক বলেন।

উক্ত পঞ্চ বিংশ ও ষড় বিংশ ব্রাহ্মণে যে সব যজ্ঞ বিবরণ

আছে—তা সবই **শ্রৌতযজ্ঞ**। তবে গৃহস্থের উপযোগী অনুষ্ঠান বা **গৃহ্য-ক্রিয়ারও** বহু বর্ণনা এবং মন্ত্র আছে এই অংশে।

এর পরের আট ভাগই প্রসিদ্ধ ছান্দোগ্য-উপনিষদ্। এই ৮টী ভাগের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বা প্রপাঠকে "ওঁ" শব্দ **উদ্গীত** হয় এবং সাম, প্রাণ, আত্মা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়।

তৃতীয় প্রপাঠকে আছে পরব্রহ্মের কথা—আর সেই অংশেই পাই দেবকীনন্দন **শ্রীকৃষ্ণের** লীলাকাহিনী। **ঘোর-অঙ্গিরসের** নিকট শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বকথার উপদেশ শোনা ও ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে যাওয়ার বর্ণনা আছে এই অংশে।

চতুর্থ প্রপাঠকে—**সত্যকাম ও জবালার** প্রসিদ্ধ কাহিনী।

পঞ্চম প্রপাঠকে **শ্বেতকেতু** আরুণেয় নামক ব্রাহ্মণ কি ভাবে **প্রবাহন** জৈবলি ও **অশ্বপতি** কৈকেয় নামক ক্ষত্রিয়ের কাছে পর-ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তার কাহিনী আছে।

৬ষ্ঠ প্রপাঠকে আছে আবার ঐ অরুণ-পৌত্র শ্বেতকেতু তাঁর পিতা অরুণ-পুত্র উদ্দালকের নিকট কিভাবে পরমাত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলেন তারই বিবরণ।

সপ্ত প্রপাঠকে আছে—সনৎকুমারের নিকট নারদের মনোবিজ্ঞান—নাম, বাক্য, মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, জল, তেজ, স্মরণ, আশা, প্রাণ ও পরমাত্মার সম্বন্ধে প্রদত্ত উপদেশ।

অষ্টম প্রপাঠক পরব্রহ্ম ও প্রজাপতির নানা তত্ত্ব-কথায় পূর্ণ।

সামবেদের আর একখানি প্রসিদ্ধ উপনিষদ "কেন-উপনিষদ্"। তলবকারদিগের মধ্যেই ইহার সমধিক প্রচলন ছিল বলেই বোধ হয় এর আর এক নাম "তলবকার-উপনিষদ্"।

এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পরমব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনায় পূর্ণ হলেও—তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সেই পরব্রহ্মের দেবগণের নিকট আবর্ভাব, অপরিচিত সে আবির্ভাবকে উমা-হৈমবতী কর্তৃক দেবগণের নিকট পরিচিত করাবার কাহিনীতে পূর্ণ।

সার কথায় এ অংশে এইটুকুই বোঝান হয়েছে যে বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি সব দেবতাই ঐ ঐশী-শক্তির প্রকাশ মাত্র।

যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তরীয় আরণ্যক দশটি প্রপাঠকে বিভক্ত আর তারই সপ্তম, অষ্টম, নবম প্রপাঠককে তৈত্তরীয় উপনিষদ বলে। দশম প্রপাঠক অংশটি সম্ভবতঃ আধুনিক।

তৈত্তরীয় উপনিষদের প্রথম প্রপাঠকে বা বল্লীতে "ওঁ" এবং "ভূ, ভুবঃ, স্বঃ" শব্দের প্রকৃত অর্থ বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে নানা ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের কথা।

দ্বিতীয় বল্লীতে আছে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে তত্ত্বকথা ও উপদেশ।

তৃতীয় বল্লীতে বরুণ, তাঁর ছেলেকে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিচ্ছেন।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় অপর উপনিষদ—'কঠোপনিষদ' ছয় বল্লীতে বিভক্ত। এই উপনিষদেই আছে নচিকেতা যমের নিকট গিয়ে পরব্রহ্মের সম্বন্ধে উপদেশ পান। মহান্ তত্ত্বকথায় কঠোপনিষদ্ পূর্ণ।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় নামে আর একটি উপনিষদ আছে, বর্ত্তমানে তার নাম শ্বেতাশ্বতর। ইহার মাধ্যমে সাংখ্য-যোগ ও বেদান্ত-দর্শনের বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। এ অংশটি প্রাচীন হলেও অনেকে বলেন আধুনিক কালেই উহা প্রকাশিত হয়েছে।

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ—নাম "শতপথ ব্রাহ্মণ"। মাধ্যন্দিন শাখায় প্রচারিত এই সুবৃহৎ ব্রাহ্মণ ১৪টি কাণ্ডে এবং ১০০টি অধ্যায়ে সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ কাণ্ডের মধ্যে প্রথম ৯টী অতি প্রাচীন। দশম কাণ্ডটির নাম 'অগ্নি-রহস্য'। কারণ এই কাণ্ড ও একাদশ কাণ্ডের খানিক অংশ অগ্নি-চয়ন সম্বন্ধে অনেক তথ্যে পূর্ণ।

দ্বাদশ কাণ্ড প্রায়শ্চিত্ত তথ্যে পূর্ণ।

ত্রয়োদশ কাণ্ডে আছে অশ্বমেধ ও নরমেধ যজ্ঞের কথা। দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, ভরত, সাত্রাজিৎ, কাশীরাজ পরীক্ষিত-পুত্র জনমেজয় ও তাহার তিন ভাই ভীমসেন, উগ্রসেন ও শ্রুতসেন প্রভৃতি ঐতিহাসিক রাজাদের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বৈদিক এই সব কাহিনী পরবর্ত্তী মহাভারতের কাহিনী স্মরণ করায়।

চতুর্দ্দশ কাণ্ডটি আরণ্যক। আর এই আরণ্যকের শেষ ছয়টি

অধ্যায় "বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্"। সে উপনিষদে আছে প্রথম অধ্যায়—সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তার কথা, দ্বিতীয় অধ্যায়—গার্গ্য বালাকির অজাতশত্রুর নিকট পরমাত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ, তৃতীয় অধ্যায়ে—বিদেহরাজ জনকের অনুষ্ঠিত এক সভায় কুরু পাঞ্চাল দেশের বহু পণ্ডিতের সমাগম—জনকরাজ পুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত সকলের তর্ক—সকলকে বিতর্কে পরাজিত করে যাজ্ঞবল্ক্যের পুরস্কার লাভ—সভায় আগতা মাননীয়া পণ্ডিত গার্গীর যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তর্ক-বিতর্কচ্ছলে বহু তত্ত্ব ও তথ্যের বর্ণনা।

চতুর্থ অধ্যায় রাজা জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য মধ্যে ব্রহ্ম-বিষয়ক বহু আলোচনায় এবং যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী কর্তৃক ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও তার উত্তরে পূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়ে ব্রহ্মা প্রজাপতি, বেদ ও গায়ত্রী সম্বন্ধে নানা কথা আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ক্ষত্রিয় রাজ প্রবাহণ জৈবলির নিকট উদ্দালক আরুণির ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের বিবরণ আছে। যাজ্ঞবল্ক্যকে তিনি সেই জ্ঞানদান করে বলেন "এ হেন অমৃত বাণী বুঝি বা শুষ্ক কাষ্ঠকেও শাখা ও নব-পল্লব দান করে।"

এ ছাড়া ঈশা নামক উপনিষদটি পৃথকভাবে শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার শেষ অধ্যায়। মাত্র ১১টি শ্লোকে সম্পূর্ণ হয়ে যজুর্ব্বেদীয় সংহিতার মধ্যেই সন্নিবিষ্ট আছে।

অথর্ব্ব বেদের ব্রাহ্মণ অংশের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ। এর ১১টি প্রপাঠকে আছে শতপথ ব্রাহ্মণের বহু কথা ও কাহিনী।

তবে অথর্ব্ব বেদের উপনিষদ নামে যে গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ তা নাকি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অন্যান্য ব্রাহ্মণ বা উপনিষদ যখন ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক তথ্য কথায় পূর্ণ, এ উপনিষদগুলিতে তখন দেখা যায় সাম্প্রদায়িক তর্ক ও অবতার-মাহাত্ম্যের কথা। প্রবাদ অথর্ব্ব বেদে ৫২টি উপনিষদ। তার মধ্যে কতকগুলি তো "অথর্ব্বোপনিষদ" নামেই খ্যাত। আধুনিক এই অথর্ব্বোপনিষদের মোট গ্রন্থ সংখ্যা দেখা যায় ২০০।

তবে তাদের মধ্যে প্রাচীন ও পর-ব্রহ্মের কথায় পূর্ণ মাত্র তিনখানি।

প্রথম মুণ্ডকোপনিষদ। সে গ্রন্থের তিনটি বিভাগ বা মুণ্ডক।

দ্বিতীয় প্রশ্ন উপনিষদ। ছয়টি প্রশ্ন ও তার উত্তরে এ অংশ পূর্ণ।

তৃতীয় মাণ্ডুক্য উপনিষদ। এ উপনিষদে মাত্র ছ'টি পংক্তিতে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকত্ব প্রতিপাদিত। এ একটু অভিনবও বটে।

তবে উক্ত আলোচনায় মোটমাট দেখা গেল যে বিরাট তথ্য ও বিবরণে পূর্ণ, মন্ত্র ও গানে ভরা, বেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক অংশ যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম কথায় ভরা। আর উপনিষদগুলি পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের পরমতত্ত্বের চরম সত্যে। বেদ হ'লো মহাসাগর—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ, কর্ম্মকাণ্ড নিয়ম-কাণ্ড এবং জ্ঞানোপদেশে পূর্ণ। উপনিষদগুলির মধ্যে দ্বাদশ উপনিষদ প্রতি হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য। ঋগ্বেদীয় কৌষীতকী ও ঐতরেয়, সামবেদীয় ছান্দোগ্য ও কেন, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তরীয়, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর, শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক ও ঈশ এবং অথর্ব্ব বেদীয় প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মুণ্ড্যক্যই সমধিক প্রসিদ্ধ ও অতুলনীয় জ্ঞান কথায় পূর্ণ।

এই কঠোরতম উপনিষদ এ যুগে হয়তো সকলের বোঝার বাইরেই থেকে যেতো যদি স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য আপন অপূর্ব্ব প্রতিভায় উপনিষদের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা না করে যেতেন। বৈদিক যুগের সে সব ভাষা হয়ে থাকতো আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বাইরে—চাপা পরে যেতো সব।

একটি মজার কথা বলি এখানে। সমগ্র উপনিষদ মায়াহীন ব্রহ্মজ্ঞানের তত্ত্ব-কথায় পূর্ণ—জড়-জগতের সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ নেই—এই ধারণাই সকলের। কিন্তু ঠিক তা নয়, পরমার্থ বা পরকালের সঙ্গে ইহকালেরও নানা কথা ও উপদেশে তা পূর্ণ।

মানবের পরমাগতি লাভের পর সঙ্গে সঙ্গে ইহকালের সুখ সমৃদ্ধির নানা উপদেশ, প্রকৃতির কাছে শুভ ফল বাসনায় ঐশী শক্তির কাছে কামনা—এ সব নানা কথা আছে এই বেদে, আবার বেদবর্ণিত নানা তত্ত্ব কথার মূল সুর ধরে নানা বিচিত্র কাহিনীর উদ্ভব হয়েছে—যা

দিয়ে অপরূপভাবে পুরাণ হয়েছে রূপায়িত। বেদবাণী পুরাণ কাহিনীর ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা সে সব আলোচনায় নেমে বেদ ও উপনিষদের বিশিষ্ট দু একটী অংশের অনুবাদ দেখলে বুঝতে পারবো সারা বেদের ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশ কোন্ পথে।

সূত্র সাহিত্য

উপনিষদের পর সূত্র সাহিত্য। বেদের সারকথা সূত্রাকারে সংক্ষেপে এতে লিপিবদ্ধ হয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হোলো,—শ্রৌত-সূত্র ও গৃহ্যসূত্র। বেদোক্ত যাগযজ্ঞের কথা রইলো শ্রৌতসূত্রে, আর গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনের বিধিনিয়মাদি রইলো গৃহ্যসূত্রে।

বেদ মন্ত্র উচ্চারণের জন্য স্বরজ্ঞান, মাত্রাজ্ঞান ও অন্যান্য উচ্চারণবিধির উপর জোর দেওয়া হ'য়েছিল। তাই ব্যাকরণের জ্ঞান, ছন্দের জ্ঞান, শব্দ নির্বাচনের জ্ঞান, কোন্ ঋতুতে কোন সময়ে কোন্ যজ্ঞ কোরতে হবে—তার জন্য জ্যোতিষের জ্ঞান সবই দরকার হোত। প্রত্যেকটার জন্য এক একটা সাহিত্য গড়ে উঠল—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ। এদের নাম বেদাঙ্গ, এরা বেদের ষড়ঙ্গ। তারপর কোন্ মন্ত্র কোন ঋষির লেখা, কোন ছন্দে লেখা, তার দেবতা বা আরাধ্য কে এসব পরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হ'ল। সে সাহিত্যের নাম হোল অনুক্রমণিকা।

মন্ত্রগুলি যাতে মুখে বিবৃত হওয়ার সময় পরিবর্ত্তিত না হ'য়ে যায়, তার জন্য একই মন্ত্রের বিভিন্ন পাঠের সৃষ্টি হ'ল। একই মন্ত্র একদল যেমন আছে তেমনি পড়তেন। আর একদল সেই মন্ত্রের পদগুলোকে একটা বিশেষ নিয়মে উল্‌টে পাল্‌টে মুখস্থ কোরতে লাগলেন। এই ওলট-পালট এক এক নিয়মে হ'য়ে এক একটি বিশেষ পাঠের প্রবর্ত্তন হ'ল। এদের নাম—জটা, মালা, শিখা, রেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ, ঘন। এরা জটাপাঠ, মালাপাঠ প্রভৃতি নামে পরিচিত। এদের সকলের নাম বিকৃতি পাঠ।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নিয়ে বেদ। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য বলতে সংহিতা থেকে আরম্ভ কোরে এই বিকৃতি পাঠগুলোকে পর্য্যন্ত বুঝতে হবে।

নৈমিষারণ্য প্রাচীন যুগের এক প্রধান তীর্থ বা [illegible]। সব বেদ-বেদান্ত পুরাণ বর্ণিত হয়েছে এই নৈমিষারণ্যে—একদা এই নৈমিষারণ্যেই মহর্ষি শৌনিক এক যজ্ঞের আয়োজন করেন।

মহাভারতের পাণ্ডবদের বংশের অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যুর পৌত্র পরীক্ষিৎ-পুত্র জন্মেজয় একদিন তার রাজ্যে বসে বাপ-পিতামহের গল্প—ঐ মহাভারতের কাহিনী শুনেছিলেন বৈশম্পায়ন ঋষির কাছে। আবার বৈশম্পায়নের ছেলে সৌতি সে সব কাহিনী শোনালেন নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে। সেইদিনই সুরু হ'ল এই সব গণনা—কোন্ বেদে কত সূক্ত, কত শ্লোক, কত শব্দ আর কত অক্ষর।

প্রথম যে ঋগ্বেদখানা সঙ্কলিত হয় তা শাকলদিগের শাখা। এই শাখাটাও আবার এক মজার ভাগ। বেদ তো প্রচারিত হল, কিন্তু এক এক দেশে, এক এক দলের পণ্ডিত, এক এক বকম করে তা লিখলেন। তাতে একটু-আধটু গরমিল তো থাকবেই। মুখের কথা শুনেই না লেখা? কোন জায়গা বাদ গেছে, কোন জায়গায় আবার জুড়ে গেছে কিছু। এক এক দেশের এক এক রকম সে সঙ্কলন, হল এক এক শাখা। সেই রকমের আর একটি শাখা হল বাস্কল শাখা।

ঋগ্বেদের মন্ত্র বা সূক্তগুলো পাঠ হ'ত সাধারণতঃ হোম বা যজ্ঞের সময়। ঘি দিয়ে আগুনে দেওয়া হ'ত আহুতি আর মন্ত্র বা সূক্তের মধ্য দিয়ে দেবতাকে ডাকা হ'ত এবং প্রার্থনা করা হ'ত।

যে দিন আর্য্যরা এলেন সিন্ধু ও সরস্বতীর তীরে সেদিন থেকে যে মন্ত্র বা সূক্ত তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ত—তা সবই বিশ্বকল্যাণের প্রার্থনা—পরমাত্মা উপলব্ধি ও জ্ঞানের কথা।

ঋগ্বেদে আছে মোট ১০টি মণ্ডলে ১০২৮টি সূক্ত, তার মধ্যে কয়েকটির উদাহরণ দেখলেই ঋগ্বেদের ধরণটা বোঝা যাবে।

ঋগ্বেদ—প্রথম মণ্ডল

প্রথম সূক্ত

মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ ॥ অগ্নি ॥ গায়ত্রী ॥

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমং ॥ ১ ॥

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবাঁএহ বক্ষতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ—

অগ্নিঃদেবতা স্মরণে বিশ্বামিত্র-পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি
—গায়ত্রী ছন্দে বর্ণনা করেন

অগ্নি যজ্ঞে পুরোহিত তিনি স্বয়ং দীপ্তিমান
দেব-আহ্বানকারী ঋষি তিনি প্রভূত রত্নধারী—ঋত্বিক সুমহান।
করি অগ্নির স্তুতি গান ॥

অগ্নি দেবেরে পূর্ব্ব ঋষিরা করেছে যেমন স্তুতি
নূতন মন্ত্রে নূতন ঋষিরা তেমনই জানায় নতি
অগ্নি মোদের যজ্ঞে করুন দেবগণে আহ্বান। ১-২ ॥

*[বেদের প্রারম্ভেই দেখি আর্য্য সন্তান প্রথম স্তুতি জানাল আগুনকে। জ্ঞান রাজ্যের পর বিজ্ঞান জগতেও তাঁদের প্রথম সম্পদ এই অগ্নি—তারপর সূর্য্য। বর্ত্তমান জগতেও অগ্নি সর্ব্ব বিজ্ঞানের মূল এবং সূর্য্য সর্ব্ব সৃষ্টির মূল। এই কথা বেদও সেযুগে বলেছে অগ্নি ও সূর্য্যকে দেবতা জ্ঞানে।

বেদের সূক্তগুলি এইভাবেই প্রকৃতির গুণ-বর্ণনায় পূর্ণ। আমরা অনুবাদ করেই সবকথা বলবো। মূল সংস্কৃত এখানে তুলে দেবার কোন প্রয়োজন দেখি না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক যথাযথ ভাবে বেদ পাঠ করলেই জানতে পারবেন।]*

॥ ২২ সূক্ত ॥

কণ্বের পুত্র মেধা তিথি, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা

অশ্বিদ্বয়ে জাগাও দেবতা প্রাতঃকালে
সোমপান লাগি যজ্ঞে আসুন তাঁহারা
শোভনীয় রথে রথীশ্রেষ্ঠ স্বর্গের অধিবাসী
দেবতাদ্বয়ে আহ্বান করি আমরা। ১-২ ॥

*[অশ্বিদ্বয় একথা বলতে গিয়ে ঐশী শক্তির বিকাশকে বলেছেন। রাত্রিশেষে প্রাতঃকালের পূর্ব্বে যে অরুণোদয়ে নতুন দিনের বিকাশ হয়—নতুন জীবনের প্রকাশের রূপক রূপে সেই বিকাশ ভগবানেরই —এই কল্পনাই এখানে করা হয়েছে বলে মনে হয়। যেন সূর্য্য অশ্বিদ্বয়কে আগে নিয়ে জগতকে আলো দিতে এগিয়ে আসছেন।

ওরা আসাতেই যেন আলোর রথ, জ্ঞানের রথ, জাগরণের রথ এসে গেল।

অরুণোদয়ের সেই আলো-আঁধারে মেশান যে গতি তাই অশ্বী বলে ভাষ্য করেছেন যাস্ক।]*

হে পৃথিবী হও কণ্টকহীনা, হও চির বিস্তীর্ণা,
সকল জীবের বাসভূমি হও সুখ দাও, হয়ে পূর্ণা।
সপ্ত কিরণে বিষ্ণু যে দেশ করিল পরিক্রম—
সেই দেশ হতে দেবতা মোদের রক্ষিও অনুক্ষণ।
বিষ্ণু স্থাপিল ত্রিবিধ চরণ ত্রিপদ-পরিক্রমে,
চরণ ধূলিতে আবৃত হ'ল এ জগত ক্রমে ক্রমে ।১৫-১৭॥
সেই বিষ্ণুর পরম সে পদ ধীমান তেমনি দেখে,
যেমতি ঊর্দ্ধ আকাশের বুকে আপন দৃষ্টি রাখে॥ ২০॥

[বিষ্ণু অর্থে এখানে সম্ভবতঃ সূর্য্য। সূর্য্য কিরণের ত্রিবিধগতি বা পৃথ্বী বক্ষে সূর্য্যের কিরণ-পাত দেখে মনে হয় বৈদিক এই সূক্ত থেকেই আবার পৌরাণিক চরিত্র বিষ্ণুর বামনাবতারে ত্রিপদের কল্পনা এসেছে। বিষ্ণু মানে যে সূর্য্য—এ যেন প্রতি কার্য্যের প্রারম্ভে—আচমনে বিষ্ণুকে স্মরণ করে প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্য্যকেই চিন্তা করা।]

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ"

প্রকৃতির নিকট ঋণ গ্রহণেরই যেন এ স্বীকৃতি। বিষ্ণু অর্থে এখানে সৃষ্টির মূলীভূত জীবনী-শক্তির আকর—প্রাকৃতিক সম্পদ ঐ সূর্য্য। বর্ত্তমান বিজ্ঞানেও সমভাবেই সূর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত।

॥ ২৪ সূক্ত ॥

অগ্নি প্রভৃতি দেবতা—অজিগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি।
দেবতার মাঝে কার চারু নাম স্মরণ করিব আগে,
কে বা রাখি দিবে ধরণীরে এই স্মরণীয় পুরোভাগে
কার করুণায় জনক-জননী সেবিব বা অনুরাগে।
অগ্নি দেবের করিয়া স্মরণ উচ্চারিব সে নাম
তিনিই কৃপায় দেখায়ে দেবেন এই নব ধরাধাম
দেখিব জনক-জননী চরণ—পূর্ণ মনস্কাম। ১-২॥

[অগ্নি ও সূর্য্যের পর দেখি বরুণ বা জল-দেবতার স্তুতি। ঐ জলেরই রূপ মেঘ এবং মেঘই সূর্য্য পরিক্রমার শত্রু। হাজার হাজার বছর আগে ঐ বৈজ্ঞানিক কথারই স্পষ্ট উল্লেখ পাই বেদের সূক্তে।]

সূর্য্য-গমন পথ বিরচিছে নিত্য বরুণ রাজ,
পদরেখাহীন অন্তরীক্ষ পথে পথে তাই আজ।
সূর্য্যের পদ বিক্ষেপ লাগি হ'লো পথ-বিরচন,
হৃদি-বেধকারী অরিরে বরুণ করুন সদা শাসন॥
সপ্ত ঋষির আলো রজনীতে দীপ্ত হইয়া রয়—
দিবা যোগে যেন কোথায় পলায়ে যায়।
অপ্রতিহত বরুণ কর্ম্মে সমাহিত নিজ ধর্ম্মে,
বরুণ আদেশে রাত্রে আকাশে চন্দ্র দীপ্তি পায়। ১০॥

*[বরুণের কৃপায় মেঘনাশকারী আলোকের উৎপত্তি। আবার দেখি এই বরুণ দেবতার স্তুতি-সূক্তে পৌরাণিক নানা কাহিনীর কল্পনা।

শুধু পুরাণ কেন, বেদের সূক্ত ধরে ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও সপ্তম পঞ্চিকায় এই ধরণের গল্প আছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্র রোহিতকে বলি দিতে গিয়ে পুত্রের কাতরতায় অজিগর্ত্ত নামক ব্রাহ্মণের ছেলে শুনঃশেপকে বলি দিতে চান। শুনঃশেপ বরুণ স্তুতিতে রক্ষা পান। আবার রামায়ণে রাজা অম্বরীষের যজ্ঞে ইন্দ্র যজ্ঞ-পশু অপহরণ করায় ব্রহ্মর্ষি ঋত্বিকের পুত্র শুনঃশেপকে কিনে এনে বলি দিতে চান। কিন্তু বিশ্বামিত্রের আদেশে শুনঃশেপ বরুণ স্তুতিতে মুক্তি পান।

এই রকম শুনঃশেপকে নিয়ে সব পৌরাণিক আখ্যানের মূল যে বেদ-সূক্ত তা ঋগ্বেদের ২৪ সূক্তের ১০—১৯ ঋকে বর্ণিত হয়েছে।]*

ধৃত শুনঃশেপ ত্রিপদ-কাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া যবে,
অদিতি তনয় বরুণে করিল সকাতরে আবাহন।
তখন কামনা হিংসা রহিত ধীমান বরুণদেব,
বন্ধন হতে মুক্ত করুন, করুন মুক্তি দান। ১৩॥
হে বরুণ, নতি করি মোরা তব ক্রোধ উপশম মাগি,
যজ্ঞে তোমারে হব্য দানিনু ক্রোধ বিমোচন লাগি।

হে অসুর ওগো প্রচেতা রাজন্! যজ্ঞভূমিতে রহ,
মোদের সকল কৃত পাপ, দেব শিথিল করিয়া দেহ।
হে বরুণ মোর উপরের পাশ উপরে খুলিয়া দাও
নীচের এ পাশ নীচেই খুলিয়া নিও
মধ্যের পাশ বিমোচন করি শিথিল করিয়া দাও
ব্রত পরায়ণ অদিতি পুত্রে পাপ-হীন করি নাও। ১৩-১৫ ॥

*[অপূর্ব্ব এ সূক্ত, স্তুতি আর কহিনীর কল্পনা। শুনঃশেপ কথাটি অর্থ করলে দাঁড়ায় শয়নভাবে অর্থাৎ বক্রভাবে যে গমন করে তার নাম শুনঃশেপ। আজ বর্ত্তমান বিজ্ঞান স্বীকার করে, পৃথিবী হেলানভাবে গতিশীলা। এখন এই হেলান পৃথিবী সূর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট—নইলে সে ছিঁড়ে পড়ে যাবে রসাতলে। কর্কট ক্রান্তি বিষুবরেখা ও মকরক্রান্তি—এই তিনটি স্থানে সে আকর্ষণে আবদ্ধ। এইটাই হলো ক্রার তিন স্থানের বন্ধন। সূর্য্য এই তিনস্থানে তিনটি পায়ে পৃথ্বীকে যেন আকর্ষণ করে আছে।

এখন বেদের সূক্তে যদিও এই পাশ মোচনের প্রার্থনা আর সেই মোচন থেকে যজ্ঞের বলি-কাষ্ঠে বা ত্রিতণের উল্লেখ আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তো পৃথিবী সে মোচন চায় না—সে চায় আকর্ষণ ক'রে তাকে রক্ষা করতে। তবে কেন প্রার্থনা এ—"পাশ মোচন কর।"

অন্য ভাষ্যকার কিন্তু সেই ভাবেই অর্থ করেছেন—'সর্ব্ব উপরের বন্ধন মোচন করিও না—মধ্যেরটিও ক'রো না ছিন্ন, নিম্নেরটি রক্ষা কর। যেন বাঁচিয়া থাকি। বরুণের কাছে, সূর্য্যের কাছে পৃথিবীর এ প্রার্থনা।

আবার আর এক বিচার—এটা অব্দ গণনার কথা।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময় হল ৫০৩৬৫ সৃষ্টাব্দ বা ৪১৬১ খৃঃ পূঃ—৪১২১ খৃঃ পূঃ। এতদিন ছিল ঋষি দীর্ঘতমা প্রবর্ত্তিত দীর্ঘতমা-চক্র বা অব্দ কিন্তু তারপর সুরু হল ব্রহ্ম-চক্র। তাতেই ঐ কর্কট, মকর ও বিষুবের গণনা। তাই দীর্ঘতমা উপেক্ষিত হলেন, গল্প হল রচিত—ত্রিতন নামক ভৃত্য দীর্ঘতমাকে তিন অঙ্গে বেঁধে জলে বিসর্জ্জন করলেন। এখন কি ঐ ত্রিতন? তিন বাঁধনের বলি-কাষ্ঠ, না ঐ কর্কট, বিষুব ও মকর?

এই নিয়েও হলো আবার অন্য গল্প। সে গল্পে হরিশ্চন্দ্রের সময়েই হলো যজ্ঞে এই নরবলি। এই হরিশ্চন্দ্রের সময়ে দীর্ঘতমা গণনা এবং রাজা অম্বরীষের সময় এলো বক্ষচক্র। তারপর পাই আমরা বলি-চক্র। কণ্ব ঋষি ২৭ নক্ষত্রের প্রত্যেক নক্ষত্র ধরে অয়ন-বিন্দুর বিকলাগতি অনুসারে আর একটি চক্র করেন—বলি-চক্র। আধুনিক বিজ্ঞান এই বিকলাগতির কিছু পরিবর্ত্তন করে তা মেনে নিয়েছে।

বলি-চক্র নিয়েই ঐ বামন-ভিক্ষার গল্প। দাতা বলিকে ছলনা করতে বা অহংকার চূর্ণ করতে তিন পা মাটি ভিক্ষা করে বামন এক পা রাখলেন স্বর্গে, এক পা ভূতলে এবং এক পা বলির মাথায়।

এর অর্থ হলো বিষ্ণু অর্থাৎ সূর্য্যগতি এক পা কর্কটক্রান্তি বা স্বর্গে, এক পা মকরক্রান্তি বা পৃথিবীতে আর অন্য পা বিষুবরেখা বা বলিরেখা বা বিষুব পর্বতের উপরে রাখলেন। সেই তিনটি পাশ, তিনটি পদ বা ত্রিতন বলিকাষ্ঠের তিনটি বন্ধন।

বরুণের পাশ মোচনের সূক্তগুলি শুনঃশেপ ঋষির সঙ্কলন বলেই হয়তো বলিদানের পাত্র হয়ে গেছেন অজিগর্ত্ত-পুত্র শুনঃশেপ। প্রাচীন গীতি বা ঋক এমনি করেই যুগের হাওয়ায়, সমাজের পরিবেশে, কবির কাব্যে বা পুরাণের বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় বদলে যায়।

এর পরই পাই আমরা প্রসিদ্ধ বৃত্রবধের গল্প।]*

॥ ৩২ সূক্ত ॥

ইন্দ্র দেবতা—অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি ॥

বজ্রধারী ইন্দ্রদেব পরাক্রম তাঁর
প্রথমেই করিব বর্ণন।
অহিকে বিনাশী করি মেঘ বিমোচন
বৃষ্টিধারা করিলা বর্ষণ ।১॥

তিন প্রকারের যজ্ঞে যে সব সোম হয়েছে দান,
বৃষ সম বেগে ইন্দ্র করি সে সোম পান।
শক্তিশালী অস্ত্র বজ্র গ্রহণ করেন তিনি,
অহিকুলের প্রথমটিকে হর্ষ ভরে হানি ।৩॥
দর্পী বৃত্র আপন শক্তি অতুল অটুট ভেবে।

আহ্বানিলা গর্জি, শক্রজয়ী ইন্দ্রে যবে।
রক্ষা না পাইল, ইন্দ্র করিল বিনাশ,
ভূমিতলে বৃত্র পড়ি নদী করে নাশ।
হস্তপদ-শূন্য বৃত্র ইন্দ্রেরে আহবানে,
ইন্দ্র সেই সানুস্কন্ধে বজ্রাঘাত হানে।
অপৌরুষ হীনজন পৌরুষ কারণ,
যেমতি বৃথাই করে যজ্ঞ আয়োজন।
সেইরূপে বৃথা যত্নে বৃত্র পরাজিত,
বহুক্ষত ল'য়ে হ'লো ভূমিতে পতিত।৬-৭॥

*[হস্তপদ শূন্য শক্র বৃত্রকে বিনাশ করে জলের ধারা বইয়ে দেওয়ার মধ্যে মেঘ ও বৃষ্টিরই লীলা বর্ণিত—বজ্র তারই আয়ুধ। এগুলো প্রকৃতির বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বৃত্র বা অহি এখানে মেঘ এবং মেঘচ্ছেদনে বৃষ্টির ধারা পতন ও বৃষ্টিপাতে শস্য-প্রজনন—এই কথা বলাই সূক্তের উদ্দেশ্য। হয়তো পুরাণের কোন সত্য কাহিনী এই বর্ণনার অলংকারে রঞ্জিত ও সজ্জিত হয়ে উঠেছে।

এইভাবে প্রথম মণ্ডলে পুষা, রুদ্র, পৃথিবী প্রভৃতি বহু দেবতার নিকট আর্য্য সন্তানেরা প্রাকৃতিক শক্তি ও ঐহিক মঙ্গল প্রার্থনা ক'রে ঐশী শক্তির কাছে মাথা নত করেছেন।]*

দ্বিতীয় মণ্ডল

[দ্বিতীয় মণ্ডলেও সেই ইন্দ্রকে দেবতার আসনে বসানোর উদ্দেশ্য হলো প্রকৃতি রক্ষার জন্য। এখানে দেবতাদেরও অসুর বলা হয়েছে। বরুণের স্তুতিও এই মণ্ডলে বর্ণিত।]

॥ ২৮ সূক্ত ॥

বরুণ দেবতা—কূর্ম্ম বা গৃৎসমদ ঋষি

হে বরুণ বিত্তবান দানশীল ধনীর নিকটে,
জ্ঞাতির দারিদ্র্য কথা কভু নাহি কহি।
নিয়মিত অর্থে যেন বঞ্চিত না হই,
পুত্র পৌত্র সহ যেন করি যজ্ঞ
অর্থ-ভাগ্য সহি।১১॥

তৃতীয় মণ্ডল

॥ ৫৫ সূক্ত ॥

বিশ্বদেবগণ দেবতা—প্রজাপতি ঋষি ॥

দ্যুলোক-পৃথিবী-তনয়-তপন পশ্চিমে রহে শয়নে,
উদার উষায় গতি তার হয় বাধা হীন।
সে সকলই ঐ মিত্র-বরুণ-লীলা—চলাচল-গমনে,
যত দেবতার মহান শক্তি সব এক—নহে কেহ দীন। ৬॥

*[তৃতীয় মণ্ডলের এই সূক্তে পাই সব দেবতার বল এক। আর সে সবই প্রকৃতির লীলা-কথা। ইন্দ্র, বৃহস্পতি, পুষা, সবিতা, সোম ও মিত্র বরুণ দেবতাকে উদ্দেশ্য ক'রে এ প্রার্থনা করা হয়েছে।]

চতুর্থ মণ্ডল

॥ ৫৭ সূক্ত ॥

ক্ষেত্রপতি আদি দেবতা—বামদেব ঋষি ॥

শস্য নিচয় মধুময় হোক মোদের তরে,
দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ, সলিলে মধুধারা যেন ক্ষরে।
ক্ষেত্রপতি সে হোন মধুময়—চিরদিন মোরা তাঁরও
করিব গো অনুসরণ ; হবো না হিংসাভাজন কারো।৩॥

[চতুর্থ মণ্ডলেও—ঐশ্বর্য্যদায়িনী প্রকৃতির স্তুতি দেখি।]

পঞ্চম মণ্ডল

॥ ৮৫ সূক্ত ॥

বরুণ দেবতা—অত্রি ঋষি ॥

জ্ঞানবান দেব বরুণ-প্রজ্ঞা খণ্ডিত কভু হয় না—
তবু তো তাঁহার প্রবাহিত নদী তেমন করিয়া বয় না—
যে ধারায় ঐ সাগর ভরিবে, সাগর রহে অপূর্ণ।
ঐশী শক্তি পদতলে সব প্রকৃতির রীতি চূর্ণ ॥

[এ শেষ চরণটি সায়নের ভাষ্যের মূল কথা। বেদের এই প্রকৃতি-স্তুতি বা বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির মর্য্যাদা-গান বর্ণিত হলেও, সকল শক্তির কেন্দ্র যে ঐ এক ঐশী শক্তি, তাঁর দেওয়া-প্রকৃতি তাঁরই দান, পঞ্চম মণ্ডলে তাই বহুস্থানে কীর্ত্তিত হয়েছে।]

ষষ্ঠ মণ্ডল

॥ ৭৫ সূক্ত ॥

বর্ম্মাদি দেবতা—পায়ু ঋষি ॥

যুদ্ধ যখন আসে, জীমূতের ন্যায় বেশে,
বর্ম্মে সাজিয়া যোদ্ধা যুদ্ধে ধায়,
যোদ্ধা হে তুমি অবিদ্ধ হ'য়ে জয়লাভ যদি কর
বর্ম্ম মহিমা রক্ষিত হবে তায় । ১ ।
ধনু-লগ্ন জ্যা যখন শত্রু পানে উন্মুখিয়া ধায়,
ধনুর্দ্ধারী ধৃত বাণ কানে কানে প্রিয় কথা কয়
আলিঙ্গিয়া পতিরে বনিতা যেমতি কহে গো মধু কথা,
জ্যা তেমতি বাণে আলিঙ্গিয়া কহে বুঝি জয়ের বারতা । ৩ ।
এ তূণীর বহুতর বাণের জনক, বহুবাণ সন্তান ইহার,
বাণ উত্তোলনে করে 'চিশ্বা' শব্দ তূণ, যোদ্ধৃ পৃষ্ঠে অবস্থান তার,
যুদ্ধকালে সে করে প্রসব অগণিত সে শর-সম্ভার ॥
যুদ্ধ জয় করে, করে শত্রুনাশ বুঝি বারম্বার । ৫ ।

*[ষষ্ঠ মণ্ডলেও সেই একই দেবতার কথা উল্লেখ হলেও, পৃথক পৃথক দেবতাদের কীর্ত্তনও এতে আছে। যেমন—বর্ম্ম, ধনু, জ্যা, আতর্ণী, ইষুধি, সারথি, রশ্মি, অশ্ব, রথ, রথগোপগণ, স্তোতা, পিতা, সৌম্য, দ্যাবা, পৃথিবী, পুষা, ইষু, প্রতোদ, হস্তঘ্ন, যুদ্ধভূমি, ব্রহ্মণস্পতি, অদিতি, কবচ, সোম, বরুণ, দেবগণ ও ব্রহ্মদেবতা বন্দিত হয়েছেন। ঋষি ভরদ্বাজ পুত্র পায়ু বক্তা।

একই সূক্তে এই বিভিন্ন দেবতার উক্তির দ্বারা একটি যুদ্ধ আয়োজনের কথাই বর্ণিত। একটি যুদ্ধে যোদ্ধার পক্ষে কি কি প্রয়োজন ও তার কোন্ শক্তি কোন্ দেবতার দান—সে কথা বলা হয়েছে।

এইভাবে অপরূপ বর্ণনায় রথী, সারথি, অশ্ব ধনু প্রভৃতির গুণাবলীতে এক বিরাট যুদ্ধ-দৃশ্যের অবতারণা দেখি এই ষষ্ঠ মণ্ডলে।]*

[সপ্তম মণ্ডলেও দেখি সপ্ত নদীর উল্লেখ। সিন্ধু ও তাহার পঞ্চশাখা (পঞ্চ-অপ) এবং সরস্বতী সপ্তমা। সরস্বতী তীরেই যাগযজ্ঞ সম্পাদিত হ'ত—সরস্বতী নদী হয়েও আবার হয়েছেন বাগ্‌দেবী।]

সপ্তম মণ্ডল

॥ ৩৬ সূক্ত—৬ ॥

বিশ্বদেব দেবতা—বশিষ্ঠ ঋষি ॥

যে নদী ধারায় সদা বয়ে যায় জননী সিন্ধু আর
সরস্বতীও সপ্তমারূপে বয়ে যায় অনিবার
কামদুঘারূপে সুধারা প্রবাহে পূর্ণা সে স্বীয় জলে
হয়ে অন্নপূর্ণা, কামপূর্ণা—বহুক অবনীতলে। ৬।

অষ্টম মণ্ডল

॥ ৫৮ সূক্ত ॥

বিশ্ব দেবগণ দেবতা—কাণ্ব মেধ্য ঋষি ॥

একই অগ্নি সমিদ্ধ হয় বহু রূপে বহু ভাবে,
একই সূর্য্যে প্রভু রূপে দেখি নিখিল বিশ্ব ভবে,
একই সে উষা দীপ্ত প্রকাশে দিকে দিকে দিন দিন
একই ঐশী শক্তির মাঝে সকল শক্তি লীন। ২।

[এ মণ্ডলে একই ঐশী শক্তির স্বীকৃতি—ব্রহ্ম এক, রূপ বিভিন্ন।]

নবম মণ্ডল

॥ ১১৩ সূক্ত ॥

পবমান সোম দেবতা—কশ্যপ ঋষি ॥

যেথায় আছেন রাজা বৈবস্বত যেখানে স্বর্গদ্বার,
যেথা বহে সদা সুবিশাল নদী সেথায় স্থান আমার,
সেথায় আমারে অমর করহ ওগো সোম, ওগো সুধা
ইন্দ্রের তরে ক্ষরিত হইও সদা—

[এই ভাবে এই মণ্ডল স্বর্গ বর্ণনায় পূর্ণ।]

দশম মণ্ডল

॥ ১৪ সূক্ত ॥

যম ও পিতৃলোক দেবতা—যম ঋষি ॥

হে যম এস গো এস,
নানা মূর্ত্তির অপরূপ রূপে যজ্ঞ ভোক্তা সহ,
পিতৃলোকসহ হেথায় আসিয়া ব'সো।

এস হেথা মোরা করিব আমোদ, এস যম-তুমি এসো ॥

যাও ওগো যাও তুমি

পূর্ব্বপুরুষ অতীতে গিয়াছে মৃত্যুর পর যেথা

যে লোকে রয়েছে আজ

সেই পথে যাও সেথায় বসাও আপন নিবাস ভূমি— ।

যম ও বরুণ রাজ—

স্বধারে লভিয়া যেথায় বিরাজ সেথা আনন্দ পাও

সেথায় যাইয়া দেখ তাহাদের ;—সেথা যাও সেথা যাও।

[এইভাবে পিতৃলোকের পরলোক যাত্রা ও যমরাজার নানা বিবরণ ও মৃত্যুর পর জ্ঞাতব্য নানা তথ্যে এ মণ্ডল পূর্ণ।]

॥ ১৬ সূক্ত ৪৭ ॥

অগ্নি দেবতা—দমন ঋষি।

অগ্নি মৃতেরে ভস্ম করো না দিও না মৃতেরে ক্লেশ

চর্ম্মশরীর ছিন্ন ভিন্ন কর না তাহার বেশ

জাতবেদা! যবে উত্তাপবশে তব—

শরীর হইবে পক্ক মৃতের রূপ হবে অভিনব

পাঠাইয়া দিও পিতৃলোকেতে—দিও না তাহারে ক্লেশ

ইহাই মিনতি শেষ।

[এইভাবে এই মণ্ডলে মৃতলোকে দাহ কার্য্যাদির বর্ণনা আছে। পরলোকের কথা আর অগ্নিদাহের প্রথা এই মণ্ডলের সূক্তে স্বীকৃত।]

॥ ১৮ সূক্ত ॥

মৃত্যু, ধাতা প্রকৃতি দেবতা—সংকুসুক ঋষি।

হে মরণ, ফিরে যাও তুমি,

অন্য পথে চলে যাও—ছাড় ঐ দেবলোকগামী পথভূমি।

চক্ষু আছে আছে দৃষ্টি, কর্ণ আছে শুনিবারে পাও.

তাই বলি বারম্বার, কেন আর সবে দুঃখ দাও,

হিংসা নাহি ক'রো মৃত্যু মোর প্রিয় আত্মীয় স্বজনে,

সন্তান সন্ততিগণে ছাড়ি দেহ তুমি—

চলে যাও ধর দেব অন্যপথ-ভূমি ॥

[তারপর বলেছেন মৃতের আত্মীয়দের—]

লভ তুমি দীর্ঘ আয়ু—কর ভোগ বার্দ্ধক্য তোমার,
জ্যেষ্ঠ অনুসরি হোক কনিষ্ঠের যাত্রা বারম্বার।
শুদ্ধ ও পবিত্র হ'য়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী হও,
ধন-ধান্যে পূর্ণ হও, দীর্ঘ আয়ু আশীর্ব্বাদ লও। ১-২।
ওগো নারী মৃতাত্মীয়া বিধবা তো নহ তুমি আর,
মনোমত পতি আছে ঘরে অঞ্জন ও ঘৃত লেপি
এস এস অঙ্গনে তোমার,
বধূগণ অশ্রুপাত নাহি কর আর, শোকেতে না হইও কাতর,
উত্তম উত্তম রত্নে সাজি, সর্ব্বাগ্রেতে খোল বধূ খোল গৃহ দ্বার।
ওগো নারী অভাগিনী তুমি চল সংসারের পানে,
শয্যা-সহচরী ছিলে যার, সে পতি তো শায়িত মরণে,
পাণিগ্রহণের ব্রতে বদ্ধ ছিলে যার সাথে—
সে তো আজ মৃত,
এবে তার কর্ত্তব্যসাধনে সে দিধিষু সাথে হও অবহিত।

*[এইসব মন্ত্রে বিধবার সতীদাহ বা বিধবা-বিবাহের কোনটিরই উল্লেখ নেই। অনেকেই ৭ম ঋকে ঐ 'অগ্রে' শব্দটির স্থানে 'অগ্নে শব্দটি বসিয়ে সতীদাহকে বেদের প্রামাণ্য ব'লে স্থির করেছেন। আর ৮ম ঋকে 'দিধিষু' শব্দটি দ্বারা অনেকে দ্বিতীয় পতির নির্দ্দেশ ক'রে বিধবা বিবাহের প্রচলন করেছেন। কিন্তু এ যুক্তি অযৌক্তিক বলেই মনে হয়। মনে হয় ঘরে পতি আছেন অর্থাৎ আত্মা তার তোমার শাশ্বত সহচর এই কথাটি বলেছেন—হয়তো সতীদাহ বা বিধবা বিবাহের এ সব ব্যাখ্যা বিচার বিভ্রাট মাত্র।

[এরপর এই মণ্ডলে পরবর্ত্তী সূক্তে সোমরসাদির বর্ণনা দেখি।]

॥ ৮৫ সূক্ত ॥

সোম প্রভৃতি দেবতা—সূর্য্য ঋষি ॥

যবে করি নিষ্পীড়ন উদ্ভিজ সে সোম—পান করে সুখে
লোকে ভাবে সোম-পান হল—
কিন্তু স্তোতা যারে কয় প্রকৃত সে সোম—

সর্ব্ব রস-সার যেই রস
পান লাগি কেহ নাহি পেল ॥

[এখানেই বুঝতে হবে সোম বা সোমরস কি—প্রকৃত সোমরস পানে কোন রসের সন্ধান পাই।]

স্বর্য্যার বিবাহকালে রৈভী নাম্নী ঋকই
হলো স্বর্য্যা-সহচরী—নরাশংসী-ঋক হল দাসী
সামগান বস্ত্র-গাথা মার্জ্জনী প্রভাবে
স্বর্য্যা হল সমুজ্জ্বল চির-অবিনাশী।
স্বর্য্যা যায় পতিগৃহে সাথে লয়ে সে উপঢৌকন
চৈতন্যস্বরূপ যাহা তাঁর—
চক্ষু তাঁর অভ্যঞ্জন তৈল হরিদ্রাদি
দ্যুলোক ভূলোক হল কেশের সম্ভার। ৭।
স্তব তাঁর রথ-চক্রাশয়,
কুরীর ছন্দটি তাঁর রথ কেন্দ্র হয়,
অশ্বিদ্বয় স্বর্য্য-স্বামী, অগ্নি তাঁর অগ্রগামী
দূতরূপে সদা সঙ্গ লয়।
মন তাঁর যাত্রার শকট, আকাশ সে উর্দ্ধ আচ্ছাদন,
দুই শুক্র দুই শুকতারা, শকট সে করয়ে বহন
স্বর্য্যা তাঁর পতিগৃহে যায় ।৮।

[এইভাবে স্বর্য্যা বা স্বর্য্য-পরিণয়-প্রসঙ্গে প্রকৃতি-পরিক্রমণাদি হয়েছে পুরাণ-কাহিনী। বিবাহ-প্রথার মন্ত্রগুলি এরূপর লিখিত।]

[ঋগ্বেদে এই সব বর্ণনা আছে বিস্তর—এমন কি হব্য দান নিয়েও কথা আছে। প্রসিদ্ধ একটি ঋক-মন্ত্রে তা দেখা যায়।]

॥ ১২১ সূক্ত ॥

প্রজাপতি দেবতা—হিরণ্যগর্ভ ঋষি।

সর্ব্ব প্রথমে ছিলেন কেবল দেব হিরণ্যগর্ভ
জাত মাত্রই সর্ব্বাধিপতি হলেন পূর্ণ-গর্ব্ব
পৃথ্বী আকাশে বসালেন ঠাঁই ঠাঁই
কোন দেবতারে পূজিব তখন কারে বা নতি জানাই। ১।

যিনি জীবাত্মা দিলেন—দিলেন বল,
যাঁহার আদেশ সদাই মান্য করেন দেব সকল।
অমৃত স্বরূপ ছায়া যাঁর, আর মৃত্যু যাঁহার দাস
কাহারে হব্য জানিব—কেবা সে দেয় চির-অবিনাশ। ২।

[এইভাবে মহান ঋগ্বেদ পূর্ণ]

শুক্ল যজুর্ব্বেদ

পিতৃ-পিণ্ড-যজ্ঞ

২৯ কণ্ডিকা

[পিতৃলোক স্মরণ করে সিদ্ধ তণ্ডুল দ্বারা আহুতি—]

পিতৃলোক তরে দত্ত কব্যরাশি নিয়ে
হে অগ্নি বিতরি দাও পিতৃকুলে গিয়ে—
আহুতি স্বাহুতি হোক।
হে সোম তুমিই দেব আশ্রয় সতত
পিতৃকুলে পিণ্ডাহুতি দেই সেই মত—
আহুতি স্বাহুতি হোক।
বেদীস্থ দুর্দ্দান্ত রক্ষোগণ
দূর হোক দূর হোক দূরীভূত হোক।

৩০ কণ্ডিকা

যে অসুরগণ লোভপরায়ণ পিতৃলোকের রূপে,
সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল শরীরে আসিয়াছে চুপেচুপে,
অগ্নি তাদের বিদূরিত কর পিতৃযজ্ঞ হতে,
আহুতি দানিব পিতৃলোকের হাতে।

[এ কণ্ডিকায় উল্লিখিত অসুর শব্দ হয়তো ঠিক দেবতাদের বোঝায় নি—মনে হয় 'হেয়' জ্ঞানে ব্যবহৃত। মনে হয় হয়তো যজুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী—যখন সুর ও অসুরের প্রভেদ স্বীকৃত হয়েছে।]

৩১ কণ্ডিকা

(শ্বাসরোধে চিন্তনীয়)

পিতৃযজ্ঞে পরিতুষ্ট হ'য়ে পিতৃগণ
স্বীয় স্বীয় অন্নভাগ করিছে গ্রহণ

(শ্বাস ত্যাগে চিন্তনীয়)
পিতৃগণ বিলক্ষণ হৃষ্টচিত্ত হ'ল
স্বীয় স্বীয় অন্নভাগ গ্রহণ করিল।

৩২ কণ্ডিকা

পিতৃগণ তোমাদের করি নমস্কার
বসন্ত ঋতুতে যেন প্রতি বস্তু হয় রসসার।
পিতৃগণ তোমাদের করি নমস্কার
গ্রীষ্ম আগমনে শুষ্ক হয় যেন রসবস্তু-ভার।
পিতৃগণ তোমাদের করি নমস্কার
বর্ষায় সজীব যেন হয় মোর শস্যের সম্ভার।
পিতৃগণ তোমাদের করি নমস্কার
শরতের আগমনে অন্ন হোক বহুল অপার।
পিতৃগণ তোমাদের করি নমস্কার
হেমন্ত উদয়ে জীব যেন পায় সজীবতা তার।
পিতৃগণ তোমাদের করি নমস্কার
শীত ঋতু আগমনে স্বাস্থ্য হোক সুন্দর সবার।
বারবার পিতৃলোকে এই মন্ত্রে করি নমস্কার।
পিতৃগণ-করুণায় গৃহস্থ হয়েছি
যথাসাধ্য দেয় অর্ঘ্য তাই আনিয়াছি।
বাসনা উন্মুখ হয়ে বসন দিয়েছি ॥

৩৩ কণ্ডিকা

পিতৃগণ, এ ঋতুতে যেন হয় পুরুষ সঞ্চার—
গর্ভে মোর পুষ্ট কর, নীরোগ কুমার।

৩৪ কণ্ডিকা

জলদেব! অন্ন ঘৃত দুগ্ধরূপে এ উদক-ধারা
দিতেছি সে পিতৃকুলে—পরিতৃপ্ত হন যেন তাঁরা

[এ সবই পিতৃশ্রাদ্ধে কথ্য মন্ত্র ও পিতৃলোকের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপক। শ্রাদ্ধ কালে এই সব বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ হয়।]

অথর্ব্ব বেদ
নবম কাণ্ড

দ্যুলোকে আলোকে পৃথিবী বক্ষে অন্তরীক্ষ হ'তে,
সাগরের জলে অগ্নিশিখায় বায়ু তরঙ্গ স্রোতে,
"মধুকশা" নামে ওষধি বৃক্ষ ষড়গুণে জন্মায়—
আহরি সে রস, অমৃত যতেক প্রজারা তৃপ্তি পায়,
যজ্ঞ-হবনে প্রাতঃ সবনে অশ্বিদেবদ্বয়
যেমতি সৃজিত সোমরস-ধারে সদাই তৃপ্ত হয়।
অশ্বিদ্বয়! মোর তরে আজ মধুকশা সেই মত
তোমার প্রসাদে রসপান-ফলে হউক বর্চ্চ-জাত ১১॥
মধুপূর্ণ মধুচক্রে মধুমক্ষি যথা, করে নিত্য মধুর সঞ্চয়,
মোর লাগি ষড়গুণ মধুকশা যেন নিত্য মোর গ্রহণীয় হয়।
অশ্বিদ্বয়, যেন হয় এই দেহে রসপান ফলে
বর্চ্চ, তেজ, বল, ওজ, সর্ব্বগুণ জাগুক সবলে। ১৭।

সাতটি গুণে ভরা যে এই মধুকশার রস,
পান করে যে, হয় মধুমান সপ্তগুণের বশ,
জানলে পড়ে সপ্তগুণের গুণের কথাগুলি,
সবাই নেবে মধুকশা আপন পাত্রে তুলি,
সপ্তগুণের ফল ফলিবে নিশ্চিত তার দেহে
মধুকশা সপ্তগুণে থাকবে সবার গেহে,
মস্তক-ব্রাহ্মণ-রূপে ধী-শক্তি লভিবে,
রজোরূপে হৃদয়ের বলবৃদ্ধি হবে,
ধেনুরূপে প্রীতি দেবে অন্নদানে পূর্ণা হবে
বাজীকরণের গুণ হইবে সফল,
ব্রীহিরূপে রক্তবৃদ্ধি, যবেতে শীতল সিদ্ধি
মধুরসে ওজোগুণে শরীর সবল। ২২।

[অথর্ব্ব বেদের এই সব মন্ত্র প্রয়োজনীয়তায় অতুলনীয়।

সামবেদ

সামবেদ ঋগ্বেদেরই ছায়া—তাই সামগানের অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

উপনিষদ

বেদ অনুবাদের পর আমরা সুবিরাট ও দুর্ব্বোধ্য উপনিষদ্ অংশের অনুবাদের দিকে যাব না—শুধু তার গোটামুটি বক্তব্য বিষয় এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলে যাব। কারণ উপনিষদ্ বোঝান যায় না—এ হ'লো গুরুমুখী-জ্ঞান। গুরুকৃপা ছাড়া যথার্থ উপলব্ধি হয় না।

কঠোপনিষদেই আছে—"আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্যলব্ধা" ধর্ম্মের প্রকৃত বক্তাও আশ্চর্য্য, শ্রোতার সুনিপুণ হওয়াও আবশ্যক। যাঁর আত্মা থেকে অপরের আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হতে পারে তিনিই গুরু। গ্রন্থ পাঠে বুদ্ধি আসে বোধ আসেনা—বিজ্ঞানী হওয়া যায় জ্ঞানী হওয়া দুরূহ।

পূর্ব্ব অধ্যায়েই আমরা প্রসঙ্গ ক্রমে বেদ ও তার ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপনিষদ অংশের কথা সংক্ষেপে বলেছি আর দেখেছি বেদেরই তত্ত্বকথা বুঝতে গিয়ে শিষ্য গুরুর কাছে বা ব্রাহ্মণ ঋষিরাও জ্ঞানী ক্ষত্রিয়ের কাছে বেদ-মন্ত্রেরই সার কথা—এই উপনিষদ শুনেছেন। সাধারণভাবে উপনিষদের মূল কথা বেদের কথা প্রসঙ্গে বল্লেও বেদের উদাহরণের ন্যায় দু একটি উপনিষদের বক্তব্যের সার অংশের মর্ম্মার্থ দেখা যাক—যাতে উপনিষদের কথা আরও একটু প্রাঞ্জল হবে।

ঋগ্বেদীয় কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদ

[ঋগ্বেদের দুটি ব্রাহ্মণ-অংশ কৌষীতকি ও ঐতরেয়। কৌষীতকির অন্য নাম শাঙ্খায়ণ। ঋষি কৌষীতক এই ব্রাহ্মণের উপদেষ্টা। কৌষীতকি ব্রাহ্মণের ৩০টি অধ্যায়ের মধ্যে ১৫টি অধ্যায় অরণ্য অংশে গ্রথিত হয়েছে। অরণ্যবাসীর জন্যে পৃথকীকৃত হলেও তাব মধ্যে তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ই মহান কৌষীতকি উপনিষদ।]

প্রথম অধ্যায়

(পর্য্যঙ্ক বিদ্যা)

ঋষি গর্গের প্রপৌত্র মহাত্মা চিত্র এক যজ্ঞের আয়োজন ক'রে আরুণী-পুত্র উদ্দালককে প্রধান ঋত্বিক পদে নির্ব্বাচিত করেন। ঋষি উদ্দালক তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে পাঠান তাঁর যজমান-গৃহে।

শ্বেতকেতু সভাস্থলে উপবিষ্ট হলে পর মহাত্মা চিত্র তাঁকে বললেন, মুনিবর এই লোকে এমন কোন আবরণ-যুক্তা বা আবৃত স্থান আছে যেখানে আপনি আমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন ?

শ্বেতকেতু তার উত্তর দিতে অসমর্থ হ'য়ে জানালেন, আমি পিতার কাছে জেনে আপনাকে বলবো।

শ্বেতকেতু পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন। পিতা উত্তরে জানালেন, এর সদুত্তর আমিও জানি না, বরং চলো, যজ্ঞস্থলেই এ বিষয়ে আলোচিত হবে।

হলোও তাই। অত বড় ঋষি—তিনি এলেন শিষ্যের মতো অর্ঘ্য হাতে নিয়ে মহাত্মা চিত্রের কাছে। চিত্র তাঁকে নিরভিমানী জ্ঞানে ব্রহ্ম-বিদ্ বলে আহ্বান করলেন এবং বলতে সুরু করলেন এই পর্য্যঙ্ক বিদ্যা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাণই ব্রহ্ম—এই কথাই ঋষি কৌষীতক বলে গেলেন এই অধ্যায়ে। প্রাণোপাসনা, আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্র, বিবিধ উপাসনার বর্ণনা, দৈবপরিসর রূপ প্রাণের উপাসনা, মোক্ষের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের উপাসনা, প্রাণোপাসকের সম্প্রদান কার্য্য প্রভৃতির বিষয় বর্ণনায় এ অধ্যায় পূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজা দিবোদাসের ছেলে প্রতর্দ্দন দেবাসুর সংগ্রামে ইন্দ্রকে সাহায্য করার জন্যে স্বর্গে গেলেন। যুদ্ধ জয়ের পর ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বর দিতে চাইলেন। প্রতর্দ্দন নিজের জন্য বর না নিয়ে, বর চাইলেন জগতের কল্যাণের জন্যে। ইন্দ্র তখন বললেন—ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাকে জানাই জগত-কল্যাণের মূল কথা। নিখিল প্রকৃতি ও বস্তুর সঙ্গে ব্রহ্মার সম্বন্ধ। এই ব্রহ্ম কথাতেই তৃতীয় অধ্যায় পূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়

গর্গ মুনির বংশজাত বলাকার পুত্র ঋষি বালাকি নানাদেশ পর্যটন করতে করতে এসে উপস্থিত হলেন কাশীতে কাশীরাজ—অজাতশত্রুর সভায়। সেখানে গিয়ে তিনি বললেন যে আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেবো।

রাজা বললেন, এ অতি আনন্দের কথা—সবাই যায় রাজা জনকের কাছে, আপনি যে ব্রহ্মকথা শোনাতে আমার কাছে এসেছেন তার জন্যে আমি আপনাকে এক সহস্র গো দান করবো।

তখন বালাকি বলতে লাগলেন—আদিত্যে অর্থাৎ সূর্য্য মধ্যে যে পুরুষ আছেন আমি তাঁকেই উপাসনা করি অর্থাৎ তিনিই ব্রহ্ম।

রাজা অজাতশত্রু বললেন—না না, এমন কথা বলে আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না। সূর্য্য শুক্ল বেশধারী অর্থাৎ কিরণময়, অচল, সর্ব্বভূতের মূর্দ্ধা স্বরূপ—আমি তাঁকে সেই ভাবেই জানি ও উপাসনা করি। সূর্য্যকে সেই ভাবে যিনি জানেন তিনিই সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ।

বালাকি বললেন—যিনি চন্দ্রে আছেন আমি তাঁকেই উপাসনা করি।

রাজা বললেন—আপনি এমন কথা বলবেন না। আমি চন্দ্র বা সোমকে অন্নের জীবন বলেই জানি, যে তাকে সেই ভাবে উপাসনা করে, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

এইভাবে তিনি বিদ্যুৎ, মেঘ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং মানবাদি প্রাণী সম্বন্ধে ও দর্পণ, প্রতিবিম্ব, ছায়া, প্রতিধ্বনি, শব্দ, স্বপ্ন, শরীর, চক্ষু প্রভৃতি বস্তুস্থিত পুরুষকেই ব্রহ্ম বলে উপাসনার কথা বলায়, রাজা প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন, প্রতি পদার্থই প্রকৃতিজাত—তাদের ব্রহ্ম না ভেবে মানবের উপকারী দ্রব্য বলে উপাসনা করাই সঙ্গত। কারণ প্রকৃতি জাত দ্রব্যাদি ও মানব সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্ম নয়—তারা মানব-হিতকারী প্রয়োজনীয় সৃষ্টি মাত্র।

তারপর ব্রহ্ম সম্বন্ধে রাজা উপদেশ দিলেন। বললেন, মানুষের চেতনার কথা। সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি এবং শয়ন, অচেতন, স্বপ্ন, জাগরণ, সুপ্তি প্রভৃতি সকল কথা প্রকাশ ক'রে বোঝালেন যে, মানুষের হিতা নামক হৃদয়ের শিরাগুলি হৃদয় থেকে চারদিকে—ছড়িয়ে পড়ে সেগুলি অতি সূক্ষ্ম এবং ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

স্বপ্ন-শূন্য নিদ্রাকালে চেতন-পুরুষ সেখানেই অবস্থান করে। চেতনা যখন আসে সেখানে তখন থেকে ইন্দ্রিয়ও হয় সক্রিয়। চেতন-পুরুষ প্রবুদ্ধ হলে, জ্বলন্ত অগ্নি থেকে স্ফুলিঙ্গের মতন আত্মা থেকেও বাক্ ইন্দ্রিয়াদি প্রাণ-চেষ্টা সমূহ নির্গত হয়। ক্ষুর যেমন ক্ষুরা-ধারে

থাকে, অগ্নি যেমন থাকে অরণিকাষ্ঠে নিহিত. তেমনি প্রজ্ঞাত্মা প্রাণও থাকে শরীর-আধারে অনুপ্রবিষ্ট। ধনবান শ্রেষ্ঠীকে যেমন সাধারণে করে অনুসরণ, প্রাণ এবং মনও তেমনি আত্মাকে করে অনুসরণ।

বালাকি চুপ করে গেলেন। তখন রাজা অজাতশত্রু বললেন—'হে বালাকি তোমার জ্ঞান এই পর্য্যন্ত।'

বালাকি স্বীকার করলেন।

তখন রাজা বললেন, এখন তবে তোমার কাছে পরমব্রহ্মের কথা বলবো—শোন। যিনি এই সূর্য্যচন্দ্রাদির সৃষ্টিকর্ত্তা, এই সূর্য্যচন্দ্রাদি যাঁহার সৃষ্ট—তাঁহাকেই জানা আবশ্যক।

এইসব ব্রহ্মপরিচয়াত্মক দেবতা ও মানবীয় ইন্দ্রিয়াদির স্রষ্টা পরব্রহ্মের কথায় এ অধ্যায় পূর্ণ।

[হিন্দুদর্শন বলেছেন—ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বস্তু গ্রহণ করে, মন সেই জ্ঞান উপলব্ধি করে. অহংকার সেই জ্ঞান 'আমার' বলিয়া বোধ করে আর বুদ্ধি সেই জ্ঞান আত্মার জন্য সঞ্চিত করে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনও প্রায় এই কথাই বলে।

"The senses recieve sensations, perception makes them actual perceptions, Consciousness individualizes them as 'mine', the intellect turns them into concepts for the Soul."]

●

ঐতরেয়োপনিষদ্

[ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যক অংশের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ই ঐতরেয় উপনিষদ্। ব্রহ্ম বিদ্যার প্রধানতাই এর মূলকথা।]

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ের তিনটি খণ্ডে আছে পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক লোক সৃষ্টির কথা। "স ঈক্ষতে লোকান্নু সৃজা ইতি"—ইচ্ছা হলো তাঁর লোক সৃজনের তাই তিনি অম্ভলোক অর্থাৎ দ্যুলোক, এবং মহ, জন, তপ ও সত্য লোকের সৃষ্টি করলেন। পরে করলেন অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোক যেখানে সূর্য-চন্দ্র-তারা আছে—নাম তার মরীচি। তারপর সৃষ্টি হ'লো

মানবের বাসস্থান পৃথ্বীলোক—তার নাম মরলোক আর তার নীচে পাতাল অর্থাৎ আপলোক। এই সপ্তলোক, পঞ্চলোক বা ত্রিলোকের সৃষ্টি করে তিনি করলেন সূর্য-চন্দ্র-তারকার সৃষ্টি, করলেন প্রাণীর সৃষ্টি, ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, উদ্ভিজের সৃষ্টি।

এইসব সৃষ্টিতত্ত্বের কথা নিয়েই প্রথম অধ্যায় পূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে গর্ভপ্রকরণ—স্ত্রী-পুরুষ মিলনে জীব সৃষ্টির কথা। আছে পতি-পত্নীর প্রেম কথা, জন্মকষ্ট ও জন্মান্তর ক্লেশের কথা। আর সে সম্বন্ধেই গর্ভাবস্থিত বামদেব ঋষির নানা জ্ঞানের কথা।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায় আত্ম-তত্ত্বে পূর্ণ।

আমরা আত্মা বলে কার উপাসনা করি? আমাদের শরীরে দুরকমের পদার্থ দেখতে পাই—এক চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়, অপরটি অন্তঃকরণ। এ দুটির মধ্যে কোন্‌টি আত্মা?

যে সব ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ দৃষ্ট হয়, শব্দ শোনা যায়, গন্ধ উপলব্ধি করা যায়, যার সাহায্যে বাক্য উচ্চারণ করা হয় এবং যার দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করা যায়—সেই বহিরিন্দ্রিয়ই কি আত্মা? অথবা এই যে হৃদয়, এই যে মন, এই যে অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ—সংজ্ঞা, (সম্যক জ্ঞান) আজ্ঞা, (আদেশের শক্তি) বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি (ধৈর্য্য) মতি, (বুদ্ধি) মনীষা, জুতি (বেগ), স্মৃতি, সঙ্কলন, ক্রতু (মনোরথ শক্তি), অসু, (প্রাণ-শক্তি) কাম ও ক্রোধ প্রভৃতিই কি আত্মা?

এ সকলই এক প্রজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র।

তারপর বলা হয়েছে, এই বাহিরিন্দ্রিয়ে, অন্তঃকরণে ঐ ইন্দ্র প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতায়, ঐ পঞ্চভূতে—তার ক্ষুদ্রাংশে বীজ ও ইতর প্রাণীতে, পক্ষি-আদি অণ্ডজে, মনুষ্যাদি জরায়ুজে—সব প্রাণী বা বিহঙ্গমে, স্থাবরাদিতে সর্ব্বত্র সমভাবে দেদীপ্যমান হয়ে আছেন ঐ ব্রহ্ম। আর বলা হয়েছে বামদেব ঋষির এই জ্ঞান বিষয়ে সিদ্ধি ও স্বর্গলোকের কথা। এই নিয়েই শেষ অধ্যায় পূর্ণ।

সামবেদীয় ছন্দোগ্যোপনিষদ্

সামবেদের তলবকার শাখার অন্তর্গত ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের দশটি অধ্যায়ের মধ্যে তৃতীয় থেকে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত আটটি অধ্যায় হ'লো ছন্দোগ্যোপনিষদ।

প্রথম অধ্যায়ে আছে ওঁকারের ব্যাখ্যা, ওঁকারের আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক উপাসনা, ওঁকারের অমৃতত্ব, সূর্য্য, প্রাণ এবং বিবিধরূপে ওঁকারের উদ্‌গীতোপাসনা। এই প্রসঙ্গে শিলক দালভ্য, প্রবাহন প্রভৃতির উপাখ্যান এবং তের রকমের "স্তোভ" অর্থাৎ সামগানের ওঁকার থেকে সুরু করে সমগ্র সামবেদ গানের যে বিভিন্ন লয় বা ছেদ বা স্বরের যে উচ্চতা ও অল্পতা সেই সব বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—নানাভাবে সামোপসনার কথায় পূর্ণ। সাম অর্থে সাধু, শুভ ইত্যাদি। প্রতি দ্রব্যে বা লোকে এই কল্যাণ বা সাধুতা পাঁচ রকমে জ্ঞাতব্য। হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার এবং নিধন। এই পঞ্চ উপাসনাই সাম-উপাসনা। দ্যুলোক, ভূলোক বৃষ্টি, জল, ঋতু, পশু, প্রাণী, বাণী, আদিত্যাদি, মৃত্যু, গায়ত্র, রথন্তর, বামদেব বা স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ, বৃহত বা উদয়াস্ত, বৈরূপ বৈরাজ, শক্করী, রেবতী বা পশু সাম, যজ্ঞাযজ্ঞীয়, রাজন, সর্ব্বজ্ঞ, অগ্নি প্রভৃতি সর্ব্বদ্রব্যের যে কল্যাণকর ভাব বা উপাসনা তদ্দ্বারাই এ অংশ পূর্ণ। তারপর এই অধ্যায়েই পাই যজ্ঞ, দান ও অধ্যায়ের রীতি ও নীতির প্রসঙ্গাদি সব।

তৃতীয় অধ্যায়ে—ঋগ্বেদ-পুষ্পে, ঋক-মধুকর এবং সোম আদি অমৃত। এই সঞ্চয় থেকে হয় যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য ও অন্নাদি মধুরস। এই সব রসাধার আদিত্যাদি দেবতার বৃত্তান্তে এই অধ্যায় আরম্ভ। তারপরই আছে মধু নাড়ী বিচার। এক একটি বেদ যেন পুষ্প আর তার শ্রুতি যেন মধুকর—শ্রুতি দ্বারা সঞ্চিত হয় জীবনের মধু বা কল্যাণ। তারপর বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ, সাধু প্রভৃতির জীবনাধারে অমৃতের উপাসনা, মধুবিজ্ঞান ও ব্রহ্মবিজ্ঞান এবং গায়ত্রীর সর্ব্বরূপতা, পঞ্চ প্রাণীর উপাসনা, জগত, আত্মা, বিরাটরূপ, যজ্ঞরূপী পুরুষ প্রভৃতির

উপাসনা, আত্মযজ্ঞ, মন আর আকাশে ব্রহ্মরূপ উপাসনা ও আদিত্যাদির ব্রহ্মরূপ-উপাসনার নানা বর্ণনায় এই অধ্যায় পূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়ে—বায়ু ও প্রাণের উপাসনা, জবালাপুত্র সত্যকামের গুরুভক্তি, রাজা জনশ্রুতি ও রৈক্কের উপাখ্যান প্রভৃতি আছে।

জবালা ছিলেন ঋষি-আশ্রমের দাসী। কোন অজ্ঞাত পুরুষের সহবাসে হয় এক পুত্র। পুত্র বড় হ'য়ে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম নিতে চান। সবাই প্রশ্ন করেন কে তার পিতা, কি তার গোত্র? মাতার কাছে পুত্র করে প্রশ্ন, মাতা সত্যকে সম্মান দিয়ে বলে আমি বহুজনের দাসী ছিলাম, তখন তোমার জন্ম তুমি গোত্রহীন—তোমার পরিচয় তুমি সত্যকাম জাবালা। সত্যকাম গুরুর কাছে সে কথারই পুনরাবৃত্তি করেন। সত্যকামের সত্যপ্রিয়তা দেখে গুরু গৌতম তাঁকে ব্রাহ্মণ করেন—উপনয়ন দেন। তাঁর সুরু হয় সাধনা।

পঞ্চম অধ্যায় প্রাণের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে নানা কথায় পূর্ণ। প্রথম খণ্ডেই আছে একদিন বাক, চক্ষু, মন ও প্রাণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে হ'ল কলহ। কে বড়? এই স্থির করার জন্যে এক এক ইন্দ্রিয় এক এক বার দেহ ত্যাগ ক'রে যায়। বাক্ গেল—দেহের অবস্থা হ'ল বোবা লোকের মতন। এতে এমন কি ক্ষতি হল? গেল চক্ষু—হ'ল সে অন্ধ, তবু সব কাজই চলে। গেল কান—বধির লোকও সংসারে অচল নয়। তারপর গেল মন—দেহ হ'ল শিশুর মতো, মন নামক কোন বস্তুই থাকে না সে শরীরে। কিন্তু যখন গেল ণপ্রা—দেহ হ'ল মৃত। সর্ব্ব ইন্দ্রিয় হ'ল অকর্মণ্য। তখন সকলে মেনে নিলেন, প্রাণই হ'ল আসল বস্তু এবং সকলের শ্রেষ্ঠ। এই প্রসঙ্গই এসেছে পঞ্চম প্রপাঠকে—শ্বেতকেতু প্রবাহনের কাহিনীতে।

জীবলের পুত্রের কাছে গিয়ে একদিন আরুণিপুত্র শ্বেতকেতু বললেন, আমি পিতার কাছে থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেছি। প্রবাহন প্রশ্ন করলেন, মৃত্যুর পর সকলে কোথায় যায়, ইহলোকে আর ফিরে আসে কিনা এবং দেবযান ও পিতৃযানই বা কি?

শ্বেতকেতু জানালেন, পিতার কাছ থেকে এ শিক্ষা তিনি পান নি। তখন রাজা বললেন, তবে তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'ল কোথায়?

শ্বেতকেতু ফিরে গেলেন পিতার কাছে। পিতা সব কথা শুনে বললেন, এসব প্রশ্নের উত্তর আমারও জানা নেই। তখন উভয়ে চললেন রাজার কাছে। রাজা জৈবলী তাঁদের সম্মানিত ক'রে প্রচুর অর্থ দিলেন। ঋষি গৌতম আরুণি বললেন, আমরা বনচারী—অর্থের প্রয়োজন নেই, আমাদের উপদেশ রূপ সম্পদ দান করুন।

রাজা নিরভিমানী ব্রাহ্মণদের পাদ্যার্ঘ দিয়ে বললেন, এ বিজ্ঞান ব্রাহ্মণদের অজ্ঞাত ছিল, ক্ষত্রিয়রাই জানতেন এর গূঢ় তথ্য। আমি সেই তথ্যই আপনাদের নিবেদন করছি।

এই ব'লে তিনি আকাশ মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ, স্ত্রী, জীবোৎপত্তি জীবের ত্রিবিধ গতি প্রভৃতির বিষয় বিবৃত করলেন। তারপর আহারের পূর্ব্বে "প্রাণায় স্বাহা" প্রভৃতি মন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা ক'রে ব্যান, অপান, সমান ও উদানের তাৎপর্য্য বোঝালেন, বল্লেন অন্নকে যদি অমৃত মনে করা যায়—আহার্য্যকে অগ্নিহোত্রে শুদ্ধ ক'রে নেওয়া যায়, তবে চণ্ডালের উচ্ছিষ্টও অমৃতত্ব লাভ করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অরুণের পৌত্র, আরুণির সন্তান শ্বেতকেতুর কাহিনী উল্লেখিত হয়েছে।

পিতা একদিন পুত্রকে বললেন, আমাদের বংশে সকলেই বেদাধ্যয়ন করেছে, তুমিও ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন কর। শ্বেতকেতু নয় বছর ধ'রে বেদাধ্যয়ন করলেন। কিন্তু তাতেও পিতা সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, যে উপদেশে মনের অতীতকে প্রত্যক্ষ করা যায়, অজানাকে জানা যায় তা তুমি লাভ করনি।

পুত্র তখন সে উপদেশ কি জানতে চাইলেন। পিতা তখন অজানাকে জানা সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। বললেন, অণ্ডজ, জীবজ, উদ্ভিজ ত্রিবিধ সৃষ্টির কথা। বললেন, অন্নময় প্রাণ, জলময় প্রাণ ও তেজোময় বাক্যের কথা। এই প্রসঙ্গে তিনি এও উল্লেখ করলেন, সৎ আত্মাই সকলের মূল। মাটির পাত্র বিভিন্ন হলেও মূলতঃ সেই একই মাটি, সোনার অলঙ্কার বিভিন্ন হলেও সোনা একই, লৌহ-দ্রব্য বিবিধ হলেও একই লোহা। মধুকর নানা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ ক'রে চাকে মধু জমায়—সেই সংগৃহীত মধুকে যেমন কোন

গাছের কোন মধু বলে চেনা যায় না তেমনি সকল প্রাণই এক সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মে লীন হ'লে আর বিভিন্নতা থাকে না। এই ভাবে তিনি সব নদীর একই সাগরে গমনের কথা বললেন। বল্লেন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার শুষ্কতা সত্ত্বেও মূল শুষ্ক না হ'লে বৃক্ষের নাশ হয় না উদাহরণ দিলেন—বটবৃক্ষের বীজ—ক্ষুদ্র পরমাণু আকার হলেও, ওরই মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশাল মহীরুহ, আর যেমন নোনা জল—জলে নুন আছে, এ বুদ্ধিগ্রাহ্য, তবুও অদৃশ্য কিন্তু তা মিথ্যা নয়।

তারপর পিতা বললেন, একটি লোককে চোখ বেঁধে গান্ধার দেশ থেকে এনে অন্য দেশে ছেড়ে দেওয়া হ'লো। সে তো জানে না কোথায় সে এসেছে। দিক নির্ণয় করতেও সে অপারক। কিন্তু সে জিজ্ঞাসা করতে করতে একদিন না একদিন যথাস্থানে ফিরে আসবে। তেমনি মোহ-বন্ধনে বাঁধা দৃষ্টি যার, সেও লক্ষ্যস্থানে পৌঁছুতে পারে সৎ-পুরুষের উপদেশ নিয়ে।

এমনি ব্রহ্মজ্ঞানের নানা উপদেশে এই অধ্যায় পূর্ণ।

সপ্তম অধ্যায় সনৎকুমারের কাছে নারদ এসে বললেন, আমি চার বেদকেই জানি—জানি, অধ্যয়ন, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, গণিত, নিধিপাত্র, উৎপত্তিজ্ঞান, তর্ক, নীতি, দৈববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা এবং দেবজন-বিদ্যা, নৃত্য বা সংগীত সব, কিন্তু আমি মন্ত্রই জানি—মন্ত্রবেত্তা আমি, আত্মবেত্তা নই। শুনেছি, আত্মবেত্তা শোক রহিত হয় কিন্তু আমি শোক-দুঃখ থেকে মুক্ত নই। এখন আমার কর্ত্তব্য কি বলুন?

সনৎকুমার বললেন, তুমি মাত্র বিদ্যার নাম কয়টি জেনেছ, জেনেছ নামকেই ব্রহ্মরূপে। নামের থেকে শ্রেষ্ঠ কি এবার তাকেই জানতে চেষ্টা কর। এই উপদেশ দিতেই সনৎকুমার বললেন, ব্রহ্মরূপ বাক্যের কথা, ব্রহ্মরূপ মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল প্রভৃতির কথা। ব্রহ্মরূপ অন্ন, জল, তেজ, আকাশ স্মরণ, আশা এবং প্রাণের কথা। বললেন, জ্ঞান ও ব্রহ্মলাভের জন্যে সত্যকে জানতে হবে। এই সত্যকে জানা যায় বিজ্ঞানকে জানলে, বিজ্ঞান জানতে হলে মতি বা মনকে জানতে হবে। এই মন জানা যাবে শ্রদ্ধাকে জানলে, শ্রদ্ধা

জানা যাবে কৃতিকে জানলে, কৃতি জানা যায় সুখ থেকে—সুখের জন্যে ভূমাকে, ভূমার জন্যে অমৃতকে জানতে হবে। এই ভূমাই সব কিছু জানবার আকর। আর সে ভূমা দর্শন হয় আত্মদর্শন হলেই। তবে তার জন্যে প্রয়োজন সংযম ও নিবৃত্তির। বিষয়োপলব্ধিরূপ বিজ্ঞানের শুদ্ধি হলেই, তা' আত্মজ্ঞান হয়, আর তা থেকেই হয় তার সর্ব্ব দুঃখ নাশ—সকল আনন্দের উদয়।

সপ্তম অধ্যায়ে আছে এইসব তত্ত্ব কথা।

অষ্টম অধ্যায়—প্রশ্ন হল হৃদয়স্থ কমলাকার যেস্থানে—ব্রহ্মপুর যাকে বলা হয়—সেখানে, সেই কমলাকার গৃহে, সেই অন্তরস্থ আকাশে কি আছে ?

শিষ্যের প্রশ্নে গুরু বল্লেন—সবই আছে ওখানে—অজর, অমর, অদাহ্য যে ব্রহ্ম—যে সত্য তাই আছে ওখানে—আর তাঁর নাম আত্মা।

সে আত্মা সব করতে পারে—আর আত্মজয়ী ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই সফল-সাধন পথে সিদ্ধি সম্ভব।

মোহর আছে পোঁতা মাটির নীচে, সেই মাটির উপর দিয়ে যেমন লোক হেটে গিয়েও জানে না ওখানে সুবর্ণ-মুদ্রা—তেমনই এই অন্তরেই আছে সত্য—ব্রহ্ম অমৃত অপিধানে ঢাকা—মায়ার মিথ্যা আবরণ। তা ঘুচলেই সত্য জানা যায়, আর যারা পরলোক-গত তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে,—অপ্রাপ্য কামিত সম্পদ লাভ হয় তখন তাঁর।

এই হলো ব্রহ্মচর্য্যের পদ্ধতি, শ্রেয়ঃ ফল লাভ।

এখানে ঋগ্বেদীয় ও সামবেদীয় উপনিষদের সংক্ষিপ্তভাবে অধ্যায়ানুক্রমে মর্ম্মার্থ দেওয়া হলেও দ্বাদশ উপনিষদের মর্ম্মানুবাদে গ্রন্থ কলেবর ভারাক্রান্ত হবার আশঙ্কায় আমরা এখন বাকী কটি উপনিষদের শুধু সংক্ষিপ্ত আলোচনাই করবো। অবশ্য ইতিপূর্ব্বেই উপনিষদ ও বেদের নাম পরিচয়ে আমরা সে বিষয়ের উল্লেখ করেছি, তথাপি উপনিষদের কথা শিষ্যের নিকট গুরু সেদিন কিভাবে বলেছিলেন, বক্তার বক্তব্যের প্রয়োজন বা পরিবেশই বা কি ছিল তাই বোঝাবার জন্যই পুনরায় এ অংশ লেখা। ঋগ্বেদীয় ও সামবেদীয় উপনিষদ কখানিও তারই উদাহরণ। এই ভাবেই নানা পরিবেশে,

নানা কাহিনীর মাধ্যমে দ্বাদশ উপনিষদই বক্তা শিষ্যের নিকট বা রাজসভায় বলেছিলেন, তার মধ্যে প্রায়ই শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর-প্রদান-ছলে।

সেই রকম ছয়টি প্রশ্নের উত্তর নিয়েই প্রশ্নোপনিষদ্‌।

আবার আরণ্যক ঋষিরা পরমতত্ত্বের যে আলোচনা করেন তাই বৃহদারণ্যক। উপনিষদের মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

আদি শ্লোকের আদি বাক্য নিয়ে নামকরণ হয়েছে ঈশাবাস্যোপনিষদ ও কেনোপনিষদ। তাছাড়া ঈশাবাস্যোপনিষদ আদি-উপনিষদের গৌরবে গৌরবান্বিত।

সব উপনিষদের বক্তব্যই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, মানবজীবনের প্রেয় ও শ্রেয় নির্দ্ধারণ, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ, আকাশ, বায়ু, সূর্য্য, জল ও ক্ষিতি এই সব বিষয়ের বিচার। শব্দ ব্রহ্মের স্বরূপ, স্বপ্নতত্ত্ব, ওঁকার মহিমা,—ষোড়শ-কলা পুরুষের বর্ণনা, সমিধ ও যজ্ঞ, কর্ম্ম ও উপাসনা, মন ও প্রজ্ঞা, কর্ম্ম ও ধর্ম্ম এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই সব বিষয় নিয়েই উপনিষদ নানা আলোচনা ও সত্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

আর তা শুধু পরলোক ও পারমার্থিক বিচার নিয়েই হয়নি—ইহলৌকিক বহু নীতি ও উপদেশ, ঐহিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য, বিজ্ঞানীর বহু গবেষণার কথাও আছে তাতে। সে সব যাঁরা বলেছেন সেই সব তত্ত্বদর্শীকে গুরুর আসনে বসিয়ে শ্রোতা গুরুমুখে তা উপলব্ধি করেছেন। ঋষি, ব্রাহ্মণ বা গুরু-কল্প জ্ঞানী শিষ্যপ্রতিম ক্ষত্রিয় রাজার কাছেও সে উপদেশ গ্রহণ করেছেন।

কঠোপনিষদই বলে গেছে—"আশ্চর্য্যোবক্তাঃ কুশলোঽস্য লব্ধা" অর্থাৎ বক্তাও হবেন আশ্চর্য্য, অপূর্ব্ব—আর যিনি তা নেবেন তিনিও হবেন কুশল ও কৃতী।"

গুরুমুখী সে বিদ্যা কখনই গ্রন্থের মাধ্যমে পূর্ণ হয় না—তাই গ্রন্থে—বিশেষত এই রকম সাধারণ গ্রন্থে তার অনুবাদ পাঠ করলে না হবে বুদ্ধি, না আসবে বোধ; জ্ঞান বা বিজ্ঞান কিছুরই স্ফূর্ত্তি হবে না। তবে ইঙ্গিতটুকু রইল শুধু মনকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। আকাঙ্ক্ষা জাগলে হয়তো আমরা উপযুক্ত গুরুর মুখে সব জানতে পারবো।

আর্য্যগণের আদি বিবরণ, বংশধারা, ভারতে আগমন এবং উপনিবেশাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ আদি গ্রন্থ বেদ ও উপনিষদের অল্প অংশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ দিয়েই আমরা মহান ভারতের প্রথম খণ্ড শেষ করবো—কারণ আদি আর্য্যগণের আদি অধ্যয়ন অধ্যাপনাও এইখানেই ছিল সীমিত।

তারপর সেই বেদ ও উপনিষদ ধরেই দর্শন, ধর্ম্মসূত্র,—কর্ম্মকাণ্ড শাস্ত্র ও সংহিতা ভারতের বুক জুড়ে বসেছে—এসেছে নানা তন্ত্র, মন্ত্র ও সম্প্রদায়। সে সব কথা লিখব আমাদের পরবর্ত্তী খণ্ডে।

তবে মহান ভারতের এ খণ্ড আমরা শেষ করছি মধুরতর মহান উপনিষদের অপূর্ব্ব কয়টি প্রার্থনার মর্ম্মানুবাদ এবং শান্তি পাঠের পবিত্রতা ও মাঙ্গল্য দিয়ে, যা উদ্গীত হয়েছিল বিশ্বের কল্যাণে।

বিশ্বের সকলের শান্তি, সকলের মঙ্গল এবং সকলের সমান অধিকারের কথা নিয়েই সেদিন বেদ মন্ত্রে গুরু শিষ্যদের বলেছিলেন—

"সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তম এষাম্।
সমানং মন্ত্রম্ অভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥"

সম হোক মন্ত্র তব, প্রাপ্তি হোক সবার সমান,
সমান সে মন হোক—হোক সবে সম চিত্ত-জ্ঞান।
তোমাদের সকলেরে সম মন্ত্রে দীক্ষিত করিব,
সমভাবে সম হবি ধারে তোমাদের যজ্ঞ আচরিব।

সমান অধিকারের এমনই সব মন্ত্র দান করেই—সেই সব বেদ-বাণীর পর কথিত হয়েছে অপূর্ব্ব উপনিষদের প্রার্থনা।

—উপনিষদের কয়েকটি মন্ত্রের মর্ম্মানুবাদ—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তংহ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ (শ্বেতাশ্বেতর)

নিখিল সৃজন আগে—
সৃজনের লাগি ব্রহ্মারে যিনি সৃজিলেন অনুরাগে,
হৃদয়ে যাহার বেদের প্রকাশ বিকাশ আমার বোধে,
মুমূর্ষু আমি তাহার শরণ লইনু গো অবিরোধে।

●

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তম্ অ-ক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু প্রসাদান্ মহিমানমাত্মনঃ (কঠোপনিষদ)

অণু হতে অণুতর মহান হইতে মহত্তর
যেই আত্মা—সে বিরাজে ব্যাপি সর্ব্ব জীবের অন্তর,
সে অন্তর-ধাতু সব বিশুদ্ধ হইয়া জীব যবে হইল নিষ্কাম,
আত্ম-দর্শনের মহিমায় বীতশোক—হল পূর্ণকাম।

●

অহং বৃক্ষস্য রেরিব
কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব।
ঊর্দ্ধ পবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি।
দ্রাবিণং সুবর্চ্চসম্।
সুমেধা অমৃতোঽক্ষিতঃ ॥
ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্ ॥ (তৈত্তি—উঃ)

আমি মূল সংসার-তরুর,
কীর্ত্তি মোর গিরি-শৃঙ্গ প্রায় সমুন্নতশীর,
সবিতার ন্যায় আমি উর্দ্ধে উঠে পবিত্র হয়েছি—
শোভন, অমৃত, চিরস্থির ॥
সুন্দর সে মেধা লভি—আমি আজ অমৃত অক্ষয়।
ব্রহ্মজ্ঞান লভি ঋষি ত্রিশঙ্কু এ বেদবাণী কয় ॥

●

অসতো মা সদ্ গময়।
তমসো মা জোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥ (বৃহদারণ্যক)

অসত্য হইতে নাও সত্য পথে মোরে,
তিমির আঁধার হতে
নিয়ে যাও জ্যোতির্ময় পথে,
মৃত্যু হতে নাও দেব অমৃত মাঝারে

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্,
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। (ঈশাবাস্য)

সত্য ব্রহ্ম পুরুষের মুখ আবরিত,
হিরণ্ময় সবিতার জ্যোতি—আবরণে
হে পূষণ ঘুচাও সে আবরণ তব
সত্য ধর্ম্মা ধন্য হোক সত্যের দর্শনে।

রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি। (তৈঃ উপ)

রসের স্বরূপ তিনি,
আনন্দময় হয় জীব সেই রসের স্বরূপে চিনি।

যদ্ বাচাঽনভ্যুদিতং যেন বাগ্ অভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদ ইদম্ উপাসতে। (কেন-উপ)

বাক্যে যার প্রকাশ না হয়—যাঁর বলে বাক্যের বিকাশ,
ব্রহ্মরূপে তারে জান তুমি—উপাস্য যে বিভিন্ন প্রকাশ
নাই সেথা সে ব্রহ্ম-আভাস।

নায়মাত্মা প্রবচনে ন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুংস্বাম্।
(কঠোপনিষদ্)

আত্মা নাহি লাভ হয় শুধু বেদ মন্ত্র অধ্যয়নে,
না হয় মেধায় লাভ, নহে বহু শ্রুতির শ্রবণে,
আত্মা কৃপা করে যাঁরে, সেই করে আত্ম-দরশন—
তাঁর মাঝে আত্মার প্রকাশ—হয় পরমাত্মা জাগরণ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম পথস্তং কবয়ো বদন্তি॥
(কঠোপনিষদ্)

ওঠো জাগো—বরীয়ান আচার্য্য লভিয়া কর নিত্য জ্ঞান আহরণ,
ক্ষুর সম তীক্ষ্ণধার সে দুর্গম পথ—বিবেকী সে কবির বর্ণন।

প্রার্থনাগুলি অতি অপূর্ব্ব, তাই সংস্কৃত মন্ত্র ক'টিও সংযুক্ত রইল। অতঃপর অনূদিত হ'ল শান্তি-পাঠের মর্ম্মানুবাদ।

শান্তি-পাঠ শান্তি দেয় এ শুধু আজকের বিশ্বাস নয়—এই বিশ্বাস বা অনুভূতি পাঁচ হাজার বছর আগে প্রতি অরণ্যবাসী ঋষি-মহর্ষির প্রাণেও ছিল। তাই প্রতি উপনিষদ্ পাঠ শান্তিপূর্ণ ভাবে আরম্ভ ও শেষ হবার কামনায় এই মহাবাক্য রচিত ও পঠিত হ'তো।

শান্তি পাঠ

●

ঋগ্বেদীয় শান্তি পাঠ

বাক্য হোক প্রতিষ্ঠিত মনে, মন হোক বাক্যেতে স্থাপিত,
ওগো স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম অন্তরেতে হও আবির্ভূত।
ওগো বাক্য ওগো মন, বেদ বাণী শুনাও আমারে,
গুরু মুখে শ্রুত বিদ্যা, যেন নাহি ত্যাগ করে মোরে।
অধ্যয়ন কালে যেন দিবারাত্র এক হয়ে যায়,
যেন সদা সত্য কহি, চিন্তা যেন সত্য রূপ পায়,
ব্রহ্ম রক্ষা করুন আমারে, আচার্য্যে করুন রক্ষা বিভু,
করুন আমারে রক্ষা, সে মন্ত্র-বক্তারে রক্ষা,
—করুন গুরুরে রক্ষা প্রভু।
ওঁ শান্তি—শান্তি—শান্তি।

●

সামবেদীয় শান্তি পাঠ

প্রতি অঙ্গ তৃপ্ত হোক মোর,
বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয়—
হোক মোর তৃপ্তিতে বিভোর।
উপনিষদের বাণী বিশ্বের এ সর্ব্ব ব্রহ্মময়,
ব্রহ্ম যেন প্রত্যাখ্যান নাহি করে মোরে—
ব্রহ্ম যেন ভুল নাহি হয়॥
নিয়ত সে আত্মায় আমার উপনিষদের ধর্ম্ম হউক প্রকাশ,
মোর মাঝে সেই ধর্ম্ম হোক সুবিকাশ।
ওঁ শান্তিঃ—শান্তিঃ—শান্তিঃ।

●

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শান্তি পাঠ

পূর্ণ তাহা—পূর্ণ ইহা—পূর্ণ হতে পূর্ণ প্রকাশিত।
পূর্ণ হতে পূর্ণ সৃষ্ট হল, তবু পূর্ণ—পূর্ণ রয়ে গেল।

(পূর্ণ তাহা অর্থে পূর্ণ ব্রহ্ম—পূর্ণ ইহা অর্থে পূর্ণ এই বিশ্ব। ব্রহ্ম হতে বিশ্ব হল—তবু ব্রহ্ম পূর্ণ রয়ে গেল)।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শান্তি পাঠ

আমাদের গুরু শিষ্য দোঁহে
সমভাবে বিদ্যা ফল করহ প্রদান।
সহযোগে বীর্য্য করি লাভ
উভয় অধীত জ্ঞানে হই বীর্য্যবান ॥
মোরা যেন পরস্পরে বিদ্বেষে না হই ঈর্ষাবান।
এইটুকু কর ব্রহ্ম এই বর দাও ভগবান ॥
ওঁ শান্তি—শান্তি—শান্তি।

●

অথর্ব্ববেদীয় শান্তি পাঠ

ওগো দেবগণ !
কর্ণে যেন শুনি মোরা কল্যাণ বচন।
চক্ষু যেন দেখে সদা ভদ্র সুমঙ্গল,
স্তবপরায়ণ হয়ে, যেন মোরা লভি অঙ্গে বল,
দীর্ঘ-আয়ু হয়ে যেন দেব কার্য্যে রহি অচঞ্চল।
মঙ্গল করুন ইন্দ্র বিশ্বশ্রবা যিনি
মঙ্গল করুন সূর্য্য বিশ্ববেদা তিনি
স্বস্তি দিন শ্রীগরুড় অরিষ্টনেমি সে
স্বস্তি দিন বৃহস্পতি মঙ্গল আবেশে।

●

"স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষাবিশ্ববেদাঃ
স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্ট নেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।"

সর্ব্ব-নিয়ন্তা সকলের মঙ্গল করুন, বক্তা ও শ্রোতার কল্যাণ হোক—আমরাও এই শান্তি কামনা নিয়ে গ্রন্থের ভরত-বাক্য উচ্চারণ করলাম।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভরত-বাক্যম্

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে তু শব্দ ব্রহ্ম পরং চ যৎ।
শব্দ ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥
গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতত্ত্বতঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেত গ্রন্থমশেষতঃ ॥

[ব্রহ্মবিন্দু-উপনিষদ্]

—শব্দ ব্রহ্ম আর পরব্রহ্ম দুটি বিদ্যাই জানবার কিন্তু পরব্রহ্ম জানবার অধিকার আসে শব্দব্রহ্ম জানবার পর। তাই শব্দব্রহ্ম রূপ গ্রন্থাদি পাঠ করে মন যখন পরব্রহ্ম লাভের পথে এগিয়ে যাবে তখন অধীত ঐ গ্রন্থ—ঐ জ্ঞান ও বিজ্ঞান সব দূরে ফেলে দেবে যেমন ধানগুলো ঝেড়ে নিয়ে বিচুলি বা খড় অনাদরেই ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়।

'শুভায়—ব

পুস্তকের কয়েক পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সংখ্যাপিত চিহ্ন ছিল পাদটীকা বা পরিশিষ্টের টিপ্পনির জন্য। কিন্তু তাতে গ্রন্থ অযথা ভারাক্রান্ত হবে ভেবে যথাস্থানে যথাসম্ভব ভাবে তা সরল ও স্পষ্ট করা হয়েছে।

দেশ বিদেশের ভারতীয়গণ মহান ভারতকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন, তাই জানতে তাঁদের কাছে পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত গ্রন্থাংশ পাঠাই। তাঁরা যে উৎসাহ-বাণী পাঠিয়েছেন —তাও হয়েছে আমাদের পুস্তক প্রকাশে এক পরম সম্বল।

বৃটিশ গায়নার টেগোরস মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউটের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল ব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য এম, এ বি, টি, লিখেছেন—

সাগর পারে ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন ধর্ম্মের পরিবেশের মধ্যে মহান ভারতের পাণ্ডুলিপিখানি সত্যই মনে ভারতীয় কৃষ্টিকে সজাগ করে তুলেছে……।

আমেরিকা থেকে ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ্ গবেষক নীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এস, সি লিখেছেন—

ভারতীয় কৃষ্টির কথা কেমন যেন ভুলে যাচ্ছিলাম —মহান ভারতের লেখাগুলি যেন সেই কথাকে বারবার মনে জাগিয়ে তোলে।

ভূতত্ত্ববিদ্ গবেষক নন্দদুলাল ভট্টাচার্য্য এম, এ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিখেছেন—

শহরের আধুনিকতম পরিবেশে—বিলাস-উপকরণের পরিপ্রেক্ষিতে যা দেখেছি আর দেখে যা ভেবেছি সব যেন উল্টেপাল্টে দেয় প্রাচীন ভারতের নানা কথার ইঙ্গিতে-ভরা এই মহান ভারত।

ভারত সরকারের গবেষণাগারের সুদক্ষ কর্মী প্রাণীতত্ত্ববিদ্ অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় এম, এস, সি লিখেছেন—

সত্যই বইখানা চমৎকার। মহান ভারতে ভারতের মহানতাকে কি সহজ করেই না বুঝিয়েছেন।

অধ্যাপক ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, গোরক্ষপুরস্থ কলেজ থেকে লিখেছেন—

বাংলার বাইরে বাংলা বই পেলেই পড়ি—তারপর এমন একখানা বই দেখে মনে হয়, এর ইংরাজি ও হিন্দী হওয়াও কত প্রয়োজন।

এলাহাবাদ থেকে লিখেছেন অধ্যাপিকা গৌরী দেবী এম, এ—

সত্যই ভাবতাম, ভারতের প্রাচীন বেদ উপনিষদ পড়া হল না —মন্ত্রতন্ত্রের মানেটাই বুঝলাম না, হঠাৎ বইখানা দেখে চম্‌কে উঠলাম। সংক্ষেপে, সহজে সব এক জায়গায় পেয়ে মনটা ভরে গেল।

আমেরিকা উটা গবেষণাগার থেকে স্নাতক গবেষক ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ডি, ফিল (বিজ্ঞান) লিখেছেন—

বিজ্ঞানী আমি, জ্ঞান সংগ্রহের জন্য এই সাগর পারে এসে এখানকার বিলাস-বিভ্রম দেখে যখন শঙ্কিত হয়ে উঠলাম—আপনার 'মহানভারত' যেন পথপ্রদর্শক হয়ে মনকে ভারতের দিকেই টেনে নিতে চায়।

কাশী সি, এম, আই কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রমাধব ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয় লিখেছেন—

রুগ্নশয্যায় নিরন্তর এই কথাই মনে হইত বুঝি বর্ত্তমান শিক্ষায় প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম ও ঐতিহ্য কেহই আর জানিতে চায় না—বাধা হয়তো কাল ও জটিল শাস্ত্র। সহসা এই পুস্তকখানা দেখিয়া মনে হইল সাধারণের সুখপাঠ্য এ গ্রন্থে ভারতের বহু বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে।

নেপালস্থ ভারতীয় এম্বসেডারের সেক্রেটারী শ্রীকাশীনাথ চক্রবর্ত্তী লেখেন—

সাগর পারের নানা দেশ ঘুরে এসে হিমালয়ের বুকে দাঁড়িয়ে হাতে পেলাম আপনার মহান ভারত—মনে হ'ল দেবাত্মা ভারত সত্যই যেন আমাদের বড় আপনার। তার সন্তান বলে আমাদের যে গৌরব তা যেন এই বইখানার পংক্তিতে পংক্তিতে স্মরণ করিয়ে দেয়।

যস্মিন সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং
যঃ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যঃ
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্যং
তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ

—ওঁ তৎসৎ—

প্রমাদ-স্বীকৃতি

আত্ম-অক্ষমতায় ও সময়াভাবে গ্রন্থে বহু অশুদ্ধি রহিয়া গেল—প্রেস বা প্রুফ দেখার ত্রুটি দর্শাইয়া নিজের অপরাধ স্খালনের চেষ্টা করিব না। শুধু বলিব—যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ, পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং তৎ প্রসাদাৎ……।

তবে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতির সহিত প্রুফ দেখার অসতর্কতায় একটা বিশেষ ত্রুটি রহিয়া গেল গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠায়—বহু ভুলের মধ্যে তাও একটি বটে, তবে অর্থের পারম্পর্য্য সংরক্ষণে বাধা আসিতে পারে ভাবিয়াই তাহার উল্লেখ করিলাম।

৭৫পৃঃ ৬ পংক্তির পর—"সেই সব মানুষই আবার……" হইতে ১৯ পংক্তির "প্রখর ও উন্নতিশীল" পর্য্যন্ত ১৩টি পংক্তি পরবর্ত্তী ৭৬ পৃষ্ঠায় ১৭ পংক্তির পর পঠিত হইবে।

আরও একটি ত্রুটি-চিহ্ন রহিল। গ্রন্থ কলেবরের বৃদ্ধি আশঙ্কায় পরিশিষ্টে কোন কোন বিষয় অধিকতর ভাবে প্রামাণ্য টীকা টিপ্পনী দিবার ইচ্ছায়—পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বহু অংশ সংখ্যা-চিহ্নিত করা হইয়াছিল—পরে চিহ্নগুলি আর নাই। কারণ সে জাতীয় টীকা অপেক্ষা যথাযথ স্থানে সম্ভবানুযায়ী ব্যাখ্যাই সকলে পছন্দ করিলেন।

এ ছাড়া যে সব অশুদ্ধি, ত্রুটি, ভ্রম, বা আপত্তিজনক অংশ রহিল তাহা সবই আমার অজ্ঞতা বা স্বল্প জ্ঞানের নিদর্শন।

ইতি—'শ্রীভিক্ষু'

মহান-ভারত রচনায় যাঁহাদের আশীর্ব্বাণী
ও উপদেশ আমাকে বিশেষ ভাবে
সাহায্য করিয়াছে—উৎসাহিত
করিয়াছে — তাঁহাদের
জানাই আমার কৃতজ্ঞ
চিত্তের পরিপূর্ণ
প্রণতি
'শ্রীভিক্ষু'

——উপদেষ্টা ও পরিদর্শক-মণ্ডলী-

ডক্টর অমরেশ্বর ঠাকুর বেদান্ততীর্থ
এম, এ, পি, এইচ, ডি

কাশীরাজ-সভাপণ্ডিত শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন

মহামহাধ্যাপক শ্রীতারাচরণ সাহিত্যাচার্য্য

ডক্টর শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, এম, এস, সি
ডি, ফিল (বিজ্ঞান)

ডক্টর সুকুমার মুখোপাধ্যায়, এম, এস, সি
পি, এইচ, ডি,

অধ্যাপক অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ
প্রিন্সিপ্যাল, বিদ্যাসাগর কলেজ

অধ্যাপক বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম, এ
অধ্যাপক—স্কটিশচার্চ কলেজ

ভিষগশাস্ত্রী শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ

কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ

বিচারক মতিলাল চক্রবর্ত্তী, (রিটায়ার্ড সেসন জজ)

কবিরাজ শ্রীবিন্দুমাধব ভটাচার্য্য, কাব্যতীর্থ

গ্রন্থগারিক শ্রীবিভূতিভূষণ ন্যায়াচার্য্য

তারকেশ্বর জীউর প্রধান পুরোহিত কথকচূড়ামণি
শ্রীরামরতন পুরাণ-শাস্ত্রী

মহান ভারত

(দ্বিতীয় খণ্ড)

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে—আর্য্য প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশে বেদ ও উপনিষদ্-যুগের পর ধীরে ধীরে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, কর্ম্মকাণ্ড কি করে এল। কি ভাবে আর কেন এল অদ্বৈত ভারতে দ্বৈতবাদ, প্রতীক আর প্রতিমা, যজ্ঞ আর পূজা, কিংবা বলি আর হোম।

তখনকার সমাজের নানা সংগঠন, দশবিধ সংস্কার—সামাজিক জীবনের নানা কথা, সাহিত্যের কথা—সে যুগের সমাজ, শাসন, ক্রীড়া—আর এ যুগের তীর্থ, সাধক সব বিবরণই থাকবে এই দ্বিতীয় খণ্ডে।

ছয়টি দর্শনের মর্ম্মার্থ, বেদান্তের রহস্য কথা—প্রাচীন কবিদের কাব্য-পরিচয় বিভিন্ন যোগ ও হিন্দুধর্ম্মের নানা স্তরের কথায় দ্বিতীয়খণ্ড পূর্ণ—প্রাচীন ভারতের পরিপূর্ণরূপে রূপায়িত হবে সেই উত্তরকাণ্ডে—পরবর্ত্তী অংশ বা দ্বিতীয় খণ্ডে।